রচনা-সোপান।

কলিকাতাস্থ রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষার
অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-রচনার পরীক্ষক ও
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ-সভ্য

শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী
প্রণীত।

PUBLISHED BY S. K. NATH & G C. NATH,
29, CANNING STREET,
CALCUTTA.
1908.

Price one rupee.

কলিকাতা,

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যিনি আশৈশব অনন্যমনে বাণীর উপাসনায় নিরত, অলৌকিক প্রতিভায়
মুগ্ধা বাগ্‌বাদিনী যাঁহার প্রতি অনন্ত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন,
লোক-শিক্ষা যাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত, যিনি কি গৃহে
কি বিচারাসনে সর্ব্বত্র ন্যায়দৃষ্টি, যাঁহার আন্তরিক
প্রযত্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নসিংহাসনে মাতৃ-
ভাষার সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, যিনি
কর্ত্তব্যকর্ম্মে হিমগিরির ন্যায় অটল,
আর্য্য-জগতের সেই নবোদিত
বিভাকর

মাননীয়

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী
M. A., D. L., D. Sc., F. R. A. S., F. R. S. E.
মহোদয়ের করকমলে এই ক্ষুদ্র "রচনা-সোপান"
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বহুমানপূর্ব্বক সাদরে
অর্পিত হইল।

ভুমিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের সাহায্যের জন্য "রচনাসোপান" প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাক্যরচনা প্রবন্ধ-প্রণয়ন ও অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যাহাতে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য কোন কোন প্রবন্ধ দীর্ঘায়তন করিয়াছি। পাঠার্থিগণ ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিষয়াংশে জ্ঞান লাভ করিবেন কিন্তু লিখিবার সময় যেন পরিমিতায়তন প্রবন্ধ লিখিতে বিস্মৃত না হন। পরিশিষ্টভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ও উহার উত্তর পাঠ করিয়া ছাত্রগণের এই নব প্রবর্ত্তিত বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা জন্মিবে এবং তদনুসারে তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয় করিয়া লইবেন, এই অভিপ্রায়েই ঐ অংশ সংযোজিত হইল। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে "আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর-ধ্বংস" "১৩০৪ শালের ভূমিকম্প" "বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত" শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় যথাক্রমে টডের রাজস্থান, সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ. মহাশয়ের রচিত প্রবন্ধ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি এইচ, ডি. বিরচিত বুদ্ধদেব নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের নিকট ও অন্যান্য প্রবন্ধে যে সকল ইংরাজীপুস্তকের সাহায্য পাইয়াছি, সেই সকল গ্রন্থের রচয়িতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য, এই পুস্তক প্রণয়ন কালে কলিকাতা হিন্দুস্কুলের প্রসিদ্ধ হেড্ মাষ্টার্ শ্রীযুক্ত রসময়মিত্র এম্, এ. মহোদয় ও ইম্পিরিয়াল্-লাইব্রারির অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সভার সদস্য সুবিখ্যাত বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত মিঃ হরিনাথ দে এম, এ. মহাশয় পরামর্শ ও উৎসাহ

প্রদান করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা-সূত্রে বদ্ধ আছি। এ স্থলে আরও বক্তব্য, আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং প্রেসিডেন্সি-কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর সমুজ্জ্বল রত্ন শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রচন্দ্র এই পুস্তক রচনাকালে আমি যখন যে পুস্তক চাহিয়াছি, তাহা প্রদান করিয়া আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অতএব আমি শ্রীমানের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করিয়া ভূমিকা শেষ করিলাম।

হিন্দুস্কুল, কলেজ্ স্কোয়ার্
কলিকাতা।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

নিবেদক
শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মা।

—c—

সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বস্তুবিষয়ক রচনা।

[ ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘটনাবিষয়ক রচনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চিন্তাবিষয়ক রচনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

—o—

রচনা-সোপান।

(উপক্রমণিকা)

ভাষা—লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। যদি ভাষা না থাকিত, তাহা হইলে কি পৃথিবীর এতদূর উন্নতি সম্ভবপর হইত? ভাষার দ্বারা আমরা কি না সম্পন্ন করি? ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ প্রভৃতি যাহা কিছু সমুদয়ই ভাষার সাহায্যে পরিব্যক্ত হয়। যে বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা মানুষ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে, সেই পরম মঙ্গলপ্রদ বিষয় সকলও ভাষারূপ উপাদানে গঠিত।

পৃথিবীতে এত ভাষা বিদ্যমান যে, উহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা এক প্রকার দুরূহ। শুধু আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই প্রায় শতাধিক ভাষা প্রচলিত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত প্রাকৃত পালি প্রভৃতি যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল ভাষা আর এখন কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় না। এখন প্রচলিত বাঙ্গলা, হিন্দী, মরাঠী, তেলেগু প্রভৃতি ভাষার সাহায্যেই ভারতবর্ষীয় লোকেরা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এত কাল এই সকল উদীয়মান ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ-রূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। উহার ফলে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত অধিকাংশ যুবক মাতৃভাষায় বিশুদ্ধরূপে চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন

না। এই অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থায়ি আসন নিৰ্ম্মাণের উদ্যোগ করেন। সংপ্রতি কতিপয় সদস্যের ইচ্ছাক্রমে মহামান্য ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার্ মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ও অনুমোদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নসিংহাসনে মাতৃভাষার সুবর্ণময়ী মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে অভিনব বিধান রচিত হইয়াছে। উহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ভাষা-সমূহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; মাতৃভাষায় বিদ্যার্থীর কিরূপ অধিকার জন্মিয়াছে, বাক্য-রচনা প্রবন্ধ-প্রণয়ন ও অনুবাদের পরীক্ষা দ্বারা উহা নির্ণীত হইবে। অতএব বৰ্ত্তমান পুস্তকে আমরা বাক্য-রচনা প্রবন্ধ-প্রণয়ন ও অনুবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

—— o ——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রচনার নিয়ম।

বাক্য।

১। যাহা দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশিত হয়, এরূপ কতকগুলি পদ লইয়া বাক্য (Sentence) প্রস্তুত করিতে হয়।

২। বাক্যে অন্ততঃ একটি কর্ত্তা ও একটি ক্রিয়া থাকা আবশ্যক। যথা ;—বৃষ্টি হইতেছে, আম পড়িতেছে, শিশু জাগিয়াছে, চোর পলাইবে।

৩। সকর্ম্মক ক্রিয়াযুক্ত বাক্যে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া তিনটিই আবশ্যক। যথা ;—বালিকা মালা গাঁথিতেছে, বালক দুগ্ধ পান করিয়াছে, উমেশ বাড়ী যাইবে, ইত্যাদি।

৪। কখন কখন ক্রিয়া ব্যতীত ও বাক্য রচিত হইয়া থাকে। যথা ;—ঋষির আশ্রম, পুষ্পের সৌরভ, জীর্ণ দেবালয়, তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ইত্যাদি।

৫। যে সকল পদ দ্বারা বাক্য রচিত হয়, ঐ সকল পদে যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি থাকা অবেশ্যক। *

৬। পদ সকলের অর্থ বিচার কালে পরস্পরের মধ্যে যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলেই যোগ্যতা হইল। যথা ;—অগ্নি দ্বারা পাক করিতেছে। এখানে অগ্নির পাকের সামর্থ্য আছে, সুতরাং এস্থলে যোগ্যতা আছে, অতএব বাক্য হইল। কিন্তু কর্ণ দ্বারা দর্শন করিতেছে ; এস্থলে যোগ্যতা নাই ; কারণ, সকলেই জানে কর্ণে দর্শনের সামর্থ্য নাই। অতএব 'কর্ণ দ্বারা দর্শন করিতেছে' এরূপ বাক্য হইতে পারে না।

* বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তপদোচ্চয়ঃ। ইতি সাহিত্যদর্পণম্।

৭। বাক্যের অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত এক পদ শ্রবণের পর, যে অন্য পদ শ্রবণের ইচ্ছা তাহার নাম আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটে। 'ভ্রমর কুসুমে মধু' এই অংশ মাত্র বলিলে 'পান করিতেছে, এই পদ শ্রবণের ইচ্ছা হয় এবং ঐ পদ প্রয়োগ না করিলে বাক্যের অর্থবোধ হয় না। 'পান করিতেছে' এই পদের প্রয়োগে একটি পূর্ণ বাক্য হয়। অতএব 'পান করিতেছে' এইটি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদ।

৮। যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদ সমূহের অব্যবহিত সন্নিবেশের নাম আসত্তি। যেমন ;—'নদীর জল' এখানে নদীর এই পদের পরই তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জল পদের প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহা হইলে আসত্তি বশতঃ অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না। 'মেঘ উদিত হইয়াছে, শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে।' এস্থলেও যোগ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদের যথাস্থানে সন্নিবেশের অভাব ঘটে নাই, সুতরাং অর্থ-প্রতীতি ও সম্যক্‌রূপেই সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু 'গগনে হইবে হইয়াছে উদিত শীঘ্রই বৃষ্টি মেঘ' এই রূপ পদ সন্নিবেশ করিলে আসত্তি নাই বলিয়া অর্থ-প্রতীতি হয় না, সুতরাং উহা বাক্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

তদ্ভিন্ন অদ্য 'শিক্ষক' পদ উচ্চারণ করিয়া কল্য 'পড়াইতেছেন' পদ উচ্চারণ করিলে ও আসত্তির অভাবে অর্থ প্রতীতি হয় না। অতএব বাক্য-বিন্যাসের সময় ছাত্রগণের উপরি লিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

৯। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা হয়, তাহাকে উদ্দেশ্য (Subject) এবং ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহাকে বিধেয় (Predicate) বলে। প্রকৃতপক্ষে বাক্যের অন্তর্গত কর্ত্তা (সম্পাদক) ও

তদানুষঙ্গিক পদের নাম উদ্দেশ্য। যথা ;—ময়ূর নাচিতেছে। এ স্থলে ময়ূর কর্ত্তা অর্থাৎ 'নাচিতেছে' ক্রিয়ার সম্পাদক, সুতরাং উহা উদ্দেশ্য এবং 'নাচিতেছে' বিধেয় অর্থাৎ সম্পাদ্য।

"সৌরভবাহী মৃদুমন্দ সমীরণ তাঁহার পথশ্রান্তি বিদূরিত করিল।"

এ স্থলেও সমীরণ ক্রিয়া-সম্পাদক বা কর্ত্তা, 'সৌরভবাহী' ও 'মৃদুমন্দ' উহার আনুষঙ্গিক পদ ; সুতরাং 'সৌরভবাহী মৃদুমন্দ সমীরণ' এই অংশের নাম উদ্দেশ্য। 'বিদূরিত করিল' এইটি ক্রিয়া। 'তাঁহার' 'পথশ্রান্তি' এই দুইটি উহার আনুষঙ্গিক পদ ; সুতরাং "তাঁহার পথশ্রান্তি বিদূরিত করিল" এই অংশটি বিধেয়।

১০। বাক্য তিন প্রকার। যথা ;—সরল, জটিল ও যৌগিক।

সরল বাক্য।

১১। যে বাক্যে একটি কর্ত্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহার নাম সরল বাক্য (Simple sentence)। যথা ;—পাখী উড়িতেছে।

১২। উদ্দেশ্য দুই প্রকার। যথা ;—সরল (Simple) ও সম্প্রসারিত (Enlarged)।

১৩। একটি মাত্র পদ কর্ত্তৃকারক রূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে সরল উদ্দেশ্য (Simple subject) বলে। যথা ;—নদী বহিতেছে।

১৪। কর্ত্তার সহিত এক বা বহু পদ সংযুক্ত হওয়ায় ঐ কর্ত্তৃপদের অর্থ যদি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য (Enlarged subject) কহে। যথা ;—আমার পুত্রের শিক্ষক আসিয়াছেন।

এখানে 'আমার' ও 'পুত্রের' এই দুইটি পদ সংযুক্ত থাকায় সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য হইয়াছে।

১৫। উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে সম্প্রসারিত হইতে পারে।

ক। বিশেষণ দ্বারা,
- শীতল বায়ু বহিতেছে;
- বেগবান্ অশ্ব দৌড়াইতেছে।
- পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে।

খ। সম্বন্ধ পদ দ্বারা,
- আমার হাত কাঁপিতেছে।
- ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে।
- ঝরণার জল পড়িতেছে।

গ। অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা,
- শ্যাম হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।
- পিতৃদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন।
- তিনি তাহা শুনিলে তিরস্কার করিবেন।

১৬। উদ্দেশ্যের ন্যায় বিধেয়ও দুই প্রকার। যথা;—সরল ও সম্প্রসারিত। যাহাতে এক মাত্র ক্রিয়া থাকে, তাহাকে সরল বিধেয় (Simple predicate) বলে। যথা;—ফুল ফুটিয়াছে।

এখানে "ফুল ফুটিয়াছে" এই বিধেয়ের সহিত আনুষঙ্গিক কোন পদ নাই।

১৭। আর বিধেয়ের সহিত এক বা ততোঽধিক পদ সংযুক্ত থাকিলে উহাকে সম্প্রসারিত বিধেয় (Enlarged predicate) বলা যায়। যথা;—সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

এখানে 'মৃদু মৃদু' এই পদ সংযুক্ত থাকায় সম্প্রসারিত বিধেয় হইয়াছে।

১৮। বিধেয় নিম্নলিখিত দ্বিবিধ উপায়ে সম্প্রসারিত হইতে পারে।

ক। যাহার দ্বারা ক্রিয়ার বিশেষভাব প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা। যেমন, ক্রিয়াবিশেষণ। ইহাদিগকে বিধেয়াংশ-পোষক বলে।

১৯। নিম্নে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিশিষ্ট একটি বাক্য প্রদর্শিত হইল। যথা;—দয়াময়ী জননী সস্নেহে প্রিয়পুত্রকে বলিলেন।

সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য।	বিধেয়	বিধেয়াংশ-পূরক।	বিধেয়াংশ-পোষক।
দয়াময়ী জননী	বলিলেন।	প্রিয় পুত্রকে	সস্নেহে

জটিল বাক্য।

২০। প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের একত্র মিলনে যে একটি বৃহৎ বাক্য হয়, তাহার নাম জটিল বাক্য (Complex sentence)। যথা ;—আমি আদেশ করিয়াছি, সে নিশ্চয় যাইবে।

এই স্থলে 'আমি আদেশ করিয়াছি' প্রধান বাক্য, 'সে নিশ্চয় যাইবে' এইটি অপ্রধান বাক্য। এই উভয় বাক্যের সম্মিলনে 'আমি আদেশ করিয়াছি, সে নিশ্চয় যাইবে' এই জটিল বাক্যটি প্রস্তুত হইয়াছে।

যৌগিক বাক্য।

২১। ভিন্ন ভিন্ন বাক্য যদি "কিন্তু" "এবং" প্রভৃতি অব্যয় পদ দ্বারা সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই সংযুক্ত বৃহৎ বাক্যটি যৌগিক বাক্য (Compound sentence) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা ;—

"তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন এবং কখনও কাহারও প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।"

"অনেকেই পারসীক জাতির কথা শুনিয়াছেন এবং কেহ কেহ এই সুসভ্য সম্প্রদায়ের নর নারীর আচার ব্যবহারও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু সকলে বোধ হয় ইহাদের ইতিবৃত্ত অবগত নহেন।"

২২। উদ্ধৃত দুইটি বাক্যে "কিন্তু" "এবং" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বাক্য-সকল পরস্পর সংযুক্ত হওয়ায় যৌগিক বাক্য হইয়াছে।

বাচ্য।

২৩। বাঙ্গালা ভাষায় বাচ্য চারিটি 'কর্ত্তৃবাচ্য' 'কর্ম্মবাচ্য' 'ভাববাচ্য' 'কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য'।

কর্ত্তৃবাচ্য।

২৪। যে বাক্যে কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি ও ক্রিয়া কর্ত্তৃকারকের অনুযায়ি হয় তাহার নাম কর্ত্তৃবাচ্য (Active voice)।

প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন।		দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন।	
একবচন।	বহুবচন।	একবচন	বহুবচন
অ,		কে,	
এ,		রে,	
তে,	রা,	য়,	দিগকে
য়		এ	

২৫। সকল শব্দের পরস্থিত 'অ' বিভক্তির লোপ হয়।

২৬। অপ্রাণিবাচক শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে (রা) বিভক্তির পরিবর্ত্তে সকল, সমূহ, রাশি, গুলি, গুলা প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

২৭। অপ্রাণিবাচক ও সামান্য প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর বিহিত 'কে' 'দিগকে' প্রভৃতি বিভক্তির প্রায়ই লোপ হইয়া থাকে।

কর্ত্তৃবাচ্য যথা ;—ক। তিনি তপস্যা করিতেছেন।

খ। আমি পুস্তক পড়িয়াছি।

গ। তুমি গৃহে যাইবে।

২৮। ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যে কর্ম্মকারক থাকে না। যথা ;—

ক। অশ্ব দৌড়াইতেছে।

খ। পুষ্প বিকশিত হইয়াছে।

গ। তিনি মাতুলালয়ে থাকিবেন।

কর্ম্মবাচ্য।

২৯। যে বাক্যে কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া কর্ম্মকারকে প্রথমা এবং ক্রিয়া কর্ম্মের অনুযায়ি হয়, তাহার নাম কর্ম্মবাচ্য (Passive voice)।

কর্ম্মবাচ্য যথা ;—

ক। সেই মহাত্মাকর্ত্তৃক অনেক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে।

খ। বিচারককর্ত্তৃক তিনি আহূত হইয়াছেন।

গ। জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহার মত গৃহীত হইবে।

৩০। কর্ম্মবাচ্যে কখন কখন কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্ত্তৃকারক উহ্য থাকে। যথা ;—

ক। শিশুকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

খ। তাঁহাকে বলা হইয়াছে।

গ। চোরকে শাসন করা হইবে।

৩১। কখন কখন কর্ম্মবাচ্যের ও ভাববাচ্যের কর্ত্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা ;—

ক। আমাকে ইহা করিতে হইবে।

খ। তোমাকে উহা দেখিতে হইবে।

গ। তাহাকে অবশ্য বলিতে হইবে।

ভাববাচ্য।

৩২। ভাববাচ্যে কর্ম্মকারক থাকে না, কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া ও ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যের ন্যায় হইলেই তাহাকে ভাববাচ্য বলে। যথা ;—

ক। শিশুকর্ত্তৃক নাচা হইতেছে।

খ। বৃদ্ধাকর্ত্তৃক রোদন করা হইয়াছে।

গ। তাঁহাকর্ত্তৃক এখানে বাস করা হইবে।

৩৩। ভাববাচ্যেও অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তৃকারক উহ্য থাকে। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাববাচ্যের উদাহরণ নিতান্ত বিরল। কারণ, অধিকাংশ ভাববাচ্যের বাক্যই নিতান্ত শ্রুতিকটু-দোষ-যুক্ত।

কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য।

৩৪। যে বাক্যে কর্ম্মকারক কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য।

কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য। যথা;—

ক। তোমাকে রোগা দেখাইতেছে।

খ। তাঁহাকে কৃশ বোধ হইল।

গ। আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

বাচ্যান্তর।

৩৫। কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে এবং ভাববাচ্য ও কর্ম্মবাচ্যের বাক্যকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিণত করার নাম বাচ্যান্তর (change of voice)। নিম্নে বাচ্যান্তরের কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শিত হইল; যথা;—

কর্ত্তৃবাচ্য।	ভাববাচ্য।
ক। শিশু খেলিতেছে।	ক। শিশু কর্ত্তৃক খেলা হইতেছে।
খ। বৃদ্ধ শুইয়াছেন।	খ। বৃদ্ধকর্ত্তৃক শোয়া হইয়াছে।
গ। তিনি ভ্রমণ করিবেন।	গ। তাঁহাকর্ত্তৃক ভ্রমণ করা হইবে।

কর্ত্তৃবাচ্য।	কর্ম্মবাচ্য।
ক। আমি পাঠ করিতেছি।	ক। আমা কর্ত্তৃক পাঠ কৃত হইতেছে।
খ। নবীন চন্দ্র দেখিয়াছে।	খ। নবীন কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইয়াছে।
গ। তুমি ফুল তুলিবে।	গ। তোমা কর্ত্তৃক ফুল তোলা হইবে।

কর্ম্মবাচ্য।

ক। পুরোহিত কর্ত্তৃক মন্ত্র পাঠ করা হইতেছে।

খ। রাজা কর্ত্তৃক কর গৃহীত হইয়াছে।

গ। আমাকর্ত্তৃক কৃতজ্ঞতা স্বীকৃত হইবে।

কর্ত্তৃবাচ্য।

ক। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন।

খ। রাজা কর গ্রহণ করিয়াছেন।

গ। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব ;

—o—

বাক্য-বিস্তৃতি।

৩৬। কোন একটি ক্ষুদ্র বাক্যকে বিশেষণ কারক প্রভৃতি দ্বারা বিস্তৃত করাকে বাক্য-বিস্তৃতি (Enlargement of Sentences). বলে। নিম্নে বাক্য-বিস্তৃতির একটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইল।

(ক) পথিক জল পান করিতেছে।

(খ) তৃষ্ণার্ত্ত পথিক জল পান করিতেছে।

(গ) তৃষ্ণার্ত্ত পথিক সুশীতল জল পান করিতেছে।

(ঘ) তৃষ্ণার্ত্ত পথিক আগ্রহ সহকারে সুশীতল জল পান করিতেছে।

(ঙ) তৃষ্ণার্ত্ত পথিক আগ্রহ সহকারে ধীরে ধীরে সুশীতল জল পান করিতেছে।

(চ) তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মধ্যাহ্নে আগ্রহ সহকারে ধীরে ধীরে সুশীতল জল পান করিতেছে।

(ছ) তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মধ্যাহ্নে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া আগ্রহ সহকারে ধীরে ধীরে সুশীতল জল পান করিতেছে।

(জ) তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মধ্যাহ্নে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে ধীরে ধীরে সুশীতল জল পান করিতেছে।

এইরূপ প্রত্যেক বাক্যকেই প্রয়োজন অনুসারে বিস্তৃত করা যাইতে পারে।

বাক্য-সমষ্টি।

৩৭। কোন একটি মাত্র বিষয় বা বিষয়ের প্রধান অংশ বর্ণনা করিবার অথবা বুঝাইবার নিমিত্ত রচিত কতকগুলি বাক্যকে বাক্য-সমষ্টি (Paragraph) বলে। নিম্নে বাক্য-সমষ্টির উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

"বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিত ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধু ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিমরূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া যাহা সকলের বোধগম্য তাহাই ব্যবহার করে।" [বিবিধ-প্রবন্ধ]

আমরা যখন যাহা চিন্তা করি তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করি। আমাদের সমস্ত চিন্তার ক্ষুদ্রতম অংশ একটি বাক্য। এইরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্রতম অংশ দ্বারা আমাদের সমস্ত চিন্তার একটি প্রধান ভাগ গঠিত হয়। ঐরূপ এক একটি প্রধান ভাগ এক একটি বাক্য-সমষ্টি। অতএব কতকগুলি বাক্য একত্র সংযোজিত করিয়া বাক্য-সমষ্টি হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণে বাঙ্গালার সাধুভাষা এবং অপর ভাষার প্রভেদ

দেখানই বাক্য-সমষ্টির বিষয়। একমাত্র ঐ বিষয়টি বুঝান হইয়াছে বলিয়া উহা একটি বাক্য-সমষ্টি (Paragraph) হইয়াছে।

—o—
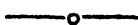
প্রবন্ধ রচনার নিয়ম।

৩৮। প্রবন্ধ-প্রণয়ন নিতান্ত সহজ নহে। এ বিষয়ে অনেক বলিবার আছে। এস্থলে সমুদয় বিবৃত করা সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য আমি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। লেখার পূর্ব্বে প্রবন্ধ-সংক্রান্ত বর্ণনীয় বিষয় গুলি উত্তম রূপে চিন্তা করা উচিত। প্রবন্ধে যে যে বিষয় বিন্যস্ত করিতে হইবে, অথবা যে যে বিষয় সন্নিবেশিত করিলে প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া সম্ভব, সেই সেই বিষয় প্রথমে একটি পৃথক্ স্থানে লিখিয়া রাখিবে। ঐ লেখায় যেন তোমার চিন্তাসমূহ প্রবন্ধের সৌষ্টব সাধনের জন্য যথাক্রমে বিন্যস্ত হয়।

মনে কর তোমার প্রবন্ধের বিষয়

"স্বগ্রাম"।

ঐ সম্বন্ধে লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি এক স্থানে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

প্রথম ;—উহার নাম, ঐ নামের সহিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে কিনা ? দ্বিতীয় ;—উহার অবস্থিতি, উহা কোন্ প্রদেশের কোন্ জেলায় এবং রাজধানী হইতে কত দূরে, কোন নদী কিংবা রেলপথের পার্শ্বে অবস্থিত কি না ? তৃতীয় ;—ঐ স্থানের ও উহার চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল বায়ু মৃত্তিকার দোষ গুণ। চতুর্থ ;—ঐ স্থানের পরিসর, লোকসংখ্যা, ধর্ম্মমত, অচার ব্যবহার। পঞ্চম ;—ঐ স্থানের অট্টালিকা, দেবমন্দির, উপাসনাগৃহ, বিদ্যালয়, বিচারভবন, জলনির্গমের

পথ, পানীয় জলপ্রাপ্তির উপায়, শিল্প ও বাণিজ্য। ষষ্ঠ ;—ঐ স্থান অথবা উহার নিকটে সংঘটিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ঐ স্থানে কোন্ কোন্ বস্তুর অভাব আছে? সপ্তম ;—কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ স্থানের অভাব সকল দূর ও বিশেষ উন্নতি করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রস্তাব।

সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ বিষয়গুলির বিস্তার করিতে হইবে। মনে কর তোমাকে এক ঘণ্টায় একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। প্রবন্ধের Point বা বিষয় সাতটি। অতএব প্রত্যেক বিষয় অবলম্বন করিয়া তুমি, সাত মিনিটের অধিক লেখনী পরিচালনা করিতে পারিবে না। তবে বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনায় দুই চারি মিনিটের ন্যূনাতিরেক করিতে পার। কোন গুরুতর বিষয়ে ৭ মিনিটের পরিবর্ত্তে ১০ মিনিট বা কোন লঘু বিষয়ে ৭ মিনিটের স্থানে ৪ মিনিট সময় দিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে লিখিলে ৪৯ মিনিটে প্রবন্ধ লেখা সমাপ্ত হইবে, অবশিষ্ট ১১ মিনিটে সংশোধন করিতে পারিবে। সংশোধনের সময় দেখা আবশ্যক, লিখিত প্রবন্ধে যেন কোনরূপ ব্যাকরণ ঘটিত অশুদ্ধি, বর্ণবিন্যাসে ভ্রম, পুনরুক্ত দোষ এবং অস্পষ্ট বাক্য-প্রয়োগ অথবা ঐতিহাসিক ঘটনা-বিপর্য্যয় না থাকে।

অনেকে প্রবন্ধমধ্যে আয়ত্তাধীন, নিরপরাধী, দুরাবস্থা, অনাটন, সিক্ষিত, ঐক্যতা, সন্মান, সৌজন্যতা প্রভৃতি অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন। কেহ কেহ কীর্ত্তি স্থলে কির্ত্তী, মূর্ত্তি স্থলে মুর্ত্তী, পৃথিবী স্থলে প্রীথিবী, সূর্য্য স্থলে শূর্জ্জ পর্য্যন্ত লিখিতেও কুণ্ঠিত নহেন। শৈশব হইতে বর্ণবিন্যাসে অধিক মনোযোগ না থাকায় ঐরূপ গুরুতর ভ্রম ঘটিয়া থাকে। আবার কাহারও কাঁহারও এরূপ অভ্যাস যে তাঁহারা এক প্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যেন একটা সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক মনে করেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যদি 'আশা করি' 'অবশ্য বলিতে হইবে' ইত্যাদি রূপ বাক্য পাঁচ সাত বারের অধিক প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা যে পাঠক

বা পরীক্ষকের পক্ষে একান্ত বিরক্তিকর বোধ হইবে, উহা বলা বাহুল্য। কোন কোন বিদ্যার্থী এমন সকল বাক্য প্রয়োগ করেন যে, উহার কর্ত্তৃ-কারক কর্ত্তৃবাচ্যের এবং ক্রিয়াপদ কর্ম্মবাচ্যের হইয়া পড়ে। কখন আবার উহার বিপরীতও হইতে দেখা যায়। প্রবন্ধ রচনাকালে অনবধানতা প্রযুক্ত অনেকে যেখানে যে শব্দটি প্রযুক্ত হইলে বাক্য সুন্দর ও সদর্থব্যঞ্জক হয়, সেখানে সে শব্দটি প্রয়োগ না করিয়া অন্যরূপ করিয়া থাকেন।

(১) প্রভাতে সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে।

(২) তিনি নৃপতি সকাশে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

(৩) তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হইল।

(৪) অসহয়া রমণীর সেই অশ্রুবিন্দু কঠোর-প্রকৃতি দস্যুর হৃদয় বিগলিত করিতে সমর্থ হইল না।

ইত্যাদি স্থলে সমীরণের পরিবর্ত্তে 'বাতাস' নিবেদন করিলেন ইহার পরিবর্ত্তে 'বলিলেন' আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হইল, ইহার পরিবর্ত্তে 'বসিতে বলা হইল' কিংবা অশ্রুবিন্দুর পরিবর্ত্তে 'নেত্রজল' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করিলে ভাষার প্রকৃত নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় না। কেহ কেহ 'অনুরোধ' স্থলে 'আদেশ' এবং 'আদেশ' স্থলে 'অনুরোধ 'দর্শন' স্থলে 'পর্য্যবেক্ষণ' ও 'পর্যবেক্ষণ' স্থলে 'দর্শন' 'পান' স্থলে 'ভক্ষণ' ও 'ভক্ষণ' স্থলে 'পান' শব্দ ব্যবহার করিয়া আরও গুরুতর ভ্রম করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়া সংশোধনের অবসর পাইলে উহার অধিকাংশ দোষ তিরোহিত হইতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রবন্ধ-রচনা কালে প্রায়ই পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মসকল প্রতিপালিত হয় না। অনেকে লিখিতে আরম্ভ করিয়া মুহুর্মুহুঃ ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন, (কি লিখিবেন?) স্থিরচিত্তে ভাবিতে পারেন না, দেখিতে দেখিতে ঘণ্টা কাটিয়া যায়, সুতরাং প্রবন্ধের আয়তন নিতান্ত হ্রস্ব হইয়া পড়ে। আবার কোন কোন বিদ্যার্থী প্রথম হইতেই অনন্যমনে লিখিতে আরম্ভ করেন,

অল্প প্রয়োজনীয় কথায় সময় অতীত হইয়া যায়; শেষে অতি প্রয়োজনীয় কথা সকল মনে পড়ে কিন্তু সময়াভাবে লেখার সুযোগ ঘটে না। কেহ কেহ দ্রুত প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া শেষের কথা প্রথমে ও প্রথমের কথা শেষে লিখিয়া প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য-হ্রাস করিয়া থাকেন।

অতএব প্রবন্ধ লেখার দুইটি পদ্ধতি বিদ্যমান। প্রথম'—অবিলম্বে (না ভাবিয়া) প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া ক্রমশূন্য (পৌর্ব্বাপর্য্যবিহীন) প্রবন্ধ-প্রণয়ন।

দ্বিতীয়,—বিষয় চিন্তার পর (বিষয় গুলি প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে এক স্থানে লিখিয়া রাখিয়া) যথাক্রমে বর্ণিত প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিষয়-যুক্ত প্রবন্ধ-প্রণয়ন।

ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিই উৎকৃষ্টতর। উপসংহারে বক্তব্য, প্রবন্ধ-রচনা কালে সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

(১) প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য। (ক) বক্তব্য বিষয়ের সমবেশ ও অবান্তর বিষয়ের পরিহার। (খ) প্রবন্ধের যথোপযুক্ত আয়তন। (গ) বর্ণনীয় বিষয়ের যথাক্রমে সন্নিবেশ। (ঘ) বাক্যের ওজস্বিতা ও শ্রুতিমধুরতা।

(২) প্রবন্ধের দোষহীনতা। (ক) ব্যাকরণাশুদ্ধি-পরিহার। (খ) দুরূহ ও অনুপযুক্ত শব্দবর্জ্জন। (গ) সম্পূর্ণ মানসিক ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ ব্যবহার। (ঘ) বাক্যবিন্যাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন।

—o—

রীতি।

৩৯। মনের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত পদ-বিন্যাস করাকে রীতি (Style) বলে। রীতির উৎকর্ষ নিম্নলিখিত গুণ কয়টির উপর নির্ভর করে।

(১) সহজবোধ্যতা বা পদ-বিন্যাসের স্পষ্টতা।

(২) সরলতা বা পদ-বিন্যাসের স্বাভাবিকতা।

(৩) সারযুক্ততা বা পদ-বিন্যাসের সংক্ষিপ্ততা।

(৪) চিত্তাকর্ষকতা বা পদ-বিন্যাসের সরলতা।

(৫) পারিপাট্য বা পদ-বিন্যাসের সামঞ্জস্য ও শ্রুতিমধুরতা।

(৬) পদ-বিন্যাসের দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের ছবি-অঙ্কন।

(১) এখন আমরা উপরি উক্ত গুণগুলির বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। রচনার যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ অর্থাৎ সহজবোধ্যতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। কারণ, যদি অর্থবোধ না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য সকল গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও সমস্ত রচনা ব্যর্থ হইয়া যায়। যেমন, স্বচ্ছ দর্পণের মধ্য দিয়া সমুদয় পদার্থ যথাযথ ভাবে সহজেই পরিলক্ষিত হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও তাহার ব্যতিক্রম হয় না; সেইরূপ লেখকের পদ-বিন্যাসের নৈপুণ্য এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তাঁহার সমস্ত মনোগত ভাব যেন বিনা ক্লেশে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই গুণগুলি রক্ষা করিতে হইলে দুরান্বয়, দুরূহ-শব্দ, সন্দিগ্ধ-পদ-প্রয়োগ, বাক্যের নিরতিশয় দীর্ঘতা-প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করা প্রয়োজন।

(২) বাক্য-প্রয়োগে কৃত্রিমতা পরিহারই সরলতা অর্থাৎ লেখার সময় বিনা আয়াসে হৃদয় হইতে যে সকল ভাবযুক্ত কথা বাহির হয়, তাহার যথাযথ প্রয়োগ করিলেই সরলতা রক্ষিত হয়। অনেকে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের নিমিত্ত অনর্থক শব্দাড়ম্বর ও অসঙ্গতভাবে (যেখানে যাহা খাটে না) প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের বাক্য উদ্ধৃত করেন, উহাতে ভাষার সরলতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু কোন উন্নত পর্ব্বত বা মহার্ণব-প্রভৃতি মহান্ পদার্থের বর্ণনাকালে নিতান্ত সরল ভাষা ত্যাগ করিয়া ওজস্বিনী ভাষার প্রয়োগে গুণ ব্যতীত কোনরূপ দোষ

হয় না। বীর ও রৌদ্র রসের বর্ণনাস্থলে ওজস্বিনী ভাষার প্রয়োগই শ্রেয়স্কর।

(৩) সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রয়োগেই সারযুক্ততা রক্ষিত হয়। যে সকল শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা নাই, তাহার প্রয়োগ দোষাবহ। যে ভাব পাঁচটি পদ দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে, সেই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত দশটি পদের প্রয়োগে সারযুক্ততার হ্রাস হয়। নিরর্থক শব্দ-প্রয়োগের দোষ এই যে, পাঠক নিরর্থক শব্দের প্রতি যে মনোযোগ প্রদান করেন, সেই মনোযোগটুকু প্রকৃত অর্থের প্রতি দিতে পারেন না। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ, সর্ব্বাপেক্ষা অল্পপদ-প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশিত করাই প্রকৃত সংক্ষিপ্ততা। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ-বিশিষ্ট পদ-প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা সংক্ষিপ্ততা রক্ষিত হয়। কিন্তু যে স্থলে সহজবোধ্যতার ব্যাঘাত ঘটে, সে স্থলে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নহে।

(৪) যাহাতে বিনা প্রয়াসে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ পদ-বিন্যাস করাই চিত্তাকর্ষকতা। যাহাতে লেখকের উদ্দেশ্য-প্রকাশক পদ-নিচয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদত্ত হয়, সেইরূপ বাক্য-রচনা করিলে চিত্তাকর্ষকতা রক্ষিত হয়। যে পদের প্রতি গুরুত্ব-প্রদান প্রয়োজন হইবে, সেই পদকে বাক্যের মধ্যে, কখন প্রথম স্থানে, কখন বা শেষ স্থানে স্থাপিত করিয়া তাহার উপর গুরুত্ব বিধান করা হয়। যেমন ;— "মহেন্দ্রের ইচ্ছা কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবকনিযুক্ত করিয়া দিয়া এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃ-সেবা-ব্রত গ্রহণ করেন।" এই বাক্যে "মহেন্দ্রের ইচ্ছা" এই কথাটির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের নিমিত্ত বাক্যের প্রথমে স্থাপিত করা হইয়াছে। "প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।" এখানে গুরুত্ব প্রদানের জন্য "দুষ্টের দমন" ও "ধরিত্রীর উদ্ধার" শেষে

স্থাপিত হইয়াছে। কখন কখন গুরুত্ব প্রদানের জন্য একটি কথা দুই তিন বার প্রযুক্ত হয়। যথা ;—"সেই অনন্ত-শূন্য অরণ্য মধ্যে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

(৫) পারিপাট্য রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ গ্রাম্য-ভাষা কর্কশ-ভাষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এরূপ কোমল-পদ-বিন্যাস করিতে হইবে, যাহাতে পড়িতে কোনরূপ কষ্ট না হয়। ইহার জন্য যদি সংক্ষিপ্ততার ব্যাঘাত ঘটে তাহাও অপ্রার্থনীয় নহে। যেমন ;—"তিনি মরিয়া গিয়াছেন" ইহার পরিবর্ত্তে—"তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন" লিখিলে গ্রাম্য দোষ পরিহার করা হয়। তদ্রূপ "সেই অনবদ্যাঙ্গ সম্রাটাত্মজ হাস্যসহকারে বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।" ইহার পরিবর্ত্তে "সেই সুন্দর রাজকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন" লিখিলে কর্কশতা পরিত্যাগ করা হয়। তৃতীয়তঃ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করা একান্ত আবশ্যক। বাক্য-সকলের রচনা এরূপভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে উহা পাঠকালে কর্ণে কোনরূপ বৈষম্য বোধ না হয়। কোন একটি দীর্ঘ বাক্যের শেষ পদটি ক্ষুদ্র এবং গুরুত্ববিহীন হওয়া উচিত নহে। যদি একটি বিশেষ্যপদের একাধিক বিশেষণ থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতম বিশেষণটি প্রথমে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি একটি ক্রিয়াপদের একাধিক বিশেষণ থাকে, তাহা হইলে উহা যতদূর সম্ভব, দূরে দূরে সন্নিবেশিত করা উচিত। একটি প্যারাগ্রাফে যে সকল বাক্য থাকিবে, তাহাদের পরস্পর সমতা থাকা আবশ্যক।

(৬) এতদ্ব্যতীত ভাষার আর একটি গুণ থাকা প্রয়োজনীয়। যেমন ;—তুলিকা দ্বারা চিত্রিত ছবি নয়নগোচর করিলে চিত্রিত বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ভাষা এরূপ ভাবের হওয়া উচিত, যাহাতে বর্ণিত বিষয়ের দৃশ্য আমাদের মনশ্চক্ষুর নিকট অবিকল

প্রতিভাত হয়। কোন একটি দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করিলেই যেন উহার ছবি আমরা সম্মুখে দেখিতে পাই। পদ-বিন্যাসের বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই এরূপ হইতে পারে। পদগুলি যদি সাধারণ হয়, তাহা হইলে ছবি অস্পষ্ট হয়। পদ-বিন্যাসের বৈচিত্র্য যতই অধিক হয়, ছবিও ততই স্পষ্টতর হইয়া পড়ে। যেমন ;—

"অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে।"

কখন কখন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পদার্থের সহিত উপমিত হইয়া এরূপভাবে বর্ণিত হয় যে, তাহার ছবি সম্মুখে উপস্থিতের ন্যায় মনে হয়। যেমন ;—"লোকের জ্ঞানের অভ্যুদয় জোয়ারের বৃদ্ধির সহিত তুলনার যোগ্য। প্রত্যেক তরঙ্গ সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং পুনরায় ফিরিয়া যায়, কিন্তু জোয়ার নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকে।"

"বর্ত্তমানকে অতীতের সহিত বিচ্ছিন্ন করিলে সেই বর্ত্তমানকে বুঝিতে যে পরিমাণ সংশয় ও ভ্রান্তি জন্মে, হঠাৎ জাগরিত হইয়া বাতায়ন-কক্ষে সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিলে সেই রূপ ভ্রম হয়। সেই সন্ধ্যা আনন্দময় দিবসাগমের সূচকও হইতে পারে, অথবা অন্ধকারের আগমনরূপ অশুভ-সূচকও হইতে পারে।"

—o—

প্রবন্ধের শ্রেণী-বিভাগ।

প্রবন্ধ সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, বস্তু বিষয়ক (Descriptive essay) দ্বিতীয়, ঘটনা বিষয়ক (Narrative essay) তৃতীয়, তদতিরিক্ত নীতি বিষয়ক (Reflective essay)।

(১) বস্তু বিষয়ক রচনা বলিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝা যায়। যথা ;—(ক) কোন প্রাণী। যেমন ;—অশ্ব হস্তী সিংহ গো মনুষ্য ইত্যাদি। (খ) কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য। যেমন ;—নদী,

পর্ব্বত, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, প্রভাতকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, পুষ্পোদ্যান, প্রশান্ত জলাশয়, ইত্যাদি। (গ) কোন স্থান। যেমন;—গ্রাম, পল্লী, নগর, মহানগর, রাজধানী ইত্যাদি।

(২) ঘটনা-বিষয়ক রচনা বলিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বুঝাইয়া থাকে। যথা;—(ক) কোন উৎসব যেমন;—বিবাহোৎসব, কোন রাজা রাজপুরুষ অথবা বিদ্বান্ ব্যক্তির আগমন-ইত্যাদি। (খ) যুদ্ধ—রাজাকর্ত্তৃক কোন দেশ কিংবা নগর আক্রমণ, কোন বীরপুরুষের পরাজয় ইত্যাদি। (গ) নৈসর্গিক ঘটনা। যেমন;—তুষারপাত, প্রবল-ঝটিকা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যাপার এবং জীবনচরিত প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণী ব্যতীত অপর বিষয়গুলি (Reflective essay) বা ভাব-প্রধান রচনার অন্তর্গত। যেমন;—দয়া, পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা, বাল্যবিবাহের অপকারিতা, বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য, শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি।

——০——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বস্তু-বিষয়ক রচনা।

(অশ্ব)।

(১) অশ্বের বংশ, (২) উহা কোন্ শ্রেণীর জীব, (৩) উহার শারীরিক গুণ, (৪) অশ্ব কোন্ কোন্ দেশে পাওয়া যায়, (৫) অশ্বের প্রকৃতি, (৬) অশ্বের প্রয়োজনীয়তা, (৭) অশ্ব পালনের নিয়ম।

(১)

আমাকে যদি কেহ প্রশ্ন করে, ইতর জন্তুর মধ্যে কোন্ প্রাণী দেখিতে মনোরম ? আমি কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ উত্তর করিব 'অশ্ব'। আহা অশ্ব কি সুন্দর জন্তু, যেমন শরীরের গঠন তেমনই বর্ণ। উহারা স্তন্যপায়ী জীব। অশ্বের চারিখানি পা ও একটি পুচ্ছ আছে।

স্থানভেদে এই প্রাণীর আকৃতি ও বর্ণ বিভিন্ন প্রকার। কোন কোন দেশের অশ্ব বৃহৎ এবং কোন কোন দেশের অশ্ব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। সচরাচর ইহাদিগকে ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখা যায় কিন্তু শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। অষ্ট্রেলিয়া আরব ও বার্ব্বারির অশ্বই সমধিক প্রসিদ্ধ। কচ দেশের অশ্ব মধ্যমাকার ও ব্রহ্মদেশের অশ্ব খর্ব্ব। অশ্বের খুর অখণ্ডিত। অশ্বজাতিমাত্রেই বলবান্ কষ্টসহিষ্ণু বুদ্ধিমান্ এবং প্রভুভক্ত। আরবদেশের অশ্ব এই সকল গুণে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই প্রাণীর প্রভুভক্তি সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। আরব দেশে কোন একটি যুদ্ধে একজন সৈনিক পুরুষ বন্দীকৃত হন। শত্রুরা তাঁহাকে যখন লইয়া যায়, তখন ঐ সৈনিক পুরুষের অশ্বটিও তাহাদের অনুসরণ

করে। বিপক্ষেরা বন্দীকে যেখানে রাখিয়াছিল, ক্রমে অশ্বটিও সেখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রভুকে দেখিয়া চিনিতে পারে। তাহার পর, অশ্ব তাহার সেই প্রভু সৈনিক পুরুষের উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়। সে দন্ত দ্বারা হস্তপদ-বদ্ধ সৈনিকের পরিচ্ছদ কামড়াইয়া ধরিয়া উন্মত্ত ভাবে বেগে প্রস্থান করে। কত নদ নদী, বন প্রান্তর, অতিক্রম করিয়া যেখানে সৈনিকের গৃহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রভুকে তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে রাখিয়া অতিশ্রান্তিপ্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অদ্যাপি ঐ প্রভুভক্ত অশ্বের স্মৃতি আরবের প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছে।

ইহারা যখন পা উঁচু করিয়া চলে, তখন সেই চলাকে টাপ্ বলে। পা গুটাইয়া ধীরে ধীরে চলিলে, উহাকে কদমে চলা বলে। পিঠ দুলাইয়া চলার নাম দুল্‌কী। ছোলা যব গম যবের ও গমের ভুষি এবং শুষ্ক ঘাসই অশ্বের প্রধান খাদ্য। ধনী লোকেরা অনেক সময় ঘৃত চিনি গুড় প্রভৃতি মূল্যবান্ খাদ্যও অশ্বকে প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাচীন লোকেরা বলেন;—অশ্ব ৬০ বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু সচরাচর গৃহপালিত অশ্ব ২৫।৩০ অথবা ৪০ বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না।

অশ্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জন্তু। অশ্বে চড়িয়া অতি দ্রুত যাতায়াত করা যায়। ইহারা গাড়ী টানে এবং ভার বহন করে। য়ুরোপের লোকেরা অশ্বের দ্বারা হলকর্ষণ করিয়া থাকে। লোহার ব্রুস্ দিয়া অশ্বের গা পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাদের খুরে লৌহময় নাল বাঁধান থাকে, তজ্জন্য ছুটিবার সময় পায়ে অঘাত লাগে না। অশ্বের কেশর ও বালাঞ্চীতে পাখী ধরিবার ফাঁস ছাঁকনি পাপোষ এবং এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। উহার চর্ম্মের দ্বারা মেজ আবৃত করা হইয়া থাকে। অতএব অশ্ব মানব জাতির অশেষ উপকারে প্রযুক্ত হয়। পৃথিবীর সকল প্রদেশেই অশ্ব আছে। আরবদেশের লোকেরা বিশেষ যত্নসহকারে অশ্ব পরিপালন

করিয়া থাকে। অশ্বশালা শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। গৃহ-মধ্যে যাহাতে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার উপায় করা একান্ত আবশ্যক। অশ্ব যে প্রকার উপকারী জন্তু তাহাতে উহার প্রতি যত্নবিধানে কাহারই অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে।

—৫—
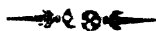
(নদী)।

(১) নদী কাহাকে বলে? (২) কি প্রকারে নদীর উৎপত্তি হয়? (৩) নদীর দ্বারা জগতের কি কি কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে? (৪) পৃথিবীতে যে সকল নদী আছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টী প্রধান? (৫) যদি নদী না থাকিত তাহা হইলে জগতের কি ক্ষতি হইত? (৬) অতএব নদী মানবের কি প্রকার উপকার সাধনে নিযুক্ত?

(২)

"পর্ব্বত-দুহিতা নদী দয়াবতী তুমি,
জন্ম তব অবনীর উপকার তরে;
তোমার সলিল সদা তৃষ্ণা দূর করে,
তব জলে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় ভূমি"।

সংস্কৃত ভাষায় নদ্ ধাতুর অর্থ শব্দ। যে শব্দ করিতে করিতে গমন করে তাহার নাম নদী। সংস্কৃত ভাষার প্রথম উন্মেষের সময় বোধ হয়, প্রাচীন কবিকগণ পর্ব্বত-নিঃসৃত জলপ্রবাহের কল কল ধ্বনি শ্রুতিগোচর করিয়াই নদী এই নাম করণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য পদার্থ যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে নিম্নাভিমুখে পতিত হয়, সেই রূপ জলেরও নিম্নাভিমুখে গমনের প্রবৃত্তি আছে। ঐরূপ প্রবৃত্তি-বশতঃই জলপ্রবাহ নদীরূপে পরিণত হইয়া থাকে। মেঘ, প্রস্রবণ, হ্রদ ও তুষারদ্রব হইতে নদীর জল সংগৃহীত হয়। উৎপত্তি স্থানের নিকট নদী অতিসঙ্কীর্ণ

অবস্থায় থাকে, ক্রমে যতই নিম্নাভিমুখে আসিতে থাকে, ততই প্রস্রবণ এবং উপনদীর জল পতিত হইয়া উহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে যে জলপ্রবাহের দৈর্ঘ্য অন্যূন আট হাজার ধনু (১৬ মাইল) উহাই নদী নামের যোগ্য। পৃথিবীতে অসংখ্য নদী আছে। এসিয়া মহাদেশে যে সকল নদী বিদ্যমান, তন্মধ্যে চীন জনপদস্থ 'ইয়াংসিকিয়াং' নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহার দৈর্ঘ্য ৩৩২০ মাইল। আমাদের ভারতবর্ষে যে সকল নদী প্রবাহিত, তাহাদের মধ্যে সিন্ধুনদই সর্ব্বপ্রধান। এই নদ হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া ১৮৬৪ মাইল অতিক্রম পূর্ব্বক আরবসাগরে পতিত হইয়াছে।

নদী যে পথ দিয়া গমন করে, তাহাকে গতি বলে। ঐ প্রবাহে যে খাত হয়, তাহার নাম গর্ভ এবং গর্ভসন্নিহিত উভয় পার্শ্বস্থ ভূমির নাম অববাহিকা। বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নদীর জল-পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল নাতিশীতোষ্ণ দেশের পর্ব্বত শিখরে চিরস্থায়ী তুষার জন্মেনা, ঐ সকল দেশে নদীর বৃদ্ধি কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। বৃষ্টির জল একবারে নদীতে আসিয়া পড়ে না, ক্রমশঃ গড়াইয়া বা ক্ষরিত হইয়া অল্পে অল্পে আসিয়া নদীতে পড়ে, তজ্জন্য ঐ সকল দেশের নদীর জল প্রবাহের পরিমাণ অনেক দিন সমভাবে অবস্থান করে এবং এক বর্ষা অতীত হইলে পুনরায় বর্ষা না আসা পর্য্যন্ত দূরস্থান হইতে জল আনিয়া নদীকে পরিপুষ্ট রাখে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া, দেশের উষ্ণতা, বাষ্পোদ্গমের অল্পতা, বায়ুর আর্দ্রতা এবং ভূমির সচ্ছিদ্রতার উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশসমূহে বর্ষাকালে নদীর বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মকালে হ্রাস হয়। শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাসে বেগবতী পদ্মার যে অনন্ত জল-প্রবাহ নিরন্তর কূলভঙ্গ করিয়া তট সন্নিহিত অধিবাসীদিগের হৃদয়ে ভয় উৎপাদন করে, যাহার তরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য সন্দর্শন করিয়া সুনিপুণ কর্ণধার ও ভয়ে অভিভূত হয়, সেই পদ্মা চৈত্র বৈশাখ

মাসে কেমন ক্ষীণতোয়া ও প্রশান্ত মূর্ত্তিতে আতপ-সন্তপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক-গণের হৃদয়ে কত আনন্দ প্রদান করে।

নদীর দ্বারা অশেষবিধ নৈসর্গিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। নদীর জলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রচুর শস্য জন্মে, সুতরাং জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। নদীর স্রোতঃ দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় প্রদেশের মৃত্তিকা ধৌত করিয়া নিম্নভূমির উপর চাপাইয়া দেয়, সুতরাং নিম্নভূমি সমতল ও উর্ব্বরা-শক্তি সম্পন্ন হইয়া কৃষকগণের আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করে। নদীর দ্বারা কৃষি কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা হয়। অনাবৃষ্টি হইলে কৃষকেরা কৃত্রিম জলনালীর সাহায্যে নদী হইতে জল সংগ্রহ করিয়া উভয়তীরস্থ বহুদূরবর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত জল সেক করিয়া কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন করে এবং তাহাতেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এমন দেশও আছে, যেখানে নৈসর্গিক নিয়মে বৃষ্টি হয় না, বন্যার জলই কৃষকের একমাত্র সহায়। দৃষ্টান্ত স্থলে, ইজিপ্ট দেশের উত্তরাংশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে কদাচিৎ বৃষ্টি হয় কিন্তু বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নীলনদের জল পরিবর্দ্ধিত হইয়া দেশ প্লাবিত করে এবং তিন দিন পরে যখন জল সরিয়া যায়, সেই সময় ঐ সরস মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নদী শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান সহায়। জল-পথে সুদূর পল্লীস্থিত শিল্পদ্রব্য ও শস্যাদি দেশ দেশান্তরে নীত হইয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র পল্লীকে সমৃদ্ধ নগরে পরিণত করে। আমাদের বারাণসী প্রয়াগ দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ কানপুর সুরাট ভরোচ্ কলিকাতা প্রভৃতি নগর ও মহানগর সমূহের যে এত সমৃদ্ধি নদীর প্রভাবই উহার প্রধান কারণ। যদি ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, মুর্সিদাবাদ, কটক-প্রভৃতি নগর স্রোতস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত না হইত, তাহা হইলে কি ঐ সকল স্থানের

শিল্পদ্রব্য ভূমণ্ডলে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত? অতএব নদীই যে ঐ সকল দ্রব্যের খ্যাতির কারণ, তাহা বলা বাহুল্য।

নদীর জল লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক। আমরা যখন তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হই, সেই সময় নদীর সুশীতল পানীয় পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ ও হৃদয় কেমন প্রফুল্ল হয়। নদী আমাদের জননীর ন্যায় উপকারিণী। আমরা মাতৃস্তন্যের ন্যায় স্রোতস্বতীর পানীয় পান করিয়া জীবন ধারণ করি। নদী প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। স্থানান্তরে বা দেশান্তরে গমন করিতে হইলে নদী-পথই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। নদী আমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয় লোকেরই মঙ্গলপ্রদ। শাস্ত্রে উক্ত আছে;—গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যনদীর জলে অবগাহন করিলে বহুকালের সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। বিশেষ বিশেষ যোগে ব্রহ্মপুত্র করতোয়া প্রভৃতি নদীর জল অনন্ত পুণ্যজনক। হিন্দুগণের বিশ্বাস, অন্তিম সময়ে ভাগীরথীর পবিত্র বক্ষে শয়ন করিয়া ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে অনন্তকাল স্বর্গেবাস করা যায়।

——o——

বারাণসী ভ্রমণ।

১। ট্রেণ্ ছাড়িবার পূর্ব্বে ষ্টেসনের অবস্থা। ২। প্রত্যেক গাড়ীতে নানাজাতীয় লোকের সমাবেশ। ৩। ট্রেণ্ হইতে নানাবিধ দৃশ্য সন্দর্শন। ৪। ভ্রমণে মানসিক তৃপ্তি। ৫। রেলপথ, ভ্রমণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপায়।

(৩)

ভ্রমণে শিক্ষা হয়। বন্ধুরা বলিলেন—"চল, তবে এবারকার গ্রীষ্মের অবকাশে পশ্চিমে যাওয়া যাউক।" আমারও ইচ্ছা ছিল, সুতরাং

কোনই আপত্তি করিলাম না। সেখানে বসিয়াই যাওয়ার দিন স্থির করা গেল। যে কথা সেই কার্য্য, বুধবার অপরাহ্নে সুরেশ ও বিপিন আসিয়া বলিল,—"এখনই যাত্রা করিতে হইবে, নগেন্ কোন কার্য্য-বশতঃ কিছু পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে, ষ্টেশনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" কিছু জলযোগ করিয়া ঘোঁড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী যখন হাওড়ার পুলের উপরে তখন অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত-কিরণে জাহ্নবী-বক্ষ সমুদ্ভাসিত, শাদা শাদা কপোতের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি পা'ল তুলিয়া চলিয়া যাইতেছে। পুলের উপরিস্থিত দুইটি রাস্তায় অসংখ্য গাড়ী, জনস্রোত ভেদ করিয়া ধাবিত হইতেছে, তাহাদের ঘর্ঘর শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। ষ্টেশনে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। নগেন্ দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল। টিকিট্ করিয়া অবিলম্বে আমরা একখানি মধ্যম-শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। এই সময় প্লাটফরমে যাত্রীদের ছুটাছুটি লক্ষ্য করিয়া আমাদের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্ষোভ উপস্থিত হইল। অবগুণ্ঠনবতী রঙ্গিল-চাদরে আপাদমস্তক আবৃত কুলবধূরা মলের শব্দে প্লাটফরম্ মুখরিত করিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কোন প্রকারে গাড়ীতে উঠিতে-ছেন, কিন্তু অন্যান্য রমণীদের ক্লেশের আর সীমা নাই। তাহারা মোট মাথায় সঙ্গীদের সহিত রোরুদ্যমান শিশু লইয়া ছুটিতে ছুটিতে অনবরত স্খলিত-পদ হইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কাবুলীদের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধোদ্দীপক। তাহারা কাহারও বাধা মানে না, পর্ব্বতাকার মোট মোটারি লইয়া যাত্রীদের ঘাড়ের উপর গিয়া চাপিয়া বসিতেছে। এ সকল ক্ষেত্রে রেল-পুলিস্ নীরব।

প্রথম ঘণ্টা বাজিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহিগণ পা-চালি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাগত বন্ধু বান্ধবের সহিত কর-মর্দ্দন শেষ করিয়া চুরোট-মুখে স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে টং টং টং

রবে দ্বিতীয় বার ঘণ্টা বাজিল। এই বার ষ্টেসন ক্ষণকালের জন্য নীরব নিস্তব্ধ হইল। স্বনামাঙ্কিত উষ্ণীষধারী ষ্টেসন-মাষ্টার্ গাড়ী ছাড়িবার অনুমতি দিলেন। গার্ড সর্ব্বশেষ গাড়ীখানির পাদানিতে দাঁড়াইয়া একটি সবুজ বর্ণের পতাকা ধীরে ধীরে দোলাইতে লাগিলেন। বিরাট ভুজঙ্গের ন্যায় শকটমালা হুস্ হুস্ শব্দে ষ্টেসন ত্যাগ করিল! তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। শুক্লপক্ষীয় সুধাংশুর কিরণমালায় সর্ব্বত্র আলোকিত। প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে উভয়দিকে তরুলতা-সমাচ্ছাদিত গ্রামগুলি অস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। আমরা নানাবিধ গল্পে নিরত হইলাম। কয়েকটি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, মেঠাইওয়ালারা সীতাভোগ সীতাভোগ বলিয়া চেঁচাইতেছে। বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন "সীতাভোগ" পরম উপাদেয়! সুরেশ বলিল,—"কিছু সীতাভোগ সংগ্রহ করা যাউক।" বিপিন কখনও বর্দ্ধমান দেখে নাই। সে, বর্দ্ধমানে নামিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। বিপিন স্পষ্টই বলিল,—"সেই বিদুষী রাজকুমারী বিদ্যা ও কাঞ্চীর যুবরাজ সুন্দরের মিলন-স্থান না দেখিয়া যাওয়া হইবে না।" নগেন্ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুরেশ নগেনের সহিত যোগ দিয়া বলিল,—"বিপিন তুমি বুঝি বিদ্যা-সুন্দরের কাণ্ডটাকে ঐতিহাসিক ঘটনা মনে কর?" বিপিন উত্তর করিল "নিশ্চয়।" ক্রমে বাদানুবাদ বাড়িয়া উঠিল। শেষে আমি বিপিনকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপ একটি গল্প বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। সংস্কৃত-ভাষায়ও বিদ্যাসুন্দর নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য দেখা যায়। উহার ঘটনা-স্থান উজ্জয়িনী নগরী। প্রথম কবি কৃষ্ণরাম বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তাঁহার গ্রন্থ তত প্রসিদ্ধ নহে। শেষে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের সন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত তদীয় সভাকবি সুপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর "অন্নদামঙ্গল" নামক একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা-

কাব্য রচনা করেন, "বিদ্যাসুন্দর" তাহারই একটি অংশ। কিঞ্চিদূন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হন। তদানীন্তন কালে ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা-কবিদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। যদিও তৎকালীন সমাজের রুচি অনুসারে তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা-কবিই তাঁহার ন্যায় ললিত-পদ-বিন্যাসের শক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।" আমার দীর্ঘ বক্তৃতায় বিপন নিরস্ত হইল। তাহার পর, আমরা তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ লোকের কলরবে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোক্ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দেখি, আমাদের গাড়ী একটি বড় ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একটি আলোকস্তম্ভে লেখা আছে "বাঁকীপুর।" আমার গাত্রোত্থানের শব্দে বন্ধুরাও উঠিয়া বসিলেন। অসংখ্য উৎকৃষ্ট আম্র ও লিচু দেখিয়া সকলেরই লোভ উপস্থিত হইল। আমরা ঐ স্থান হইতে কিছু ফল সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর, সুরেশ বলিল,—"ভাই! বাঁকীপুরে আসিলাম, কই পাটনা ত দেখিলাম না, পাটনাই না প্রাচীন "পাটলিপুত্র?" আমি উত্তর করিলাম,—"পাটলিপুত্র" বলিলে দানাপুর, পাটনা এবং বাঁকীপুর তিনটি ষ্টেসনকেই বুঝায়।" বন্ধুরা পাটলিপুত্রের পুরাতত্ত্ব শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংক্ষেপে পাটলিপুত্রের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই সময় অনেক প্রাচীন কাহিনী আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম পুরাকালে এই পাটলিপুত্র শস্যশ্যামলক্ষেত্র-শোভিত 'পাটলি' নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী-মাত্র ছিল। ভগবান্ বোধিসত্ত্ব ঐ মনোহর পল্লী সন্দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কালে এই পল্লী মহা-সমৃদ্ধ রাজধানীতে পরিণত হইবে।" তাঁহার ভবিষ্যবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল, নন্দবংশীয় রাজগণ শোণ-গঙ্গার পবিত্র সঙ্গমে এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া

দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। চাণক্যের কূটনীতিতে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন হইল, দাসীতনয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিলেন। সেই সময় পাটলিপুত্রের অভ্রংলিহ প্রাসাদমালা অপূর্ব্ব শোভা-বিস্তার করিত। রাজমহিলারা উন্মুক্ত বাতায়নপথে জাহ্নবীর লহরী-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেন। তাহার পর, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক ভারতবর্ষে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহার কীর্ত্তিকথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। মহারাজ অশোকের সমস্ত ভারতব্যাপী স্বচ্ছ জলাশয়, ছায়াশীতল রাজপথ, মনোজ্ঞ পান্থনিবাস ও ভৈষজ্যালয় সকল সুদীর্ঘকাল কত দীন দরিদ্রের হৃদয়ে অমৃত সেচন করিয়াছিল। তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমন পূর্ব্বক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি লাভ করিয়া কত পশুবৎ মানব-সম্প্রদায় মনুষ্যত্বের উন্নত সোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। অশোকের নরেন্দ্র-বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের (নালন্দ-বিহারের) শেষ স্মৃতি অদ্যাপি লোকের অন্তঃকরণ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও সেই ধার্ম্মিক নৃপতির পবিত্র অনুশাসন সকল পর্ব্বতগাত্রে ও পাষাণস্তম্ভে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই সকল কথা আলোচনা করিতে করিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রভাতকালে ট্রেণ্ বক্‌সারে উপস্থিত হইল। লোকের কলরবে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া বসিলাম। সুশীতল সমীরণ উন্মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া আমাদের গাত্রে সুধা-বর্ষণ করিতে লাগিল। বাল-সূর্য্যের লোহিত কিরণে পূর্ব্বদিক অনুরঞ্জিত। পাখীরা কুলায় ত্যাগ করিয়া নবোৎসাহে মধুর ধ্বনি করিতে লাগিল। এই রমণীয় সময়ে শরীর ও মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বলিলাম "ঐ দেখ বক্‌সারের ভীষণ প্রান্তর দেখা যাইতেছে, এখানেই ইংরেজদিগের

সহিত যুদ্ধে বাঙ্গালার নবাব মীরকাশীমের সমস্ত আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়াছিল।” ট্রেণ্ ছাড়িল, আমরা চৌশায় গিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলাম। পূর্ব্বাহ্ন নয়টার সময় ট্রেণ্ মোগলসরাই পৌঁছিল। আমরা কাশীযাত্রী, ঐ স্থানে নামিয়া আউদ রোহিলখণ্ডের ট্রেণে উঠিলাম। অন্যান্য যাত্রী লইয়া সেই সুদীর্ঘ শকটমালা দিল্লী অভিমুখে ছুটিল। আমাদের ট্রেণও অবিলম্বে ষ্টেসন ত্যাগ করিল। আমরা যখন কাশী ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, তখন পূর্ব্বাহ্ন দশটা।

এক্কায় আরোহণ করিয়া বন্ধুগণসহ নগর মধ্যে বাঙ্গালীটোলায় নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছিলাম। তাহার পর, মণিকর্ণিকাতীর্থে স্নান ও অন্যান্য তীর্থকৃত্য শেষ করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির অভিমুখে চলিলাম। স্বর্ণকলস ও স্বর্ণচূড়া-শোভিত মন্দির, দূর হইতে দেখিয়া হৃদয় মোহিত হইল। উহার উজ্জ্বল চূড়ার উপরি ভাগে ত্রিশূল ও পার্শ্বে পতাকা উড়িতেছে। বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির আর এখন বিদ্যমান নাই, উহা ঔরঙ্গজেব বাদসা কর্ত্তৃক বিনষ্ট ও মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাহা বলিতে পারা যায় না। কাশ্মীরের মহারাজ রণজিৎসিংহ উহার বেশভূষা করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের খিলান চূড়া প্রভৃতি তাঁহারই অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখন অত্যন্ত জনতা। ভক্ত নর নারীর বম্ বম্ মহাদেব রবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহার পর, অন্নপূর্ণার মন্দিরে গমন করিলাম; ইনিই কাশীর অন্নদায়িনী দেবী। ইঁহার প্রসাদে না কি কাশীতে একটি প্রাণীও অভুক্ত থাকে না। মন্দিরে যাইবার রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দীন দরিদ্র দয়ালু ব্যক্তিদের কৃপাপ্রার্থী হইয়া বসিয়া আছে। অনুমান দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্ররাজ পেশওয়া কর্ত্তৃক অন্নপূর্ণার মন্দির নির্ম্মিত হয়। অন্নপূর্ণার দর্শন শেষ হইলে কালভৈরবের মন্দির হইয়া আমরা বাসায় প্রত্যাগমন করি।

পর দিন অপরাহ্ণে চারি ঘটিকার সময় আমরা বারাণসীর দক্ষিণ-প্রান্তস্থ অসিসঙ্গম ঘাট হইতে নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভাগীরথী-বক্ষ হইতে বারাণসীর নয়নরঞ্জন দৃশ্য কি মনোহর! অনতিদূরে দুর্গাবাড়ীর অভ্রস্পর্শী মন্দিরের স্বুবর্ণ-খচিত চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। কিছু দূর অতিক্রম করিলেই আমাদের একটি বন্ধু বলিলেন;—"ঐ দেখুন, কেদারেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণভাগে মহাশ্মশান দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানেই সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট প্রতিশ্রুত দক্ষিণা পরিশোধের নিমিত্ত শ্বপচের দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।" বিপিন, বহু-মন্দির-শোভিত একটি প্রশস্ত ঘাট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল;—"এই ঘাটটির নাম কি?" আমি উত্তর করিলাম—"ইহাই সেই প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাট।" তাহার পর, আমরা মানমন্দির, মণিকর্ণিকাতীর্থ, বেণীমাধবের ধ্বজা, পঞ্চগঙ্গাতীর্থ প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে করিতে রেলসেতুর নিম্নভাগ দিয়া আদিকেশবের মন্দিরপর্য্যন্ত গমন করিলাম। আদি-কেশবের মন্দির বারাণসীর যে অংশে অবস্থিত, উহা ভীষণ-বনাকীর্ণ। যেমন, অসিনদী বারাণসীর দক্ষিণপ্রান্তে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তদ্রূপ বরণানদীও আদিকেশবের মন্দিরের অনতিদূরে ভাগীরথী-বক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী পঞ্চক্রোশ স্থানই বারাণসী নামে বিখ্যাত।

আগমনকালে ভাগীরথী-স্রোতের অনুকূলে আমাদের তরণী দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল আগত, নির্ম্মল গগনে একটি একটি করিয়া তারকা বিকসিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি যেন পর্ব্বত ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নায় জগৎ প্লাবিত হইল। গঙ্গাতীরে শারি শারি দীপ জ্বলিতেছে, দেবমন্দিরে আরতির সময় উপস্থিত, ঘণ্টা কাঁশরের মধুর ধ্বনি যেন কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেশ,

এই রমণীয় সন্ধ্যায় একটি ভক্তিভাবপূর্ণ গান আরম্ভ করিল, আমরা সকলেই তাহাতে যোগ দিলাম, দেখিতে দেখিতে নৌকা নির্দ্দিষ্ট ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া আমরা ঘোঁড়ার গাড়ীতে কাশী হইতে কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে সারনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সারনাথ একটি বৌদ্ধতীর্থ। অতিপ্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ভূরি ভূরি নষ্টাবশেষ এখানে বিদ্যমান। ললিতবিস্তর ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভগবান্ বোধিসত্ব প্রথমেই বারাণসীধামে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। যখন তিনি এই ক্ষেত্রে আগমন করেন, তখন ইহা ঋষিসেবিত যজ্ঞস্থল মাত্র ছিল। মহারাজ অশোকের অধিকারকালে বারাণসীধাম বৌদ্ধময় হয়। পৌরাণিকযুগ হইতে শৈবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধকীর্ত্তি অনন্ত, কে দেখিয়া শেষ করিতে পারে? বেলা অনেক হইল, মধ্যাহ্নে আমরা কোন বিশাল-তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলাম। প্রায় এক সপ্তাহ পরম আনন্দে কাটিল, কত সমবয়স্ক শিক্ষিত যুবার সহিত পরিচয় ও বন্ধুতা স্থাপিত হইল। বস্তুতঃ দেশভ্রমণে যে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা আমরা সামান্য ভ্রমণেই বিলক্ষণ অনুভব করিলাম। রেলপথ যে মানবের পক্ষে কত উপকারী, তাহা আমাদের সম্যক্‌ক পরীক্ষা করা হইল। পূর্ব্বকালে আত্মীয় স্বজনের নিকট শেষ বিদায় লইয়া মাসত্রয়ব্যাপী দুর্গমপথ অতিক্রম পূর্ব্বক যে বারাণসীতে আসিতে হইত, আমরা রেলশকটের কৃপায় হাসিতে হাসিতে দশপনের ঘণ্টার মধ্যে সেই দূরবর্ত্তী স্থানে অনায়াসে আসিয়াছি। রেলশকট যে ভ্রমণের বিশেষ সহায়, তাহা বিশেষভাবে অবগত হইলাম। পরদিনই পূর্ব্বাহ্নে আমরা পুনরায় গৃহ অভিমুখে যাত্রা করি, এবং সায়ংকালে কলিকাতায় উপস্থিত হই।

———০———

(নবদ্বীপ-গ্রাম।)

প্রথম ;—উহার নাম, ঐরূপ নামের সহিত ঐতিহাসিক কোন ঘটনার সম্বন্ধ আছে কি না? দ্বিতীয় ;—উহার অবস্থিতি, ঐ গ্রাম কোন্ প্রদেশের অন্তর্গত এবং রাজধানী হইতে কত দূরে? কোন নদী কিংবা রেলপথের পার্শ্বে অবস্থিত কি না? তৃতীয় ;—ঐ গ্রামের ও উহার চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল বায়ু ও মৃত্তিকার দোষ গুণ। চতুর্থ ;—ঐ গ্রামের পরিসর, লোকসংখ্যা, ধর্ম্মমত, আচার ব্যবহার, আমোদ উৎসব। পঞ্চম ;—ঐ গ্রামের অট্টালিকা, দেবমন্দির, উপাসনাগৃহ, বিদ্যালয়, বিচারভবন, জলনির্গমের পথ, পানীয় জল-প্রাপ্তির উপায়, শিল্প ও বাণিজ্য। ষষ্ঠ ;—ঐ গ্রাম অথবা উহার নিকটে সংঘটিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনা। সপ্তম ;—ঐ গ্রামে কোন অভাব আছে কি না? কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ অভাব দূর করা যাইতে পারে? তদ্বিষয়ে প্রস্তাব।

(৪)

নবদ্বীপ অতিবিখ্যাত গ্রাম। শুধু বাঙ্গালাপ্রদেশ কেন? আর্য্যাবর্ত্ত দক্ষিণাপথ কাশ্মীর আসাম ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি যে কোন স্থানের অধিবাসীর নিকট এই গ্রাম সুপরিচিত। তদ্ভিন্ন য়ুরোপ আমেরিকা-প্রভৃতি জনপদের সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগী কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ও এই স্থানের বিষয় কিছু কিছু অবগত আছেন। কেহ কেহ বলেন ;—"বেগবতী গঙ্গার দ্বিধাবিভক্ত প্রবাহের মধ্যস্থলে উৎপন্ন নূতন দ্বীপে বসতি বিস্তৃত হইয়া এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম নবদ্বীপ হইয়াছে।" অন্যেরা কহিয়া থাকেন, তাহা নহে ;—"নয়টি দীপ হইতেই নদীয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাই পণ্ডিতগণের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া 'নবদ্বীপ' এই আকার ধারণ করিয়াছে।" শেষোক্ত মতাবলম্বীরা নবদ্বীপ

নামকরণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেন। ঐ কিম্বদন্তীটি এই ;—"ভাগীরথীর একটি বিস্তৃত চড়ায় কৃষিকার্য্য উপলক্ষে কয়েক ঘর গোপ আসিয়া বাস করে। ঐ সময় এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাত্রিকালে ঐ চড়ায় ভাগীরথীরতীরে নয়টি দীপ জ্বালিয়া যোগ সাধনা করিতেন। একাদি ক্রমে দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত নয়টি দীপ দর্শন করিয়া নৌকা-রোহিগণ ঐ স্থানকে "নদীয়ার চড়" বলিত, তাহা হইতেই নদীয়া নামকরণ হয়। ক্রমে ঐ স্থানের স্বাস্থ্য, ভূমির উর্ব্বরতাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া সন্নিহিত পুরাতন-গ্রামবাসী কয়েক জন পণ্ডিত আসিয়া এখানে বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের বাসভবন ও চতুষ্পাঠী দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে জাহ্নবীতীর (নদীয়ার চড়) বিশেষ ভাবে অলঙ্কৃত হয়। স্থানীয় স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত মনোবৃত্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং নদীয়ার চড়ের মনস্বী অধ্যাপকদের যশঃ-সৌরভ অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। নানাদিগ্‌দেশীয় অসংখ্য বিদ্যার্থী আসিয়া ঐ স্থানের চতুষ্পাঠীর গৌরব বৃদ্ধি করে। অধ্যাপকেরা নদীয়ার চড়কে সংস্কৃত করিয়া 'নবদ্বীপ'-আখ্যা প্রদান করেন।"

এই নবদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গের একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান। ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রায় সত্তর মাইল উত্তরে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। প্রাচীনেরা বলেন ;—"পূর্ব্বে নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে ছিল, গঙ্গার গতিপরিবর্ত্তনে পশ্চিমভাগে আসিয়াছে।" অদ্যাপি নবদ্বীপের পশ্চিমভাগে বহুদূর ব্যাপী ভাগীরথীর পুরাতন খাত পরিলক্ষিত হয়। নবদ্বীপ, রাণাঘাট মুর্সিদাবাদ রেল-পথের কৃষ্ণনগর ষ্টেসন হইতে আট মাইল্ দূরবর্ত্তী। এই গ্রামের পূর্ব্বভাগে কলনাদিনী ভাগীরথী প্রবাহিত, পশ্চিমে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ও তরুরাজ-পরিশোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী। উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী চড়। ঐ দুইটি চড়ই নবদ্বীপের অধিবাসিগণের একমাত্র ভ্রমণের স্থান। উহার কোন অংশ বালকগণের

দৈনিক ক্রীড়ার ক্ষেত্র, কোন কোন স্থান হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্রে পরিশোভিত, কোথায়ও লোচন-লোভনীয় শস্যরাজি বিরাজিত, কোন স্থান নব-রোপিত আম্র ও কদলী-কাননে অলঙ্কৃত, কিয়দংশ কণ্টকাকীর্ণ বাবলাবনে সমাচ্ছন্ন। উত্তরদিকের চড়ের উত্তরাংশে অল্পদিন হইল, মাতাপুরের নিকটস্থ গঙ্গা হইতে একটি প্রবাহ বিনির্গত হইয়া বিস্তৃত চড় অতিক্রম পূর্ব্বক নবদ্বীপের উত্তরাংশে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ নব-প্রবাহিণীর বাম অঙ্কে বিমল-সমীর-পরিষেবিত প্রান্তরে আরণ্য কৃষকগণ ক্রমশঃ বসতি বিস্তার করিতেছে। নবদ্বীপের জল বায়ু পূর্ব্বে বিশেষ স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ছিল, কিন্তু সে দিন গিয়াছে, এখন বর্ষাকালে স্বনামধন্য ম্যালেরিয়া-জ্বর ও বসন্তের প্রারম্ভে কলেরার করালমূর্ত্তি সন্দর্শনে অধিবাসীদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এখানকার মৃত্তিকা বালুকামিশ্রিত এবং উর্ব্বরশক্তিসম্পন্ন।

নবদ্বীপের ভূপরিমাণ ১৪৭২ একার। লোক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। অধিবাসীদের সকলেই হিন্দু, একদিকে দশবার ঘর মাত্র মুসলমান বাস করে। হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক কিন্তু প্রাচীন অধিবাসীরা সকলেই প্রায় শৈব এবং শাক্ত। নবদ্বীপে বৈষ্ণব বলিলে তিন শ্রেণীকে বুঝায়। একশ্রেণী বৈদিক-আচার-সম্পন্ন বিষ্ণূপাসক গৃহস্থ। দ্বিতীয়শ্রেণী বৈদিক-আচার-বর্জ্জিত জাতি-বৈষ্ণব। ইহারা মালাচন্দন বিনিময়পূর্ব্বক ভার্য্যা পরিগ্রহ করে এবং নানাবিধ ব্যবসায় কার্য্যে রত থাকে। জাতি-বৈষ্ণবেরাও এক প্রকার গৃহস্থ। তৃতীয় ভেকধারী বৈষ্ণব। ভেক সন্ন্যাসের অনুকরণ হইলেও সকলেই ত্যাগী নহে, অনেকেই আপন আপন সেবাদাসীর সুখ সচ্ছন্দতা বিধানের নিমিত্ত নানা কৌশলে ধনসঞ্চয় করিয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন, এখন কালের পরিবর্ত্তনে অনেকে বিষয়কার্য্যে আসক্ত হইয়াছেন।

বিষয়াসক্তদেরও অনেকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এখানে হিন্দুধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। এপর্য্যন্ত এই স্থানের কেহ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করে নাই। নবদ্বীপে সকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণই বিদ্যমান। সকলেই প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

নবদ্বীপে আমোদ উৎসব যথেষ্ট। বৈশাখ মাসে পুষ্পদোল। জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা যোগে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রা ও রথের উৎসব হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে হিন্দোলায় বিলক্ষণ ধুম। দেবমন্দির-সমূহে দেববিগ্রহ সকল নানাবিধ মনোহর সাজে সজ্জিত হন। রাত্রিকালে দেবদর্শনার্থিনী রমণীদের নূপুরধ্বনিতে প্রত্যেক রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠে। আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবেও এখানে অল্প সমারোহ হয় না। আশ্বিনী অমাবস্থায় দীপান্বিতা পূজা। ঐ দিন গৃহে গৃহে করালবদনা মুক্তকেশী চতুর্ভুজার পূজা হয়। ঐ রাত্রিতে অনুসন্ধান করিলে ক্ষুদ্র গলি এবং কানাচেও কত কালীমূর্ত্তি পূজিত হইতে দেখা যায়। ঐ দিবস নবদ্বীপের সিদ্ধ-পীঠস্থা চারিটি শক্তিমূর্ত্তি পোড়ার মা, আগমেশ্বরী, ওলাদেবীও পাড়ারমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষভাবে অর্চ্চনা করা হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা এখানকার বিশেষ বা সর্ব্বপ্রধান উৎসবের দিন। সেই জ্যোৎস্নাময়ী শারদোৎফুল্ল-মল্লিকা বিভাবরীতে প্রতি দেবমন্দিরে রাসোৎসব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহিনী গোপযুবতীদের সহিত সমস্ত রাত্রি রাসচক্রে ঘূর্ণায়মান হন; চক্রের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পুষ্পিত-বৃক্ষ-লতা-পরিশোভিত কৃত্রিম উপবন সকল শোভা পাইতে থাকে। পুষ্পের সৌরভে বন আমোদিত, ভ্রমর মধুপানে মত্ত, হইয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করে। আহা এই মধুর যামিনীতে কি মধুর দৃশ্য! অন্যদিকে শৈব শাক্তদের মহানন্দ। প্রত্যেক পাড়ার নির্দ্দিষ্ট পীঠস্থানে কালী, তারা, শবশিবা, কৃষ্ণমাতা, বিন্ধ্যবাসিনী, গৌরাঙ্গ-বিন্ধ্যবাসিনী ভদ্রকালী

প্রভৃতি অসংখ্য তন্ত্রোক্ত দেবী-প্রতিমা নানাবিধ কৃত্রিম আভরণ এবং সাজ সজ্জায় পরিশোভিত হইয়া পল্লী উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই বিরাট-মূর্ত্তির পূজার আড়ম্বর ও যুবকগণের উৎসাহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমী হইতে কৃষ্ণ পক্ষীয় দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত আর এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, ইহার নাম গান বা ধূলোট্। রাঢ়ে বঙ্গে যত কীর্ত্তনওয়ালা আছেন, সকলেই সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ সময় নবদ্বীপে সমবেত হন। বড় আখড়ার সম্মুখস্থ প্রশস্ত নাটমন্দির ঐ কয় দিনের জন্য সংস্কৃত ও লতা-পত্র-পুষ্পে পরিশোভিত হয়। অহোরাত্র সেখানে মধুর পদাবলী গীত হইতে থাকে। কীর্ত্তনওয়ালাদের একদল বিশ্রাম করিতে যায়, আর একদল আসরে নামে, মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। দিবারাত্রি অসংখ্য নরনারী উন্মুক্ত-ভাবে এই মধুময় সংকীর্ত্তন শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করে। এই সকল শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। ইহাদের প্রত্যেকের নাসিকায় রসকলি ও হস্তে হরিনামের ঝুলি, মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম। শেষ দিনে ধূলিমহোৎসব, প্রভাতকাল হইতে অপরাহ্ণ দুইটা পর্য্যন্ত যে যাহাকে পায়, রাস্তার ধূলি দ্বারা ভূষিত করিয়া দেয়। গ্রাম্য বালক ও যুবকদল রাজপথে ধূলা খেলায় মত্ত হয়। বালিকা কিশোরীও ষোড়শীরা পর্য্যন্ত আমোদে মত্ত হইয়া দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ হইতে বাতায়ন-পথে খই ও মুড়ির মোয়া ছুড়িতে থাকে। বালক ও যুবকেরা উহার প্রতিদানে ঊর্দ্ধদিকে ধূলি ছুড়িয়া মারে। এইরূপে নবদ্বীপের ধূলোটের উৎসব শেষ হয়। ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায়ও ঘটা কম নহে। এক দিকে ভগবানের ফল্গুৎসব, ফল্গুচূর্ণে রাজপথ রঞ্জিত, অপরদিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব, অহোরাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনে সকলে মত্ত। ঐ দিনে পূর্ব্ব-বঙ্গের নরনারীগণ এক একটি দল বাঁধিয়া করতাল মৃদঙ্গ সহকারে কীর্ত্তন

করিতে করিতে নবদ্বীপ পরিক্রমণ করে। চৈত্র মাসে চড়ক-পূজা, বুড়াশিবের গাজন। ঐ সময় বুড়শিবতলায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর সঙ্ (পৌরাণিক দেব দেবী ও লৌকিক নরনারীর মূর্ত্তি) প্রস্তুত করিয়া দেখান হয়। তাহার পর, মহাসমারোহে বুড়াশিবের পূজা। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন রাত্রিতে অগ্ন্যুৎসব। সেই অগ্ন্যুৎসব যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখন ভুলিতে পারিবেন না, সে এক ভীষণ ব্যাপার। প্রত্যেক পাড়ার বালক ও যুবকেরা অরহরের কাষ্ঠরাশি সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘদূরব্যাপী একটি করিয়া মশাল প্রস্তুত করিয়া রাখে। বুড়াশিব শিবিকারোহণে গ্রাম পরিক্রমণে নির্গত হন। তাঁহার সম্মুখে ঐ সকল মশালের একাংশে অগ্নি সংযোগ করা হয়, অতিশুষ্ক অরহর কাষ্ঠ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আর বালক ও যুবকেরা উহার অপরাংশ ধরিয়া সমানে টানিয়া লইয়া যায়। অসংখ্য নর নারী রাজপথের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঐ মহান্ অগ্নিকাণ্ড দর্শন এবং 'বম্ বম্ মহাদেব' রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে। বৃহৎ মশাল পুড়িতে বিলম্ব হইলে অনেক সময় শিবিকাবাহক ও পুরোহিতের দল পাশ কাটিয়া মশাল অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে কিন্তু চতুর বালক ও যুবকগণ মশাল বাঁকাইয়া তাহাদের পথ রোধ করে। এইরূপ প্রত্যেক মশাল পুড়িতে ও ভক্তদের গৃহ পরিক্রমণে রাত্রি প্রায় কাটিয়া যায়, প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে বুড়াশিব পুনরায় স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাগত হন। এইরূপে নবদ্বীপের বাৎসরিক আমোদ প্রমোদ শেষ হয়।

নবদ্বীপ ধনী কিংবা জমিদারের বাসস্থান না হইলেও এখানে দেবমন্দির ও অট্টালিকার একান্ত অভাব নাই। যখন নৌকারোহণে ভাগীরথী পার হওয়া যায়, সেই সময় নদীয়ার মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ভব ও ভবতারিণীর অভ্রস্পর্শী মন্দিরের ত্রিশূল-চিহ্নিত চূড়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তীরে উপনীত হইলেই প্রথম সেই কাংশুকার-কুলোদ্ভব কৃতী পুরুষ গুরুদাসের গঙ্গাতীরশোভী দ্বাদশশিবের শুভ্র-মন্দিরশ্রেণী ও

পতনোন্মুখ অত্যুচ্চ সৌধসকল নয়নপথে পতিত হইয়া পার্থিব সম্পদের অস্থায়িত্ব বিষয়ে শিক্ষা দান করে। পূর্ব্ববঙ্গের সাহাজাতীয় ধনীদের অর্থ-সাহায্যে নির্ম্মিত গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মন্দির, রন্ধনশালা-প্রভৃতিও একান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ঐ সকল মন্দিরের কারুকার্য্যও বিশেষ প্রশংসার্হ। সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত অধ্যাপক স্বর্গীয় ব্রজনাথবিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সৌধটি দৃষ্টিগোচর করিলেও সহজে নয়ন ফিরান যায় না। বস্তুতঃ পুষ্পোদ্যানও মাধবীকুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ঐ স্থানটি বিলক্ষণ নয়নাভিরাম। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নবদ্বীপ শাস্ত্রালোচনার জন্য বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়। তজ্জন্য এখানে অনেক চতুষ্পাঠী বিদ্যমান। ঐ সকল চতুষ্পাঠী-গৃহের কতক তৃণনির্ম্মিত মেটে ঘর ও কতক পাকা কোঠা। ইষ্টকনির্ম্মিত চতুষ্পাঠীগুলির মধ্যে 'পাকাটোল' সর্ব্ব-প্রধান। ঐ চতুষ্পাঠী নবদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে কোন বিজন স্থানে অবস্থিত। পঞ্জাবের একটি বদান্য ধনী ব্যক্তি, লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে ঐ টোল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই অর্থে পঞ্চাশটি বিদ্যার্থী দৈনিক আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নবদ্বীপে আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাপথ, কাশ্মীর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল দেশের ছাত্রই অধ্যয়নার্থ আগমন করে। পাকাটোলে নানা-ভাষাভাষী ছাত্র দেখা যায়। নবদ্বীপের ছাত্রদের জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষারও বন্দোবস্ত না আছে এমন নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রণেতা নবদ্বীপনিবাসী স্বর্গীয় তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণের অর্থ-সাহায্যে একটি উচ্চশ্রেণী-ইংরাজি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টি স্থানীয় লোকের বিলক্ষণ হিতসাধন করিতেছে। নবদ্বীপে কোনরূপ বিচারালয় নাই, একটি পুলিশ্‌ষ্টেসন্‌ ও মিউনিসিপাল্‌ অফিষ আছে। এখানে জলনির্গমের পথের বড়ই অভাব। বর্ষাকালে ডোবা গর্ত্ত প্রভৃতি, তল্‌না-জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল

ঐ জল সঞ্চিত থাকিয়া বায়ু দূষিত এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের আহ্বান করে। স্থানীয় লোকেরা কূপ ও পুষ্করিণীর জলে অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেও পানার্থ ভাগীরথীর পবিত্র সলিলই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানকার শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কাঁশার ও পিতলের থালা গাড়ু ঘড়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের কাংশ্যকারেরা ঐ সকল দ্রব্য নির্ম্মাণে বিলক্ষণ পটু। এখানকার মোদকদের প্রস্তুত কাঁচাগোল্লাও বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। অল্প-মূল্যে এরূপ খাটি দ্রব্য অতি অল্প স্থানেই পাওয়া যায়।

নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব যথেষ্ট আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমুদয় উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। আবার, একেবারে উল্লেখ না করিলেও প্রবন্ধে অসম্পূর্ণতা-দোষ থাকিয়া যায়। তজ্জন্য যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করা যাইতেছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের দুই ক্রোশ পূর্ব্বে 'সুবর্ণ-বিহার' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ বলেন ;—"পালবংশীয় রাজাদের অধিকার কালে ঐ স্থানে একটি 'বৌদ্ধ-বিহার' ছিল। এখনও ঐ স্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ অট্টালিকা নির্ম্মাণকালে এখান হইতে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বল্লালসেন গঙ্গা ও জলাঙ্গীর পবিত্র সঙ্গমে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও জলাঙ্গীর পুনঃ পুনঃ গতি পরিবর্ত্তনে ঐ রাজধানীর চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু নবদ্বীপের পূর্ব্ব পারে বিল্বপুষ্করিণী যাইবার পথে 'বল্লালদীঘী' নামক একটি মৃত্তিকা-স্তূপ অদ্যাপি সেই প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মতে নবদ্বীপই বঙ্গদেশের পরাধীনতার আদিম ক্ষেত্র। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি, সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ আগমন করিয়া বিনা যুদ্ধে নবদ্বীপ রাজধানী অধিকার করেন। তদানীন্তন সেনবংশীয় বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণেয় সেন তীর্থযাত্রাচ্ছলে পরিবার সহ খিরকির দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া

নৌকাযোগে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রস্থান করেন। সেনবংশীয় রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী। সম্ভবতঃ উহা বর্ত্তমান নবদ্বীপের ঈশান-কোণে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত ছিল। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দে) চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারিত প্রেম-ভক্তিপূর্ণ অভিনব বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্লাবনে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল। ঐ সময়েই রঘুনাথশিরোমণি (প্রসিদ্ধ কাণাভট্ট) ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত মহাত্মা ন্যায়দর্শনের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত মহানুভব ও প্রাচীন স্মৃতি পুরাণ জ্যোতিষ তন্ত্র প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া এক ধারাবাহিক অভিনব স্মৃতি-নিবন্ধ প্রণয়ন করিয়া যান। বঙ্গদেশের যাবতীয় বৈধকার্য্য রঘুনন্দনের মীমাংসা অনুসারেই সম্পাদিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কৃত তন্ত্রসারে তন্ত্রোক্ত সমুদায় উপাসনা প্রাণালীই বর্ণিত আছে। নবদ্বীপে জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও বিলক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষেরা পশ্চিমরাঢ় হইতে কয়েকটি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতকে আনাইয়া নবদ্বীপে স্থাপন করেন। তাঁহাদেরই বংশধর বিখ্যাত জ্যোতিষী রামরুদ্রবিদ্যানিধি যুগপৎ পঞ্চকোট ও নদীয়া উভয় রাজধানীতেই সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথম বঙ্গীয় পঞ্জিকার সৃষ্টি করেন। রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থার ন্যায় নবদ্বীপের পঞ্জিকার মত সমুদয় বঙ্গে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইত। রামরুদ্রবিদ্যানিধির অধস্তন পুরুষেরা নদীয়ার মহারাজগণের আদেশে বহুকাল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। যখন বঙ্গদেশ মুসলমান শাসনাধীন ছিল, তখন মুর্শিদাবাদের নবাব বাৎসরিক পর্ব্ব দিন স্থির করিবার জন্য এবং গ্রহণাদির বিষয় জানিবার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রণীত পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন এবং এখন ও ইংরাজগবর্ণমেণ্ট ঐ প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

নবদ্বীপে অনেক বিষয়ের অভাব আছে, তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ;—একটি সাধারণ পাঠাগারের অভাব। নবদ্বীপের মধ্যভাগে একটি সাধারণ পাঠাগার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। উহা না থাকায় অধিকাংশ অল্পশিক্ষিত যুবক তাস্‌পাশা দাপা খেলা কিংবা কোন অনিষ্টকর আমোদে সময়ের অপব্যবহার করে। অতএব গ্রন্থপাঠ-স্পৃহা যে যুবকদের একটি নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায়, উহা বলা বাহুল্য।

দ্বিতীয় ;—জলনির্গমের প্রকৃষ্ট উপায়ের অভাব। নবদ্বীপে যে ম্যালেরিয়ার এত প্রভাব, বর্ষাকালে তল্‌না-জল নির্গত হওয়ার কোন প্রকৃষ্ট উপায় না থাকাই উহার প্রধান কারণ। অতএব নবদ্বীপের প্রত্যেক পাড়ার মধ্যদিয়া এরূপ জল-প্রণালী প্রস্তুত করা উচিত, যাহাতে সমুদয় বদ্ধ জল নির্গত হইয়া গ্রামকে শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর করে।

—o—

(কলিকাতা মহানগরী।)

কলিকাতার আদিম অবস্থা এবং ব্রিটিস্ বণিক্‌গণের আগমন, সুতানুটিতে কুঠি স্থাপন, স্থায়িরূপে বাণিজ্যের অধিকারলাভ ও সুতানুটি গোবিন্দপুর ক্রয়, ফোর্টউইলিয়ম্ দুর্গ স্থাপন, সুতানুটি গোবিন্দপুরের সহিত আটত্রিশ খানি পল্লীর সংযোগ, কলিকাতা নামের কারণ, উহার সীমা, রাজপ্রাসাদ অট্টালিকা, বিদ্যালয়, ধর্ম্মমন্দির, শোভা, সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(৫)

কালের অনন্ত মহিমা, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য। এক সময় যে স্থলে উন্নত পর্ব্বতমালা ও ঘনসন্নিবিষ্ট বনরাজি অনন্তকাল ব্যাপিয়া আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া ছিল, প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে অথবা

কালের অলঙ্ঘ্য শাসনে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থল ও উত্তুঙ্গ-তরঙ্গমালার অপূর্ব্ব ক্রীড়া-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। আবার, যেখানে অনন্তমহার্ণব নক্র-কুম্ভীরাদি ভীষণ জল-জন্তু সকল বক্ষে ধারণ করিয়া নিয়ত বিরাজমান ছিল, নৈসর্গিক নিয়মে অথবা সময়ের অব্যাহত-শক্তি-প্রভাবে সেখানে ও অনন্ত-সৌধময়ী মহানগরী সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া মানব-হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে। আমরা এখন যেখানে ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী ব্রিটিশ্-রাজপ্রতিনিধির বাসস্থান, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রিয়নিকেতন, কলিকাতা-মহানগরীর অনন্তশোভা প্রত্যক্ষ করিয়া মোহিত হইতেছি, এক সময় এখানে ও নীলাম্বুরাশির উদ্ধত বীচিমালা স্তরে স্তরে আবির্ভূত হইয়া পোতারোহী জনগণের হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিত। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন ;—"ইতিহাসাতীতকালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগ (ইংরাজ ভৌগোলিকেরা যাহাকে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন), তাহার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। বর্ত্তমান রাজমহল মুর্সিদাবাদ ও মালদহের মধ্যে কোন এক স্থানে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে যে সকল নদী তখন ঐ স্থানে আসিয়া পড়িত, তাহাদেরই স্রোতো-বাহিত মৃত্তিকারাশিতে ক্রমশঃ গাঙ্গেয়'ব'দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে।" অতএব কলিকাতা যে ভূভাগের উপর অবস্থিত, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগের নাম সমতট। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহ-মিহির-প্রণীত বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থে সমতট প্রদেশের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন্থসাঙ্ ভারতভ্রমণের সময় সমতটে আগমন করিয়াছিলেন, তখন ইহা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেই সময়ে কলিকাতা সমতট প্রদেশের দক্ষিণপ্রান্তে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ সুন্দরবন মধ্যে পরিগণিত ছিল। সংস্কৃত দিগ্‌বিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে কলিকাতা, 'কিলকিলা' নামে বর্ণিত হইয়াছে। আইন্-

আকবরী গ্রন্থেই প্রথম কলিকাতা নামের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সে সময়ে কলিকাতার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ইংরাজের আগমন হইতেই কলিকাতা নগরীর সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রদেশের বালেশ্বর ও পিপলিতে ইংরাজেরা প্রথমে কুঠি স্থাপন করিয়া নানা গোলযোগে বাঙ্গালায় বাণিজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। সুরাটের ইংরাজ-কুঠির অধীন 'হোপওয়েল'নামক জাহাজের শস্ত্রচিকিৎসক মিঃ গেব্রিয়েল বাউটন, সম্রাট্ শাজেহানের একটি কন্যার দুরারোগ্য অগ্নি-দগ্ধ-ক্ষত আরোগ্য করায় তিনি ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরস্কার-স্বরূপ একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। ঐ সনন্দে ইংরাজদিগকে দিল্লিসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ইংরাজেরা নবাব সায়েস্তা-খাঁর সময়ে হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া হুগলী, পাটনা, বালেশ্বর, কাশীম-বাজার ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বিপুল উৎসাহে বহু বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করেন। নানা কারণে নবাবের সহিত ইংরাজ-বণিকদিগের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইংরাজেরা হুগলী হইতে কুঠি উঠাইয়া লইয়া গঙ্গার দক্ষিণাংশে একস্থানে প্রধান কুঠি স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। বঙ্গোপসাগর হইতে হুগলী যাতায়াত উপলক্ষে ভাগীরথীর উভয় কূলের সকল স্থানই ইংরাজদিগের জানা ছিল। তাঁহারা নানাবিধ সুযোগ লক্ষ্য করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ সুতানুটি নামক স্থানই কুঠি নির্ম্মাণের জন্য মনোনীত করেন।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানির গোমস্তা জব-চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্য ও যাবতীয় ইংরাজ-কর্ম্মচারী সহ সুতানুটিতে আগমন করেন। যেখানে জব-চার্ণক প্রথমে অবতরণ করেন, ঐ ঘাটকে তখন সুতানুটি-ঘাট বলিত, উহা আহীরীটোলার ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরভাগে অবস্থিত ছিল। তখন সুতানুটিতে তুলা সূতা ও বস্ত্রের একটি হাট বসিত। কথিত আছে :—

বড়বাজারের শেঠ ও বসাকদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের যত্নেই নাকি ঐ হাট নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, জবচার্ণক অবিলম্বে ঐ স্থানে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ-তলে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ নিম্ববৃক্ষ হইতেই বর্ত্তমান নিমতলা নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-বণিক্গণ নবাব ইব্রাহিমখাঁর নিকট হইতে সুতানুটিতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারী রাজা শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইলে ইংরাজ ওলন্দাজ ফরাসী প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিক্গণ শত্রু হইতে আপন আপন উপনিবেশ রক্ষার্থ নবাবের নিকট হইতে দুর্গ নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই সময়েই ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ফোর্ট-উইলিয়ম্ দুর্গ নির্ম্মিত হয়। উহাই ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্বের মূল-ভিত্তি। তাহার পর, ইংরাজ বণিক্গণ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রা ও মূল্যবান্ ঔপঢৌকন দ্বারা তদানীন্তন নবাব আজিম-উস্সানকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুতানুটি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট বিয়ার্ডসাহেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পদে হেজেস্ সাহেব ও সেল্ডন সাহেব নিযুক্ত হন। এই সময় কতকগুলি তোপ আনাইয়া য়ুরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ১৩০ জন ও 'উইলিয়ম্ দুর্গ' সুরক্ষিত করা হয়। কলিকাতার অবস্থা এই রূপ দিন দিন উন্নত হওয়ায় নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করে। এই রূপে মহানগরী কলিকাতার প্রথম অবয়ব সংগঠিত হয়।

পূর্ব্বদত্ত সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সনন্দ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে ইংরাজ-বণিকগণ সর্ব্বপ্রকার শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবেন। কিন্তু নবাব মুর্সিদকুলিখাঁ ঐ সনন্দ উপেক্ষা করিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় ইংরাজদিগের নিকট হইতেও

শতকরা আড়াই টাকা (২৷৷০) শুল্ক গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দেন। তখনকার কলিকাতার গবর্ণর্ হেজেস্ সাহেব ইংরাজদিগের প্রতি এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবিধানের আশায় দূত পাঠাইবার জন্য কোর্ট-অব্-ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করেন। দূতগণ ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৮ই জুলাই তারিখে বহুমূল্য বিবিধ য়ুরোপজাত উপঢৌকন সহ দিল্লীনগরে উপনীত হন। ঐ সময়ে তদানীন্তন সম্রাট্ ফিরোক্‌শিয়ার্ দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। রাজকীয় চিকিৎসকগণ তাঁহার রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে সমর্থ হন নাই। সম্রাটের অনুমতি অনুসারে সমাগত দূতগণের অন্যতম ডাক্তার হামিণ্টন অতিবিচক্ষণতার সহিত চিকিৎসা করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে সম্রাট্‌কে রোগমুক্ত করেন। ইহাতে সম্রাট্ অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া উক্ত ডাক্তারের প্রার্থনা অনুসারে এক সনন্দ প্রদান করেন। উহার ফলে ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানির পূর্ব্ব প্রাপ্ত অধিকার বলবৎ হয় এবং মুর্সিদাবাদের টাকশালে তিনদিন কোপানির টাকা মুদ্রিত করিবার আদেশ দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কোম্পানি বার্ষিক ৮১২১৷৷০ টাকা রাজকোষে দিতে অঙ্গীকার করিয়া সুতানুটি কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সন্নিহিত ভাগীরথীর উভয় পারে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে ৩৮ খানি পল্লি গ্রাম ক্রয় করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। ঐ সকল গ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহই এখন কলিকাতা মহানগরীরূপে পরিণত হইয়াছে। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের পরিচালিত মহারাষ্ট্রগণ (বর্গী) যখন হুগলীনগর লুণ্ঠন করে, ঐ সময়ে ভাগীরথীর পরপারের অধিবাসিগণ কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাষ্ট্রগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজগণ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অনুমতি অনুসারে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে একটি গভীর পরিখা খনন করিতে আরম্ভ করেন, উহাই মহারাষ্ট্রখাত নামে উক্ত হইয়াছে। উক্ত খাত সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই

বর্গীর হাঙ্গামা চুকিয়া যায় সুতরাং সঙ্কল্পিত খাতের সমুদয় অংশ খনন করা হয় নাই। এখনও কলিকাতার পার্শ্বে স্থানে স্থানে ঐ খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার আদেশে অল্পকালের জন্য কলিকাতা 'আলিনগর' নামে অভিহিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর, যখন নবাব মীরজাফর নূতন সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন একটি সন্ধিদ্বারা ইংরাজ-বণিক্-সমিতি কলিকাতায় মৌরসী জমা প্রাপ্ত হন। ঐ সময় হইতেই কলিকাতা মহানগরীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়।

এই মহানগরীর উত্তরসীমা বাগ্‌বাজার, পূর্ব্বসীমা বেলেঘাটা, পশ্চিম-সীমা ভাগীরথী ও হাওড়াসহর, দক্ষিণসীমা কালীঘাট। কালীঘাট কলিকাতার মহাতীর্থ। কেহ কেহ বলেন,—"এই "কালী-কোঠা" হইতেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।" যাহা হউক, ইহা যে একটি অত্যন্ত প্রাচীন স্থান তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বৃহন্নীলতন্ত্রে উক্ত আছে ;— দক্ষযজ্ঞবিনাশকালে মহাদেব যখন সতীদেহ লইয়া নৃত্য করেন, তখন মহাদেব ও সতীর ভারে পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকে। ঐ সময় বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। ঐ সকল ছিন্ন অঙ্গ পৃথিবীময় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যেখানে যে অঙ্গ পতিত হয়, সেখানেই এক একটি পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কালীঘাটে সতীর বাম অঙ্গের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়। তজ্জন্য ইহার এত মাহাত্ম্য। এই স্থানটি প্রাচীন গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে কালীঘাটের চারিদিকে নিবিড় অরণ্য ছিল, লোকের বসতি ছিল না। এই বন মধ্যে কালিকা দেবী সামান্য পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। কাপালিক ও সন্ন্যাসীরা গুপ্তভাবে আসিয়া ইঁহার আরাধনা করিত, তজ্জন্য এই দেবী বৃহন্নীলতন্ত্রে 'গুহ্যকালী' নামে উক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বণিকগণ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত কালিকাদেবীর মন্দিরের নিকট নৌকা লাগাইয়া পূজা দিয়া

যাইত, তজ্জন্যই এই স্থান "কালীঘাট" নামে প্রসিদ্ধ হয়। কালীঘট্ট তীর্থের শক্তি কালিকা এবং ভৈরব নকুলেশ্বর। কালীদেবীর বর্ত্তমান মন্দির বড়িশার সাবর্ণচৌধুরীদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নির্ম্মিত এবং অল্পদিন গত হইল, একটি পঞ্জাবী বণিক্ নকুলেশ্বরের প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতায় দ্রষ্টব্য পদার্থ অনেক আছে। তন্মধ্যে চৌরঙ্গীর "ইণ্ডিয়ান্-মিউজিয়ম্" বা যাদুঘর অন্যতম। এই দূরব্যাপি-প্রাসাদমালায় পৃথিবীর যাবতীয় স্বভাবজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াই বাম ভাগে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, নানা পর্ব্বত হইতে সংগৃহীত বিবিধ বর্ণের উপলখণ্ড কাচ নির্ম্মিত আধারে শোভা পাইতেছে। তাহার পর, নানাবিধ খনিজ দ্রব্য দৃষ্ট হয়। একটি কাচের আবরণের মধ্যে বৃহৎ একখণ্ড উজ্জ্বল স্বর্ণ গৃহ আলোকিত করিয়া আছে। তাহার পর, নানাদেশীয় শিল্পিগণের নির্ম্মিত গৃহোপকরণ, বস্ত্র, অলঙ্কার, দেবপ্রতিমা, প্রাণিগণের ছবি, নয়নগোচর করিলে হৃদয় মোহিত হয়। পূর্ব্বদিকে বহুবিধ জীবের কঙ্কাল ভীষণ ভাবে দণ্ডায়মান। পুরাকাল হইতে যে সকল জলজ ও স্থলজ প্রাণী পৃথিবীতে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে, এখানে আসিলে তাহাদের সকলেরই কঙ্কালমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। দক্ষিণে অসংখ্য সুদর্শন পক্ষিসমূহের মৃতদেহ ঔষধবিশেষের শক্তিতে অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিম্নভাগে প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যাও ভাস্কর-কার্য্যের উদাহরণ-স্বরূপ যুগ যুগান্তরের বিবিধ দেবপ্রতিমা ও মানবমূর্ত্তি অতিযত্নে রক্ষিত আছে। ঐ অংশে বৌদ্ধ-যুগের অসংখ্য মূর্ত্তি ও নানাবিধ অক্ষরে উৎকীর্ণ অনুশাসন সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

"এসিয়াটিক্-সোসাইটি-অব্‌বেঙ্গল্" অথবা পুরাণা-যাদুঘর কলিকাতার অপর একটি দ্রষ্টব্য বিষয়। প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সুপ্রিম-

কোর্টের জজ্ বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত সার্ উইলিয়ম্‌জোন্স, রাজপ্রনিধির সাহায্যে প্রাচ্য সাহিত্যসেবিগণকে সমবেত করিয়া এসিয়ামহাদেশের পুরাতত্ত্ব, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। ভারতবর্ষ, য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সকল সভ্যদেশের কৃতবিদ্যগণই এই সভার সভ্য। চৌরঙ্গী ও পার্ক-ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে একটি বৃহৎ অট্টালিকায় এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এখানকার পুস্তকালয় অত্যন্ত বিখ্যাত। এখানে প্রাচ্যভাষায় রচিত অসংখ্য পুস্তক আছে। তন্মধ্যে বহুকালের লিখিত সংস্কৃত আরবী পার্শী ও বাঙ্গালাভাষার হস্তলিপিগুলি বিশেষ দর্শন-যোগ্য।

"জুওলজিক্যাল্ গার্ডেন্"বা পশুশালা কলিকাতার আর একটি দ্রষ্টব্য। এই স্থানে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণিগণের আদর্শ কতকগুলি জীবিত প্রাণী বিদ্যমান। ঐ সকল প্রাণীর আচরণ দেখিবার জন্য সকলেরই মনে কৌতূহল উৎপন্ন হয়। কোন স্থানে লৌহশলাকা-বেষ্টিত গৃহে বৃহৎকায় ব্যাঘ্র ভল্লুক চিত্রব্যাঘ্র সকল বিরাজমান। উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্বলে জলহস্তিসকল ক্রীড়ানিরত। স্থানে স্থানে দূর্ব্বাক্ষেত্রে বিবিধ প্রকার হরিণ বিচরণ করিতেছে। লৌহজাল-বেষ্টিত কতকগুলি গৃহে নানাজাতীয় সর্প রুদ্ধবীর্য্য হইয়া দীনভাবে কাল কাটাইতেছে। এই পশুশালা আলিপুর নামক স্থানে বঙ্গের লেপ্টনাণ্টগভর্ণরের বেল্‌ভেডিয়ার্ প্রাসাদের সন্নিধানে অবস্থিত। প্রত্যহ ইণ্ডিয়ান্-মিউজিয়ম্ ও জুওলজিক্যাল্-গার্ডেনে দর্শনার্থী অসংখ্য নর নারীর সমাগম হইয়া থাকে।

জুওলজিক্যাল্ গার্ডেন হইতে চৌরঙ্গী আসিবার পথে গড়ের মাঠে ফোর্ট-উইলিয়ম্ দুর্গ অবস্থিত। এখানে বহুসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ সৈনিক অবস্থিতি করে। উহারাই শত্রু হস্ত হইতে কলিকাতা মহানগরী রক্ষার সহায়। ফোর্টের মধ্যে ও বাহিরে সুকৌশলে বিন্যস্ত অসংখ্য কামান ও

গোলা গুলি সংগৃহীত রহিয়াছে। গড়ের মাঠের যে স্থলে মনুমেণ্ট বা ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত উচ্চস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে কতকগুলি লৌহময় বীরপুরুষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উঁহারাই ভারতবর্ষ অধিকার ও ইংরাজ-রাজ্যের সূত্রপাত হইতে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছেন।

"ইডেন্‌গার্ডেন্‌" কলিকাতার অপর একটি দর্শনীয় পদার্থ। স্বর্গে যেমন দেবতাদের বিহারের জন্য স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর তীরদেশে নন্দন-কানন বিরাজিত; সেখানে স্বর্গবাসীদের প্রীতির নিমিত্ত প্রত্যহ সংগীত ও বাদ্য হইয়া থাকে। ইডেন্‌গার্ডেন্‌ও তদ্রূপ মর্ত্ত্যলোকের নন্দনকানন, ইহাও মর্ত্ত্যগঙ্গা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এবং লোকের আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত এখানেও নিয়মিত দিবসে সংগীত ও বাদ্য হইয়া থাকে। এই উদ্যানের অসংখ্য পুষ্পিত তরুলতা, হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্র, মনোহর জলপ্রণালী, কৃত্রিম পর্ব্বতরাজি ও ব্রহ্মদেশীয় দারুময় বৌদ্ধ-মন্দির সন্দর্শন করিলে হৃদয় মুগ্ধ হয়। এই প্রমোদোদ্যানে কতকগুলি কৃত্রিম উৎস বা ফোয়ারা আছে। উহা হইতে উৎক্ষিপ্ত ছত্রাকার জলকণা বায়ু-সেবনকারীদের গাত্রে যেন অমৃত বর্ষণ করে। সায়ংকালে যখন উদ্যানময় বাষ্পালোক জ্বলিয়া উঠে, নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ঐকতানিক বাদ্য আরম্ভ হয় এবং উদ্যানের পশ্চিমভাগস্থ প্রশস্ত দূর্ব্বাক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় নরনারীগণ ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখনকার দৃশ্য কি মনোহর! মনে হয় যেন শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয়দের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যফলে স্বর্গের কিয়দংশ আনিয়া এখানে স্থাপন করা হইয়াছে।

ইডেন্‌-উদ্যানের উত্তরভাগেই ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ভারতের ভাগ্যবিধাতা গবর্ণর্‌-জেনেরালের আবাসভবন। প্রশস্ত ভূখণ্ডের মধ্যভাগে অসংখ্য-সোপান-শোভিত এই মনোহর প্রাসাদও দর্শকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। উহার চতুর্দ্দিকে চারিটি প্রধান দ্বার। ঐ সকল দ্বারে

সশস্ত্র প্রহরিগণ সর্ব্বদা দ্বার রক্ষা করে। প্রাসাদের মধ্যে রাজপ্রতিনিধির শয়নগৃহ, উপবেশনের কক্ষ, স্নানাগার, কার্য্যালয়, দরবার গৃহ প্রভৃতি বিদ্যমান। ঐ প্রাসাদে জাপানী চিত্রকরের নির্ম্মিত একখানি প্রশস্ত আলেখ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য। রাজপ্রতিনিধির বাসভবনের পশ্চিমভাগে একাউণ্ট-জেনেরাল্ বা রাজকীয় আয়ব্যয়-নিয়ামকের প্রশস্ত কার্য্যালয় ও হাইকোর্ট। এই হাইকোর্টই বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ। এই ধর্ম্মাধিকরণের দ্বাদশ জন বিচারপতি; ইঁহারা স্বয়ং ভারতসাম্রাজ্যের অধিপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া উচ্চতম বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এমন কি, প্রয়োজন হইলে স্বয়ং রাজপ্রতিনিধিকেও এই ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে হয়। উহার উত্তরভাগে বেঙ্গলব্যাঙ্ক (সাধারণ ধনাগার) এবং ব্যবহারাজীব (উকীল ব্যারিষ্টার্) দিগের কার্য্যালয়।

উহারই সন্নিহিত গঙ্গাতীরে ইম্পিরিয়াল্-লাইব্রেরি বা রাজকীয় প্রধান পুস্তকালয়। এই পুস্তকালয় বা পাঠাগারে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ভূমণ্ডলে এমন কোন সভ্যজাতির ভাষা নাই, যাহার পুস্তক এই পাঠাগারে সংগৃহীত না হইয়াছে। এখানকার পুস্তকালয়াধ্যক্ষ একজন বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি *, তাঁহার অধীনে কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারাই অধ্যক্ষের আদেশ অনুসারে জনসাধারণের পাঠসৌকর্য্যের নিমিত্ত পুস্তকালয়ের নানা শ্রেণীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই পুস্তকালয়ের অনতিদূরে পোর্টকমিশনারের অফিষ ও ছোট আদালত। উহার কিয়দ্দূর উত্তরে ষ্ট্রাণ্ডরোডের পূর্ব্বপার্শ্বে রাজকীয় টাকশাল। এখানে প্রতিদিন অসংখ্য সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে ডালহৌসি স্কয়ার্, এই স্থানটির দৃশ্য বড়ই মনোরম।

* এখন এই পুস্তকালয়াধ্যক্ষ মিঃ হরিনাথ দে M. A.

এই চতুষ্কোণক্ষেত্রের মধ্যভাগে লালদীঘী নামক প্রশস্ত জলাশয় কাক-চক্ষুর ন্যায় বিমল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজমান। উহার তীরে প্রশস্ত দূর্ব্বাক্ষেত্রে বিরল তরুলতা, নানাবিধ বিকসিত কুসুমে সুশোভিত হইয়া দর্শকের হৃদয় আকর্ষণ করে। এখানেও শ্বেতাঙ্গ ও অৰ্দ্ধশ্বেতাঙ্গ বালক বালিকাগণকে সান্ধ্য-বায়ু সেবন করাইবার নিমিত্ত ধাত্রী ও পরিচারকসম্প্রদায় প্রত্যহ অপরাহ্নে সমাগত হইয়া থাকে। এখন দেশীয় লোকেরাও মধ্যে মধ্যে এই সরোবর-তীরে পদার্পণ করিয়া থাকেন। এই দীর্ঘিকার পশ্চিমতীরে বড় পোষ্ট-অফিষ ও উত্তরে "রাইটার্সবিল্‌ডিং" বা ছোটলাটের কার্য্যালয়। দক্ষিণে বড়টেলিগ্রাম-অফিষ ও পূর্ব্বদিকে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের বিপণিশ্রেণী।

কলিকাতার কলেজ্‌স্কয়ার্‌ আর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানেও একটি বিমল জলবিশিষ্ট জলাশয় দর্শকের চিত্ত হরণ করে। উহার নাম গোলদীঘী। এই দীঘীর পশ্চিমতীরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রধান কার্য্যালয় ও সভাগৃহ অবস্থিত। প্রতিবৎসর, কনভোগেসন্‌ বা পারিতোষিক-বিতরণ-সভায় ভারত-রাজপ্রতিনিধি ইউনিভার্সিটির চ্যান্‌সেলার্‌রূপে এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন এবং অন্যান্য সময়ে ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার্‌ কর্ত্তৃক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।* য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য। ইঁহাদের প্রণীত নিয়ম অনুসারেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত সমুদয় বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়া থাকে। গোল-দীঘীর উত্তরে সংস্কৃত-কলেজ্‌ ও হিন্দুস্কুল্‌। সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজীভাষার সঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্য ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যাপিত হইয়া থাকে। হিন্দুস্কুলে হিন্দু ব্যতীত অন্য ছাত্র গ্রহণ করা হয় না। ইহা কলিকাতার যাবতীয় স্কুলের

* এখন কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস্‌ চেন্‌সেলার্‌ মাননীয় ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, M. A., D. L., D. Sc. etc.

মধ্যে প্রধান। দীঘীর পশ্চিমোত্তর-কোণে রাজপথের অপর পার্শ্বে প্রেসিডেন্সীকলেজ্ ও হেয়ার্ স্কুল্। প্রেসিডেন্সীকলেজই বাঙ্গালা দেশের প্রধানকলেজ্। দীঘীর দক্ষিণে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত সিটি-কলেজ্ বিদ্যমান। গোলদীঘী, অধিবাসিগণের বিশ্রামের স্থান হইলেও উহা এখন ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির বক্তৃতার জন্য তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রচারকগণ অপরাহ্নে এখানে নিয়মিতরূপে বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

কর্ণওয়ালিস্ স্কয়ার্ আর একটি দর্শনযোগ্য স্থান। এখানে হেদুয়া নাম্নী একটি পুষ্করিণী আছে। উহার তীরে প্রত্যহ অপরাহ্নে বায়ু-সেবনার্থীদের বিলক্ষণ ভিড় হয়। এই জলাশয়ের পূর্ব্বতীরে জেনেরাল্-এসিম্ব্লি-ইন্ষ্টিটিউসন্ নামক একটি খ্রীষ্ট-সম্প্রদায়ের পরিচালিত কলেজ্ বর্ত্তমান। পশ্চিমতীরে বেথুন্কলেজ্ ও মিস্নীলের স্কুল্ অবস্থিত। বেথুন্ কলেজই বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার একমাত্র স্থান। বীডন্ স্কয়ার্ও সমৃদ্ধিতে ন্যূন নহে। এই প্রশস্ত উদ্যানে অপরাহ্নে অসংখ্য লোক সমবেত হন। কলিকাতার দক্ষিণে ওয়েলেস্লি স্কয়ারে প্রশস্ত জলাশয়ের উত্তরতীরে মাদ্রাসা-কলেজ্ প্রতিষ্ঠিত। এই কলেজে ইংরাজীভাষার সহিত আরবী পার্শী সাহিত্য ও মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপিত হয়।

কলিকাতায় অসংখ্য রাজপথ বিদ্যমান। তন্মধ্যে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, গ্রে ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার-ষ্ট্রীট, বাগ্বাজার-ষ্ট্রীট্ চিৎপুর-রোড্ প্রভৃতি প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে দেশীয় ধনী ও জমিদারগণের বাসস্থলী। বড়-বাজার ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে নানাদেশীয় বণিক্গণ বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে মাড়োয়ারি ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসী লোকের সংখ্যাই অধিক। মুর্গীহাটা, চিনেবাজার প্রভৃতি স্থানে ইহুদী, মুসলমান ও দেশীয়দের অসংখ্য ষ্টেসনারি দোকান বিদ্যমান। বড়বাজারের উত্তরাংশ হাটখোলা উল্টাডিঙ্গী প্রভৃতি স্থান

পূর্ব্ববঙ্গবাসী বণিক্‌গণের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে সর্ব্ববিধ দ্রব্যের বিপণিসকল বর্ত্তমান। ভবানীপুর দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাসস্থান এবং বালীগঞ্জে য়ুরোপীয় ও য়ুরোপীয়-সভ্যতা-প্রাপ্ত দেশীয় লোকেরা বাস করেন। সার্কিউলার্ রোড্ কলিকাতার উত্তরাংশ হইতে পূর্ব্বদিক্ দিয়া দক্ষিণে চৌরঙ্গী রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই রাজপথের পূর্ব্বপার্শ্বে মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাগানবাটী, মূকবধির-বিদ্যালয়, ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়, শেয়ালদহ-ষ্টেসন, খ্রীষ্টানদিগের সমাধিক্ষেত্র, বিসপ্-কলেজ্ ও লর্ড বিসপের বাসস্থলী প্রভৃতি বিদ্যমান। চৌরঙ্গীতে আর্টস্কুল্ নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা দেশীয় লোকদের চিত্রবিদ্যাশিক্ষার একমাত্র স্থান।

কলিকাতার অধিবাসীদের অধিকাংশই হিন্দু। ইঁহাদের অনেক দেবমন্দির উপাসনালয় ও সভা-সমিতি আছে। যে সকল হিন্দু, বংশ-পরম্পরাগত আচার ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত। তাঁহাদের তিন সম্প্রদায়েরই তিনটি উপাসনালয় বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মস্‌জিদ ও গির্জার অন্ত নাই। কলিকাতাপ্রবাসী জৈনসম্প্রদায়ও মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা শেয়ালদহের উত্তরাংশে একটি বিজন স্থানে কতিপয় দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে তাঁহাদের তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ স্থানকে সাধারণ লোকে পরেশনাথের বাগান বলে। শ্বেত-পাষাণ-নির্ম্মিত ঐ সকল মন্দির ও মর্ম্মর-প্রস্তরে গ্রথিত সোপানবিশিষ্ট জলাশয় ও পুষ্পোদ্যানসকল দৃষ্টিগোচর করিলে হৃদয় মোহিত হয়। ধন্য জৈনগণ! তোমাদের অর্থব্যয়কে ধন্যবাদ! তোমাদের দেবমন্দিরের অঙ্গণে ও জলাশয়ের সোপানাবলীতে বসিয়া কত দীন দরিদ্র বিশ্রাম লাভ করিতেছে এবং অন্তরের সহিত তোমাদিগকে সাধুবাদ করিতেছে। কলিকাতায় এতদিন কোন বৌদ্ধ মন্দির ছিল না, সংপ্রতি চট্টগ্রামের

বৌদ্ধগণের যত্নে বহুবাজার কাপালিটোলায় একটি বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কয়েকটি সভা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। তন্মধ্যে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" "সাহিত্য-সভা" ও "সাহিত্য-সম্মিলন"ই প্রসিদ্ধ।

কলিকাতার পশ্চিম-প্রান্তস্থ হাওড়ার ব্রিজ বা ভাগীরথীর সেতু কলিকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। রজনীর প্রথম ভাগে বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় পরিশোভিত সেতুর উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া যদি ভাগীরথীর উভয় তীরে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে তীরস্থ সৌধময়ী নগরী বাষ্পপোত ও অর্ণবযান সকল নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। বস্তুতই ভাগীরথীর এই নৌ-সেতুটি য়ুরোপীয় স্থপতিগণের অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্য প্রকটিত করিতেছে।

কলিকাতার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কলিকাতাবাসীদিগকে কোন ঋতুরই আতিশয্য ভোগ করিতে হয় না। ষড়্ঋতুর মধ্যে এখানে তিনটি ঋতুর প্রভেদ স্পষ্ট অনুভূত হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, তাহার পর, ভাদ্র পর্য্যন্ত বর্ষা, তৎপরে কার্ত্তিকের শেষ হইতে শীত ঋতুর আবির্ভাব হয়। অগ্রহায়ণের শেষ হইতে মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত শীত ঋতু প্রবল থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ঝড় হয়। ঝড়ের সময় কেবল উত্তর পশ্চিম হইতে বায়ু বহিতে থাকে। অপরাহ্লেই প্রায় ঝটিকা হইতে দেখা যায়! এখানকার ঝড়ে বজ্রপতন ও বিদ্যুৎ-স্ফুরণ অধিক হয়। এতদ্ভিন্ন সাধারণ বায়ুর আর্দ্রতা কিছু অধিক। স্বাস্থ্য সাধারণতঃ মন্দ নহে কিন্তু ভীষণ প্লেগ, বসন্ত, কিংবা বিসূচিকা যখন মুখব্যাদান করে, তখন সকলেরই হৃদয় কম্পিত হয়।

———o———

প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত বস্তু-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখ।

নৈসর্গিক পদার্থ।

১। তুষার-নদী।

২। জল-প্রপাত।

৩। উষ্ণ-প্রস্রবণ।

৪। হিমশিলা।

—০—

জনপদ।

৫। মিশর।

৬। চীন।

৭। ব্রহ্মদেশ।

৮। জাপান।

৯। নেপাল।

১০। কাশ্মীর।

—০—

দ্বীপভূমি।

১১। সিংহল।

১২। সুমাত্রা।

১৩। যবদ্বীপ।

১৪। বালিদ্বীপ।

—০—

দ্বীপপুঞ্জ।

১৫। ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ।

১৬। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

হ্রদ।

১৭। মানস সরোবর।

১৮। কাস্পিয়ান্ হ্রদ।

১৯। বৈকালিক হ্রদ।

২০। ভিক্টোরিয়া হ্রদ।

২১। চিল্কা হ্রদ।

—০—

নদ নদী।

২২। সিন্ধু।

২৩। গঙ্গা।

২৪। ব্রহ্মপুত্র।

২৫। রাইন্ নদী।

২৬। নীল নদ।

২৭। মিসিসিপি।

২৮। টেমস্।

—০—

পর্ব্বত।

২৯। হিমালয়।

৩০। নীলগিরি।

৩১। বিন্ধ্য।

৩২। আল্পস্।

৩৩। এণ্ডিস্।

৩৪। এলবুর্জ।

গুহা।

৩৫। ইলোরা।
৩৬। অজন্তা।
৩৭। খণ্ডগিরি।

—o—

উপত্যকা।

৩৮। শূর্ম্মা উপত্যকা।
৩৯। তরাই।

—o—

উপসাগর।

৪০। বঙ্গোপসাগর।
৪১। পারস্যোপসাগর।
৪২। কাম্বে উপসাগর।

—o—

খনি।

৪৩। মহীশূরের স্বর্ণের আকর।
৪৪। পেরুদেশের রৌপ্যের আকর।
৪৫। বলিভিয়ার তাম্রের আকর।
৪৬। গোলকুণ্ডার হীরকের আকর।
৪৭। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি।

—o—

আব্ হাওয়া।

৪৮। সিংহলের জলবায়ু।
৪৯। আসামের জলবায়ু।

মরুভূমি।

৫০। সাহারা।
৫১। রাজপুতানা।

—o—

নগরী।

৫২। দিল্লী।
৫৩। পাটনা।
৫৪। লাহোর।
৫৫। পুনা।
৫৬। বম্বে।
৫৭। মান্দ্রাজ্।

—o—

বন্দর।

৫৮। সপ্তগ্রাম।
৫৯। তাম্রলিপ্তি।
৬০। করাচী।
৬১। মসুলীপট্টন।
৬২। চট্টগ্রাম।

—o—

দেবমন্দির।

৬৩। জগন্নাথের মন্দির।
৬৪। ভুবনেশ্বরের মন্দির।
৬৫। বিশ্বেশ্বরের মন্দির।
৬৬। সেণ্টপিটার্স্ ক্যাথিড্র্যাল্।
৬৭। জুম্মা-মস্জিদ্।

স্তম্ভ।

৬৮। প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ।
৬৯। দিল্লীর কুতুপ্‌মিনার।
৭০। কলিকাতার মনুমেণ্ট।
৭১। বম্বের রাজাবাই টাওয়ার্।

—০—

সমাধি-মন্দির।

৭২। হুমায়ুন ষ্টুম্।
৭৩। আকবরের সমাধি মন্দির।
৭৪। তাজমহল।

—০—

প্রাণী।

৭৫। পত্রবাহী কপোত।
৭৬। গণ্ডার।
৭৭। হস্তী।
৭৮। তিমি মৎস্য।
৭৯। তিব্বতের বন্য গর্দ্দভ।
৮০। কস্তুরী মৃগ।
৮১। রাত্রিচর শাখামৃগ।
৮২। অনুকারী পক্ষী।
৮৩। ময়ূর।

—০—

বৃক্ষ ও লতা।

৮৪। অশ্বত্থ তরু।
৮৫। গন্ধরাজ বৃক্ষ।
৮৬। মাধবী লতা।
৮৭। তরুলতা।

—০—

ব্যবসায়।

৮৮। ইষ্টক প্রস্তুত করা।
৮৯। লৌহখনির কার্য্য।
৯০। কাচ প্রস্তুত করা।
৯১। কাগজ প্রস্তুত করা।

—০—

বিমিশ্র।

৯২। কোন পতঙ্গের জীবনের ইতিহাস।
৯৩। মানবের চক্ষু।
৯৪। চিরহরিদ্বৃক্ষ।
৯৫। মধুচক্র।
৯৬। দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।
৯৭। তসরের গুটিপোকা।
৯৮। টাকশাল।
৯৯। হিন্দোলোৎসব।
১০০। দুর্গা-পূজা।
১০১। দোলযাত্রা।

—০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘটনাবিষয়ক রচনা।

(ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর।)

(১) ভোজরাজ কর্ত্তৃক রাজগণের নিমন্ত্রণ, (২) নৃপতিগণের বিদর্ভ-নগরে আগমন, (৩) স্বয়ম্বরসভা, (৪) সুনন্দা কর্ত্তৃক সভাস্থ নৃপতিগণের বংশ ও গুণকীর্ত্তন, (৫) ইন্দুমতী কর্ত্তৃক অজকে বরমাল্য দান, (৬) পুর-প্রবেশকালে নাগরিক মহিলাদের বর সন্দর্শন। (৭) যথাবিধি বিবাহ, (৮) ইন্দুমতীসহ গৃহগমনকালে ভগ্নমনোরথ নৃপতিগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে অজের আক্রমণ ও তাঁহার জয়লাভ, (৯) অজের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন !

(১)

মধ্যভারতবর্ষে বিদর্ভ নামে একটি রমণীয় নগরী বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বকালে ঐ নগরীতে ভোজবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। ভোজ-রাজের ভগিনী ইন্দুমতী বিদুষী ও অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী। পুরাকালে নিয়ম ছিল, কোন রমণী বিশেষ শিক্ষিতা হইলে তিনি স্বয়ং বর নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। ইন্দুমতীর ভ্রাতা ভোজরাজ ভগিনীকে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানের অধিকারিণী দেখিয়া তাঁহার স্বয়ম্বরের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতবর্ষ ও প্রত্যন্ত দেশস্থ নিখিল রাজন্য-বর্গ বিদর্ভ রাজধানীতে আগমনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইলেন। ভোজ-রাজের দূত অন্যান্য রাজধানীর ন্যায় অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া তদানীন্তন অযোধ্যাধিপতি রঘুর নিকট বিদর্ভরাজের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিল। রঘু ভাবিলেন 'ভোজবংশের সহিত সম্বন্ধ অত্যন্ত গৌরব-জনক, বিশেষ পুত্রেরও বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত,—অতএব কুমার অজকে এই স্বয়ম্বরক্ষেত্রে প্রেরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।'।

তাহার পর, তিনি যথাসময়ে কুমারকে সৈন্যসামন্তে সজ্জিত করিয়া বিদর্ভ গমনের আদেশ করিলেন। অজ মহোৎসাহে যাত্রা করিলেন। পথে যেখানে বিশ্রামের প্রয়োজন হইত, সেখানেই পটভবন প্রস্তুত হইত *। কুমারের ঐরূপ পটভবনে বিশ্রামকালে জনপদবাসী প্রজাবর্গ তাঁহাকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিত। তিনি পরম আনন্দে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এই মনোহর ভ্রমণ তাঁহার পক্ষে উদ্যান বিহারের ন্যায় অত্যন্ত সুখকর হইয়াছিল। কুমার একদা ক্লান্ত সৈন্যগণের বিশ্রামের নিমিত্ত তরুরাজি-পরিশোভিত নর্ম্মদাতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তরঙ্গ-সংসর্গী সুশীতল সমীরণ তাঁহার দেহের সমস্ত অবসাদ দূর করিল। অজ সহসা দেখিতে পাইলেন, নর্ম্মদা প্রবাহের উপরিভাগে একস্থানে কতকগুলি ভ্রমর উড়িতেছে। উহা নয়নগোচর করিয়া তাঁহার মনে হইল, নিশ্চয়ই কোন বন্যগজ নর্ম্মদা জলে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঐ স্থান হইতে বারি ভেদ করিয়া এক মহাগজ উত্থিত হইল। রাজকীয় হস্তিসমূহ সন্দর্শনে তাহার বারিবিধৌত গণ্ডস্থল হইতে পুনরায় মদ-বারি ক্ষরিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই উৎকট মদগন্ধে সৈন্যগণের মাতঙ্গ সকল এরূপ ভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে, হস্তিরক্ষকেরা বহু যত্ন করিয়াও তাহাদের তীব্র বেগ দমন করিতে পারিল না। মাতঙ্গগণ বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়নপর হওয়ায় সেনারা রথস্থ মহিলাদের রক্ষার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল, ক্ষণকালের মধ্যে রাজকীয় শিবির হইতে মহাকলরব উত্থিত হইল।

অজ শুনিয়াছিলেন বন্যগজ রাজার অবধ্য কিন্তু কি করেন, আপাততঃ তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই গজ বিদ্ধমাত্র হস্তিদেহ ত্যাগ করিয়া মনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল এবং অজের দেহে স্বর্গীয় কুসুমরাশি বর্ষণ

* পটভবন প্রস্তুত করা—তাঁবু খাটান।

করিতে লাগিল। তাহার পর, স্বীয় অঙ্গপ্রভায় তত্রত্য সৈন্যগণকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া বলিতে লাগিল ;— রাজকুমার! আমি হস্তী নহি, সুরলোকে প্রিয়দর্শননামা যে গন্ধর্ব্বরাজ আছেন, আমি তাঁহারই পুত্র, আমার নাম প্রিয়ম্বদ। মহর্ষি মতঙ্গ আমার গর্ব্বিত ব্যবহারে কুপিত হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই এই মতঙ্গদেহ হইয়াছিল। অভিশাপ প্রদানের পর অনেক অনুনয় করায় ঋষি শাপবিমোচনের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তিনি বলিয়াছিলেন ;—ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত অজ যখন লৌহাগ্র বাণদ্বারা তোমার কুম্ভ ভেদ করিবেন, তখনই তুমি পুনরায় স্বীয় দেহ লাভ করিতে পারিবে। আমি বহুকাল তোমার সন্দর্শন বাঞ্ছা করিয়া এখানে কাল অতিবাহিত করিতেছিলাম, সংপ্রতি নিজ বিক্রম-প্রভাবে আপনি আমাকে সেই দারুণ শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। অতএব এখন যদি আমি আপনার প্রত্যুপকার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার স্বীয় পদলাভ বিফল হয়। হে সখে! প্রয়োগ ও প্রত্যাহার মন্ত্রের সহিত এই সম্মোহন নামক গান্ধর্ব্ব অস্ত্র আপনাকে প্রদান করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া এই অপূর্ব্ব অস্ত্র পরিগ্রহ করুন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দ্বারা কাহারও প্রাণবিনাশ হয় না কিন্তু ইহার প্রভাবে অনায়াসে শত্রু বিজয় করা যায়। এই অস্ত্র গ্রহণে কোনরূপ ইতস্ততঃ করিবেন না, আপনি আমার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিয়াও যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমি এই অস্ত্র গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিতে সাহসী হইতেছি, অতএব আপনি প্রার্থনা বিফল করিয়া আমার হৃদয়ে ক্লেশ প্রদান করিবেন না।

অজ কোনই আপত্তি করিলেন না, নর্ম্মদার পবিত্র সলিল দ্বারা আচমন শেষ করিয়া সেই গন্ধর্ব্ব হইতে মন্ত্রসহ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। দৈবযোগে পথিমধ্যে অচিন্তনীয় কারণে উভয়ের এই বন্ধুত্ব সংঘটিত হইল। তাহার পর, একজন (প্রিয়ম্বদ) চৈত্ররথ প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা

করিলেন এবং অপর জন (অজ) রমণীয় বিদর্ভ রাজধানীর প্রতি প্রস্থান করিলেন। অজ সৈন্য সামন্ত সহ নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেই তাঁহার আগমনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া বিদর্ভরাজ অত্যন্ত আদরের সহিত তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। সেই সময় তাঁহাদের উভয়ের অমায়িক ব্যবহারে লোকে বিদর্ভরাজকেই আগন্তু এবং অজকে গৃহপতি মনে করিয়াছিল। তাহার পর, বিদর্ভরাজের ভৃত্যগণ অজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসভবন প্রদর্শন করিলে অজ আনন্দের সহিত দ্বারে পূর্ণকুম্ভ-শোভিত সেই রমণীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই অলৌকিক লাবণ্যবতী রাজকুমারীর লাভের আশায় আজ ভারতবর্ষ ও প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ যাবতীয় নৃপতির চক্ষে নিদ্রা নাই, অজও সেই ললনাকুলের আদর্শ ইন্দুমতীর চিন্তায় রাত্রির অনেক অংশ বিনিদ্রনয়নে অতিবাহিত করিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে বৈতালিকেরা উদাত্তস্বরে স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিলে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন।

তাহার পর, রাজন্যবর্গ যথাবিধি সমাহূত হইয়া স্বয়ম্বর-সভায় গমন করিলেন। বিদর্ভরাজ পূর্ব্বেই তাঁহাদের মর্য্যাদা অনুসারে মঞ্চোপরি শ্রেণীবদ্ধভাবে সিংহাসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। নৃপগণ ক্রমে ক্রমে গিয়া সেই সকল আসন অধিকার করিলেন। কুমার অজ যখন সুবর্ণময় সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সকল নৃপতিরই অন্তঃকরণ হইতে ইন্দুমতীলাভের আশা তিরোহিত হইল। তখন যিনিই স্বয়ম্বর-সভায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন, তিনিই মোহিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ শোভা যেন বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া সেই স্থানে বিরাজ করিতেছিলেন। যেমন সমস্ত দেবকুসুমের মধ্যে পারিজাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোভা পায়, সেইরূপ কুমার অজ স্বীয় অলৌকিক সৌন্দর্য্য-প্রভাবে সকল নৃপতির মধ্যে

সমধিক দীপ্তি পাইয়াছিলেন। যেরূপ তরুসমূহে নানাবিধ কুসুম বিকশিত হইলেও ভ্রমরগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া মদস্রাবী মহাগজের গণ্ডস্থলে গিয়া নিপতিত হয়, সেই রূপ স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত পুর-বাসীদিগের নয়নপংক্তি ও অন্যান্য নৃপতিকে পরিহারপূর্ব্বক অজের উপরে পতিত হইয়াছিল। তাহার পর, বৈতালিকেরা উদাত্তস্বরে চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীর নরপতিগণের প্রাচীন কীর্ত্তিকথা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল এবং অগুরু ধূপের ধূমরাজী গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, উপবনস্থ ময়ূরগণ ধূমদর্শনে মেঘভ্রমে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। পুররমণীগণ মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই সময় স্বয়ম্বরা রাজকুমারী ইন্দুমতী পরিণয়োচিত বিবিধ বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মনুষ্যবাহ্য চতুর্দ্দোলে আরোহণ পূর্ব্বক বিবাহ-ক্ষেত্রে দেখা দিলেন। বাহকেরা সেই সভাস্থ রাজপংক্তির মধ্য দিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ঐ সময় সমাগত নৃপতিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন নয়নরূপে পরিণত হইয়া সহস্র সহস্র মানবের লক্ষ্য সেই রাজকুমারীতে পতিত হইল। সভাস্থ ভূপতিগণ স্বয়ম্বরার প্রতি স্ব স্ব প্রেম প্রকাশের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় অন্তঃপুর-রক্ষিকা সুনন্দা রাজকুমারী ইন্দুমতীকে লইয়া নৃপতিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সুনন্দা দ্বারপালিকা হইলেও তাহার বিজ্ঞতার অভাব ছিল না। সে ভারতবর্ষ ও প্রত্যন্ত প্রদেশের সমুদয় নৃপতির বংশও গুণ-গ্রামের বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিল। সুনন্দা প্রথমেই রাজকুমারীকে মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিল;—"ইনি মগধ প্রদেশের অধীরশ্বর, ইঁহার নাম পরন্তপ। এই নৃপতি যে নামে মাত্র পরন্তপ তাহা নহেন, কার্য্যেও পরন্তপ (শত্রুতাপন)। ইনি যে কেবল শরণাগত ব্যক্তিদেরই আশ্রয়দাতা তাহা নহে, প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত ও

লব্ধপ্রতিষ্ঠ। জগতে সহস্র সহস্র নৃপতি থাকিলেও একমাত্র ইঁহার জন্যই পৃথিবী রাজন্বতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রজনী নক্ষত্র-তারা-গ্রহ-প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীতে পরিশোভিত হইলেও চন্দ্রমার প্রভাবেই প্রধানতঃ জ্যোতির্ম্ময়ী আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। এই রাজা অজস্র যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং হব্য-লোভে দেবরাজকে সর্ব্বদাই ইঁহার গৃহে প্রবাসী অবস্থায় অবস্থান করিতে হয়, তজ্জন্য বিরহিণী ইন্দ্রাণী প্রায় কখনও কপোল-বিলম্বী অলকদাম মন্দারকুসুমে পরিশোভিত করিবার অবসর প্রাপ্ত হন না। যদি ইচ্ছা হয়, ইঁহাকে বরমাল্য অর্পণ কর। তাহা হইলে তুমি যখন পরিণীতা হইয়া স্বামিভবনে নীত হইবে, তখন তোমার দর্শনের নিমিত্ত উৎসুক পুষ্পপুরাঙ্গনারা প্রাসাদের গবাক্ষদেশে ত্রস্তভাবে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, তুমি তাঁহাদের নয়নের আনন্দ বিধান করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিবে।"

সুনন্দার বাক্য শেষ হইলে ইন্দুমতী একটি প্রেমশূন্য প্রণিপাত করিয়া অচিরে সে স্থান ত্যাগ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। মানস-সরোবরের তরঙ্গমালা যেমন রাজহংসীকে একটি পদ্মের নিকট হইতে অপর পদ্মের সন্নিধানে উপস্থিত করে, সেইরূপ বেত্রধারিণী সুনন্দাও ইন্দুমতীকে মগধেশ্বরের নিকট হইতে অঙ্গদেশের অধীশ্বরের নিকট উপস্থিত করিল। তাহার পর, সে বলিতে আরম্ভ করিল;—"ইনি অঙ্গনাথ, ইঁহার যৌবনশ্রী সুরাঙ্গনাদিগেরও একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেবর্ষিগণের সাহায্যে ইনি ঐরাবততুল্য অসংখ্য হস্তীকে সুশিক্ষা দ্বারা বশীভূত করিয়া ভূতলে অবস্থিতি করিয়াই স্বর্গরাজ্যের সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই রাজার এতই বিক্রম যে, ইঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত শত্রুনরপতি-গণের শুদ্ধান্তবাসিনীদিগকে নিরন্তর গলদশ্রুনয়নে কালযাপন করিতে হয়। স্বভাবতঃ ভিন্নস্থানবাসিনী হইলেও লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ইঁহার গৃহে একত্র অবস্থান করেন। সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যে তোমাতে তাঁহাদের

সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান, অতএব তুমি সংপ্রতি ইঁহার মহিষী হইয়া তাঁহাদের তৃতীয়া হও।” ইন্দুমতী অঙ্গরাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া নয়ন ফিরাইলেন, এবং চল বলিয়া সুনন্দাকে যাইতে আদেশ করিলেন। বস্তুতঃ অঙ্গরাজ যে কামনার অযোগ্য তাহা নহে এবং ইন্দুমতীও যে বর নির্ব্বাচনে অনভিজ্ঞা তাহাও বলিতে পারা যায় না, তবে মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। তাহার পর, সুনন্দা ইন্দুমতীকে নবোদিত চন্দ্রমার ন্যায় রূপবান্ এবং মহাপরাক্রান্ত অবন্তীদেশের অধীশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিতে লাগিল ;—“ইনি অবন্তীদেশের অধিপতি, ইঁহার দেহ যেমন সুগঠিত তেজও তেমনি প্রখর, যুদ্ধযাত্রা কালে ইঁহার অশ্বগণের খুরোত্থিত ধূলি মহাপ্রতাপান্বিত সামন্তরাজগণের মুকুট-মণির প্রভাকেও মলিন করিয়া দেয়। উজ্জয়িনীনগরে মহাকাল-মন্দিরের অনতি-দূরে এই রাজার প্রাসাদ, সুতরাং ইনি কৃষ্ণপক্ষেও চন্দ্রমৌলির কৃপায় জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন। অয়ি ইন্দুমতি! এই যুবাকে বরমাল্য প্রদানের নিমিত্ত তোমার অভিলাষ হয় না কি? যদি তুমি ইঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে মিলিত হও, তাহা হইলে শিপ্রা-তরঙ্গিণীর তরঙ্গসংপৃষ্ট-সুশীতল-সমীরসেবিত পুষ্পোদ্যানে আনন্দে বিহার করিয়া যৌবন-সুখ উপভোগ করিতে পারিবে।” ঐ রূপ মনোহর বাক্যেও ইন্দুমতী বন্ধুবেষ্টিত প্রফুল্লবদন অবন্তীনাথের প্রতি অনুরাগিণী হইলেন না, পদ্মিনীর প্রণয়ী ভানুর প্রতি কি কখনও কুমুদিনীর অনুরাগ হয়? অনন্তর, সুনন্দা ইন্দুমতীর সহিত অনূপদেশের অধীশ্বর রাজা প্রতীপের সন্নিহিত হইয়া বলিতে লাগিল—“অন্যসময়ে দ্বিভুজ হইলেও সংগ্রামকালে যিনি সহস্রভুজ হইতেন, যাঁহার প্রতাপে প্রজাগণের মধ্য হইতে পাপকার্য্যের চিন্তাপর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছিল, ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণ কারাগৃহে অবস্থিতি করিয়া যাঁহার প্রসন্নতার অপেক্ষায় বহুদিন যাপন করিয়া ছিল, সেই রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্যের বংশে এই নরপতি জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন। "লক্ষ্মী চঞ্চলা" এই যে একটি চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে, ইঁহার গৃহে সুদীর্ঘকাল বসতি নিবন্ধন কমলার সেই অপবাদ তিরোহিত হইয়াছে। যিনি সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অগ্নিদেবকে সহায় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-জাতির পক্ষে কালান্তক যমসদৃশ পরশুরামের শরকেও পদ্মদলের ন্যায় কোমল জ্ঞান করেন। যদি তুমি এই রাজার অঙ্কলক্ষ্মী হও, তাহা হইলে গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া মাহিষ্মতী নগরীর নিতম্ব-শোভিনী স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে।" সুনন্দা ঐরূপ বলিয়া নীরব হইল, কিন্তু রাজা প্রতীপ ঐরূপ প্রিয়দর্শন হইয়াও ইন্দুমতীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিলেন না, শরৎকালের মেঘমুক্ত পূর্ণশশধর ও পদ্মিনীর অনুরাগ লাভ করিতে পারেন না।

তাহার পর, সুনন্দা শূরসেন দেশের অধিপতি সুষেণের নিকট উপনীত হইয়া বলিতে লাগিল;—"এই রাজা সুপ্রসিদ্ধ নীপনরপতির বংশজাত, ইঁহার কীর্ত্তিকথা কেবল যে ভূমণ্ডলেই বিখ্যাত, তাহা নহে, সুরলোকেও এই রাজার বীরত্বের কাহিনী আলোচিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা যজ্ঞ-কার্য্যে দীক্ষিত এবং প্রজাপালনে তৎপর রাজা সুষেণের এমনই প্রজা-শাসনের নৈপুণ্য যে, শান্তিময় সিদ্ধাশ্রমের ন্যায় ইঁহার সুরক্ষিত রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া শ্বাপদগণও পরস্পর হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিরোধে কাল যাপন করিতেছে। এই রাজা বন্ধু বান্ধবের পক্ষে সুধাংশুর ন্যায় রমণীয় ও আনন্দপ্রদ কিন্তু শত্রুগণ অতিকষ্টেও এই রাজার তেজঃ সহ্য করিতে পারে না। ইনি যখন অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত যমুনার নীলসলিলে জলক্রীড়া করেন, তখন ক্রীড়ারত সুন্দরীদের গাত্রস্থ চন্দন বিধৌত হওয়ায় মথুরানগরীর সন্নিহিতা যমুনা ও প্রয়াগতীর্থস্থিতা গঙ্গা-তরঙ্গ-সংমিশ্রিতা যমুনার ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণ করেন। গরুড় হইতে ভীত কালিয়নাগ ইঁহার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া যমুনা-হ্রদে আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছে। সে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই রাজাকে যে মণি সমর্পণ করিয়াছে, তাহা বক্ষঃস্থলে ধারণ করায় কৌস্তভমণি-শোভিত ভগবান্ কৃষ্ণ অপেক্ষাও ইঁহার অধিক শোভা হইয়া থাকে। যদি তুমি এই যুবাকে পতিত্বে বরণ কর, তাহা হইলে চৈত্ররথ উদ্যানসদৃশ মনোহর বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া যৌবনসুখ উপভোগ করিতে পারিবে। আহা বর্ষাকালে যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে ময়ূরগণ আহ্লাদে নৃত্য করে সেই সময় এই রাজার সঙ্গিনী হইয়া বারিসিক্ত সুগন্ধময় শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক ঐ মনোহর নৃত্য সন্দর্শন করা কিরূপ আনন্দদায়ক বল দেখি?" সুনন্দার কথা শেষ হইলে ইন্দুমতী অন্তবরের কামনায় সে স্থান ত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। স্রোতস্বতী যেমন পথিমধ্যে পর্ব্বতে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া কিছু সময় অপেক্ষা করে এবং পরক্ষণেই সাগর অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ ইন্দুমতী ও শূরসেন রাজ্যের অধীশ্বরের গুণগ্রাম শ্রবণে কিঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় অন্তবরের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

তাহার পর, ধাত্রী সুনন্দা ইন্দুমতীকে কলিঙ্গদেশের অধীশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল;—"রাজকুমারি! এই যে, সুগঠিতদেহ যুবাকে দেখিতেছ, ইঁহার নাম হেমাঙ্গদ। মহেন্দ্রপর্ব্বত ও মহোদধি এই উভয়ের উপরেই ইঁহার সমান আধিপত্য। এই রাজার যুদ্ধযাত্রা-কালে মদস্রাবী মহাকায় হস্তিগণ দেখিয়া মনে হয়, স্বয়ং দেবরাজ শত্রুজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছেন। মহার্ণবের উপকূলে ইঁহার মনোহর প্রসাদমালা বিরাজিত, উহার বাতায়নপথে দণ্ডায়মান হইলে সাগর-সলিলের লহরীলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ অনুভব করা যায়। সাগরের মন্দ্রধ্বনিতে প্রহরে প্রহরে ইঁহার রাজধানীতে ঘণ্টাধ্বনির কার্য্য নিষ্পন্ন হয় এবং স্বয়ং মহার্ণব প্রতিদিন প্রভাতে গভীর গর্জ্জন করিয়া মহারাজ হেমাঙ্গদকে জাগরিত করিয়া থাকেন। যদি তুমি ইঁহাকে

বরমাল্য অর্পণ কর, তাহা হইলে তালীবনের মর্ম্মর-ধ্বনিতে নিতান্ত মুখরিত মহার্ণবের উপকূলে ইঁহার সহিত ভ্রমণসুখ অনুভব করিতে পারিবে এবং মৃদুমন্দ সমীরণ দ্বীপান্তর হইতে লবঙ্গ-কুসুমের সৌরভ সহ সমাগত হইয়া তোমার শ্রান্তদেহের ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত করিবে।" সুনন্দার লোভনীয় বাক্যে ও ইন্দুমতী আকৃষ্ট হইলেন না, মন্দভাগ্য পুরুষের নিকট হইতে লক্ষ্মী যেমন দূরে নীত হন, সেই রূপ তিনিও কলিঙ্গনাথের নিকট হইতে অন্য রাজার নিকট নীত হইলেন। তাহার পর, দ্বারপালিকা পাণ্ড্যদেশের অধীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল ;—"অয়ি রাজকুমারি! একবার এই রাজার প্রতি দৃক্‌পাত কর। এই দেবোপম নরপতি হরিচন্দনে ভূষিত হইয়া বালসূর্য্যের লোহিত কিরণে উদ্ভাসিত নির্ঝরশোভী হিমগিরির ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছেন? যাঁহার প্রভাবে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অতিবৃদ্ধি নিবারিত হইয়াছে, যিনি নিঃশেষরূপে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি অগস্ত্য স্নেহ-প্রযুক্ত এই রাজার যজ্ঞস্নানান্তে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই নরপতি মহাদেব হইতে অস্ত্র লাভ করিয়া শত্রুপক্ষের একান্ত অজেয় হইয়াছেন। পুরাকালে লঙ্কাধিপতি রাবণ খরদূষণের বাসভূমি জনস্থানের আক্রমণ আশঙ্কায় ইঁহার সহিত সন্ধি করিয়া, পরে সুরলোক বিজয়ের নিমিত্ত গমন করিয়াছিল। এই ভূপাল দক্ষিণদিকের পতি, তুমি সংপ্রতি এই মহাকুলীন নৃপতির সহিত যথাবিধি পরিণীতা হইয়া সাগর-বেষ্টিতা দক্ষিণদিকের সপত্নীর স্থান অধিকার কর। যেখানে তাম্বূললতা গুবাকবৃক্ষ-শ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া শোভা পায়, যেখানে এলালতা চন্দন তরুকে আলিঙ্গন করিয়া সৌগন্ধ বিস্তার করে, যেখানে সহস্র সহস্র তমালতরু দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া আছে, সেই মলয়ভূমিতে বিহার করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? এই নরপতি ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামতনু, তুমি গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, অতএব তোমাদের মিলন হইলে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিতে

পারিবে।” সুনন্দা ঐরূপ প্রলোভন-জনক বাক্য বলিলেও ইন্দুমতীর হৃদয়ে উহা স্থান পাইল না, দিবাকরের অদর্শন-নিবন্ধন পদ্মিনী মুদ্রিত হইলে উহার অভ্যন্তরে সুধাংশুর কিরণ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। যেমন সঞ্চারিণী দীপশিখা (লণ্ঠনের আলো) রাজপথে যখন যে অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করে, তখন সেই অট্টালিকাকে আলোকিত করে এবং ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে উহা যেমন মলিন ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ স্বয়ম্বরা রাজকুমারীও যখন যে রাজার নিকট গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইতে লাগিল এবং অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ঐ সকল নরপতির বদন বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন হইল।

রাজকুমারী রঘুকুমার অজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি “ইন্দুমতী আমাকে বরণ করিবেন কিনা” এই ভাবনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় হইতে ঐরূপ সংশয় বিদূরিত করিল। কুমারী ইন্দুমতী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যুবা অজকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্র গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন, ভ্রমরী মঞ্জরিত সহকার তরু প্রাপ্ত হইলে কখনও বৃক্ষান্তর গমনের নিমিত্ত উৎসুক হয় না। ইন্দুমতী অজে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সুনন্দা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল;—“ইক্ষ্বাকুবংশে রাজর্ষি ককুৎস্থ জন্ম পরিগ্রহ করেন। সদাশয় উত্তরকোশলের অধীশ্বরগণ যে ককুৎস্থ হইতে “কাকুৎস্থ” এই পরম গৌরবান্বিত আখ্যা ধারণ করেন। যিনি মহাবৃষভরূপী দেবরাজের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া মহাদেবের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে দৈত্যমহিলারা স্বীয় অঙ্গে বৈধব্য-চিহ্ন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; যিনি দেবরাজের বাহুস্থিত বলয়ের সহিত স্বীয় বলয় সংশ্লিষ্ট করিয়া মানব-দেহেই স্বর্গাধিপতির আসনার্দ্ধে উপবেশন করিয়াছিলেন; সেই মহাকীর্ত্তি ককুৎস্থের কুলে মহারাজ

দিলীপ জন্ম পরিগ্রহ করেন; যিনি দেবরাজের অসূয়ানিবৃত্তির জন্ত সামর্থ্য-সত্ত্বেও শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করেন নাই। তাঁহার পুত্র রঘু এখন উত্তরকোশলের অধিপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, যিনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান উপলক্ষে দিগ্বিজয়ে লব্ধ এবং পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদয় সম্পদ্‌কে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া ভোজন পানের নিমিত্ত মৃৎপাত্র মাত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে অবিচ্ছন্ন-ভাবে পরিব্যাপ্ত যাঁহার যশোরাশির পরিমাণ করিতে পারা যায় না, এই কুমার অজ তাঁহারই তনয়। ইনি এখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবা এবং শিক্ষাযোগ্য অবস্থায় উপনীত, সুতরাং পিতার সহিত রাজ্য-শাসনের গুরুতর ভার অতিযত্নের সহিত বহন করিতেছেন। কি কুল, কি সৌন্দর্য্য, কি নবীন বয়স, আর বিনয়ালঙ্কৃত গুণরাশিই বা কি? সর্ব্ব বিষয়েই ইনি তোমার সম্পূর্ণ যোগ্য। অতএব ইঁহাকে বরমাল্য অর্পণ কর, রত্ন কাঞ্চনের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করুক।" সুনন্দার বাক্য শেষ হইলে রাজকুমারী লজ্জা কথঞ্চিৎ শিথিল করিয়া অজের প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি অর্পণ করিলেন। যদিও ইন্দুমতী এই তরুণ রাজকুমারের প্রতি স্বীয় অনুরাগের বিষয় লজ্জা প্রযুক্ত ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, কিন্তু শরীর রোমাঞ্চিত হওয়ায় মনে হইতে লাগিল, তাঁহার গাত্র ভেদ করিয়াই যেন অজের প্রতি গভীর প্রণয় পরিব্যক্ত হইতেছে। ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া চতুরা সুনন্দা কিঞ্চিৎ পরিহাস করিবার মানসে ইন্দুমতীকে বলিল;— "আর্য্যে তবে অন্য রাজকুমারের নিকট যাই?" ইহাতে ইন্দুমতীর মনে অত্যন্ত ঈর্ষ্যার উদয় হইল, তিনি সুনন্দার প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। তাহার পর, রাজকুমারী স্বয়ংই ধাত্রীর হস্ত হইতে মূর্ত্তিমান্ অনুরাগের ন্যায় পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিয়া অজের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। যখন সেই মাঙ্গল্যপুষ্পময়ী মালা অজের বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত হইল, তখন তাঁহার মনে হইল বিদর্ভরাজ-দুহিতা স্বয়ংই যেন

বাহু পাশ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন। ঐ সময় পুরবাসিগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল "কৌমুদী যেমন মেঘমুক্ত চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়, জাহ্নবী যেমন জলনিধিতে গিয়া সম্মিলিত হয়, সেইরূপ এই রাজকুমারী ইন্দুমতী কুমার অজের সহিত মিলিত হইলেন।" কিন্তু এই কথাগুলি উপস্থিত নরপতিগণের নিকট অত্যন্ত শ্রুতিকটু বোধ হইতে লাগিল। একদিকে বরপক্ষ অত্যন্ত প্রফুল্ল, অপরদিকে নরপতিগণ শূন্যহৃদয় এবং মলিনবদন হইলেন, সুতরাং উষাকালে সরোবরে পদ্মবন প্রফুল্ল এবং কুমুদ সকল যেমন মুদ্রিত হয়, স্বয়ম্বর সভার অবস্থাও তখন তদ্রূপ হইয়াছিল।

এ দিকে বিদর্ভরাজ কার্ত্তিকেয়ের সহিত সম্মিলিতা সাক্ষাৎ দেবসেনার ন্যায় অনুরূপ বরের সহিত মিলিতা ভগিনী ইন্দুমতীকে লইয়া স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলে অন্যান্য নরপতি ব্যর্থমনোরথ হইয়া আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিলেন। বরবধূ যখন মনোহর তোরণ-সংশোভিত কুসুমাস্তীর্ণ রাজপথে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের ধ্বজা পতাকা উড্ডীন হইয়া দিবাকরের সুতীক্ষ্ণ আলোককেও প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর, নগরবাসিনী মহিলাদের বরসন্দর্শনের ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। পুরসুন্দরীরা গৃহকার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব সৌধের সুবর্ণময় গবাক্ষপথে আসিয়া উপনীত হইলেন। কাহারও গমনে সত্বরতা-নিবন্ধন কবরী শ্লথ হওয়ায় উহা হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িল, ঔৎসুক্যবশতঃ তিনি কবরী-বন্ধন না করিয়াই হস্তদ্বারা কেশ ধারণপূর্ব্বক আলোকপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহ চরণে অলক্তক পরিতেছিলেন, রাজপথ দিয়া বরবধূর গমন-সংবাদে তিনি অতিব্যস্ত হইয়া পরিচারিকার হস্ত হইতে সহসা দক্ষিণ চরণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত পথ অলক্তক চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া গবাক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কোন রমণী দক্ষিণ চক্ষুতে কজ্জল পরা শেষ

হইলেই বরগমনের সংবাদ পাইলেন, সুতরাং তিনি বাম চক্ষুকে কজ্জলে বঞ্চিত করিয়াই কজ্জল-শলাকা হস্তে ধারণপূর্ব্বক বাতায়ন-পথে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্য এক রমণী গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক শিথিল বসন হস্তে করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কেহ বা কাঞ্চীদাম গ্রথিত করিতেছিলেন, তাঁহার সত্বর গমনে একটী একটী করিয়া রত্ন খসিয়া পড়িতেছিল, তিনি যখন গবাক্ষপথে উপস্থিত হইলেন, তখন সূত্র ব্যতীত তাঁহার হস্তে অন্য কিছুই ছিল না। এই রূপ কৌতূহলিনী পুরমহিলাদিগের মুখের সৌরভে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল, গবাক্ষ সকল সহস্র সহস্র প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা অলঙ্কৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রমদাগণ এতই আগ্রহের সহিত কুমার অজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ যেন নেত্রপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পুরমহিলারা বলিতে লাগিলেন "আমাদের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের নিমিত্ত সহস্র সহস্র ভূপতি চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ইনি সে সমুদায় উপেক্ষা করিয়া নিজে বর নির্ব্বাচনের নিমিত্ত বাঞ্ছা করেন; রাজবালা স্বয়ং মনোনীত না করিলে কি এমন কমনীয় বর লাভ করিতে পারিতেন? বস্তুতঃ বিধাতা যদি এই মনোজ্ঞ বরকন্যাকে পরস্পর মিলিত না করিতেন তাহা হইলে তাঁহার এই বর কন্যার নির্ম্মাণের প্রযত্ন সম্পূর্ণ বিফল হইত। পূর্ব্বজন্মে ইঁহারা দুজনে রতি এবং কন্দর্প ছিলেন, নতুবা এই নৃপনন্দিনী সহস্র সহস্র নৃপতির মধ্য হইতে কেমন করিয়া আপন বর মনোনীত করিয়া লইলেন। বস্তুতঃ মানবের অন্তঃকরণ জন্মান্তরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে।"

রাজকুমার অজ শ্রোত্র-সুখকর পৌরবধূদের বাক্য সকল শুনিতে শুনিতে বিদর্ভরাজের সুসজ্জিত ভবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া কামরূপ প্রদেশের রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট মহামূল্য সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। এই সময় ভোজরাজ

নানাবিধ রত্ন ও মহামূল্য ক্ষৌম বসন সহ তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। যখন অজ ঐ অর্ঘ্য পরিগ্রহ করেন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে পুরমহিলারা সুমধুর দৃষ্টিপাতে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের কিরণ-সমূহ যেমন শুভ্রফেণরাজি-শোভিত মহার্ণবকে বেলা-সকাশে উপনীত করে, সেইরূপ অন্তঃপুররক্ষিগণ নবপরিচ্ছদে বিভূষিত বরকে বধূসমীপে উপনীত করিল। তাহার পর, ভোজবংশের মহাতপাঃ পুরোহিত, ঘৃতাদি পবিত্র হব্যদ্রব্য দ্বারা অগ্নিকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে বিবাহের সাক্ষীরূপে স্থাপনপূর্ব্বক বরবধূকে সম্মিলিত করিলেন। সহকার তরু, স্বীয় পল্লবের সহিত সন্নিহিত অশোকলতার পল্লবের সংযোগ হইলে যেরূপ শোভা পায়, কুমার অজও বধূর হস্তের সহিত স্বীয় হস্ত সংযোজিত হইলে সেই রূপ শোভা পাইয়াছিলেন। বধূর সংস্পর্শে বরের দেহ কিঞ্চিৎ কণ্টকিত হইল, রাজকুমারীর অঙ্গুলিতেও ঘর্ম্মবিন্দু লক্ষিত হইয়াছিল; সেই সময় কন্দর্প যেন সাত্ত্বিকভাবকে উভয়ের দেহে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। তখন তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়াও নয়নদ্বয়ে পরস্পর সংযোগ হওয়ায় মধুর সংস্কোচভাব প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নি প্রদক্ষিণকালে মেরুর প্রান্তভাগে পরস্পর সংসক্ত দিবস এবং রজনীর ন্যায় বরবধূর অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। পুরোহিতের আদেশে নিতম্বিনী রাজকুমারী নিতান্ত লজ্জিতভাবে অগ্নিতে লাজের আহুতি প্রদান করিলেন। ঐ সময় রাজা, স্নাতক পতিপুত্রবতী রমণী ও বন্ধুগণের সহিত সমাগত হইয়া স্বর্ণাসনস্থ বধূবরকে আর্দ্র অক্ষত দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ভোজরাজ ভগিনীর পরিণয় কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হইলে সমাগত নরপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ পূজার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিদিগকে আজ্ঞা করিলেন। ঐ সকল নৃপতি অন্তর্নিহিত নক্রযুক্ত হ্রদের ন্যায় বাহিরে প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া উপহারচ্ছলে ভোজরাজের প্রদত্ত দ্রব্যাদি

প্রত্যর্পণপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিফলমনোরথ নরপতিগণের পূর্ব্ব হইতেই পরস্পর সঙ্কেত ছিল, তাঁহারা সংগ্রামদ্বারা সেই প্রমদারূপ আমিষ সংগ্রহের নিমিত্ত অজের পথরোধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনুজার বিবাহ কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে ভোজরাজও নিজের বিভবানুরূপ যৌতুকসামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক কুমার অজকে গৃহে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ংও কিছু দূর তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি সেই বিখ্যাত বীর অজের সহিত তিন দিনের পথ পর্য্যন্ত গমন করিয়া অমাবস্যার অবসানে চন্দ্রমা যেমন সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হন, তদ্রূপ কুমার অজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে দিগ্বিজয়ের পর, সমস্ত নৃপতিই রঘুর প্রতি বৈরভাবাপন্ন ছিলেন, সংপ্রতি তাঁহার পুত্রের এই স্ত্রীরত্নলাভ তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। যখন অজ ইন্দুমতীকে লইয়া অযোধ্যা অভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় সমস্ত নরপতি এককালে তাঁহার পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই ঘটনায় অজ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তিনি পিতার সচিবের প্রতি ইন্দুমতীর রক্ষাভার অর্পণ করিয়া উত্তালতরঙ্গশালী শোণনদ যে প্রকার ভাগীরথীর প্রবাহে প্রবিষ্ট হয়, সেই প্রকার নৃপতিগণের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎক্ষণাৎ পদাতিক পদাতিককে, রথী রথারূঢ়কে এবং গজারোহী গজারূঢ়কে আক্রমণ করিল, এইরূপ তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে পরস্পর মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। যখন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন যোদ্ধৃগণের কেহ কাহারও সহিত কথা বলিল না, বাণাঙ্কিত অক্ষর দ্বারাই তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। তখন সেই মহাসংগ্রাম ক্ষেত্রে অশ্ব খুরোত্থিত ধূলিপটল চঞ্চল কুঞ্জর-কর্ণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া তীক্ষ্ণকিরণ দিবাকরকেও সম্যক্ আচ্ছাদন করিয়াছিল। সেই সময় ধূলিরাশিতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হওয়ায় যোদ্ধৃবর্গ কেবল চক্রের ধ্বনিতে রথকে ঘণ্টাধ্বনিতে গজকে এবং স্ব স্ব

প্রভুর নামোচ্চারণে স্বপক্ষও পরপক্ষকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈন্যগণের রুধিরপ্রবাহ প্রবলবেগে উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় তদুপরি উড্ডীয়মান ধূলি সকল যেন অগ্নির উপরিস্থ ধূমসমূহের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। তাহার পর, শত্রুপক্ষীয় নৃপতিবর্গ সৈন্যগণের সহিত অগ্রসর হইয়া কুমার অজকে এরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল যে শীতকালের প্রাতঃকালে ঈষৎ প্রকাশিত হিমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় তিনি ঈষন্মাত্র লক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার রথের ধ্বজই কেবল তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। সহসা প্রিয়ম্বদনামা গন্ধর্ব্বের প্রদত্ত অস্ত্রের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি অবিলম্বে ঐ বাণ ধনুতে যোজনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষপক্ষের সৈন্যগণের চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা সকলে ধনু আকর্ষণে ব্যাপৃত অবস্থায় বিপর্য্যস্ত উষ্ণীব সহ নিদ্রার বশীভূত হইয়া পড়িল। তাহার পর, অজ স্বয়ং শঙ্খধ্বনি করিয়া স্বপক্ষের বিজয়-ঘোষণা করিলেন। তাঁহার মুখে সেই বিশুভ্র শঙ্খ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন স্বোপার্জ্জিত মূর্ত্তিমান্ নির্ম্মল যশকেই পান করিতেছেন। অজের যে সকল সৈন্য শত্রুগণের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া দেখিল, তাহাদের প্রভু সরোবরে নিমীলিত পদ্মসমূহের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। অজের সৈন্যগণ স্বপক্ষের রথের ধ্বজসমূহে রুধিরাক্ত বাণ দ্বারা লিখিল,— "হে রাজন্যগণ! আমাদের প্রভু সংপ্রতি তোমাদের যশ হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, কৃপাবশতঃ তোমাদের জীবন হরণ করিলেন না।" কুমার অজ ধনুর্ধারণপূর্ব্বক ঘর্ম্মাক্ত ললাটে সত্বর প্রিয়তমা ইন্দুমতীর নিকট গিয়া হস্ত-নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিলেন;—"প্রিয়তমে! একবার এই নিদ্রিত রাজন্যবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এখন কোন বালকও উহাদের হস্ত হইতে অস্ত্র হরণ করিয়া লইতে পারে। এই সকল নৃপতি ঈদৃশ বিক্রমের সাহায্যে

আমার হস্ত হইতে তোমাকে হরণ করিয়া লইবার বাঞ্ছা করিয়াছিল।” তখন শত্রুগণকৃত বিষাদ বিদূরিত হওয়ায় ইন্দুমতীর মুখ বাষ্পবিমুক্ত আদর্শের ন্যায় নির্ম্মল এবং প্রসন্ন হইল। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেও লজ্জাবশতঃ স্বয়ং প্রিয়তমের অভিনন্দন করিতে পারিলেন না। নবজল-সিক্তা ভূমি যে প্রকার ময়ূরীগণের কেকারব দ্বারা নবজলধরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সেই রূপ তিনিও সখীগণের মুখে তাঁহার জীবিতেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে কুমার অজ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের মস্তকে বামপদ নিক্ষেপপূর্ব্বক রথের অশ্বগণের খুরোত্থিত ধূলিপটলে ইন্দুমতীর অলকাগ্র ধূসরিত করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন।

—o—

আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর-ধ্বংস।

চিতোরের রাজবংশ, ঐ নগরের প্রাকৃতিক অবস্থা, রাণা লক্ষ্মণসিংহের রাজ্যকাল, রাণার পিতৃব্যপত্নী পদ্মিনীর অলোক সামান্য রূপের সংবাদে আলাউদ্দীনের চিত্ত বিকার, চিতোর অবরোধ, দর্পণে পদ্মিনীর রূপ দর্শন, ভীমসিংহের বন্ধন, পদ্মিনীর কৌশলে ভীমসিংহের উদ্ধার, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রত্যাদেশ, দ্বাদশ পুত্রের বিনাশ, অজয় সিংহের চিতোর ত্যাগ, রাজমহিলাদের জহর ব্রত উদ্‌যাপন, রাণা লক্ষ্মণসিংহের মৃত্যু, চিতোরের ধ্বংস সাধন।

(২)

ভারতবর্ষ সর্ব্বরত্নের আকর। এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির শোভা ও সম্পদ্ সন্দর্শনে জগৎ বিমুগ্ধ। তজ্জন্য পুরাকাল হইতে ভারতের বহির্ভাগ হইতে কত আততায়ী সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করিয়া এই পবিত্র ভূমিকে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। বিগত ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে পাপহৃদয় আলাউদ্দীনের আক্রমণে প্রকৃতির প্রিয়নিকেতন

সৌধময়ী চিতোরনগরী আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া যেরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, উহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে চিতোরের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মিবার অতিপ্রাচীন রাজ্য। মিবারের রাজগণের উপাধি রাণা। ইঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্যকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। ভট্টকবিগণের বর্ণনা অনুসারে জানিতে পারা যায় ২০০ শত সম্বতে অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের বংশসম্ভূত কনকসেন উত্তরকোশলের রাজধানী অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্ররাজ্যে আগমন করেন। তাঁহার রাজধানীর নাম বীরনগর। ক্রমে কনকসেনের অধস্তন পুরুষেরা বিজয়পুর, বলভী প্রভৃতি নগরে অবস্থানপূর্ব্বক সৌরাষ্ট্ররাজ্য শাসন করিয়া অবশেষে চিতোরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। যিনি প্রথমে চিতোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম বাপ্পাদিত্য অথবা বাপ্পারাও। বাপ্পারাও এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনের ঘটনাবলী অপূর্ব্ব কৌতূহলপূর্ণ। *

চিতোরনগরীকে সাধারণ লোকে চিতোরগড় বলিয়া থাকে। ইহার অবস্থান-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট এবং সুদৃঢ়। এই গড় চতুর্দ্দিকের সমতল ভূমি হইত প্রায় ৪৫০ ফিট উচ্চ। চিতোরের কোন উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন-গোচর হয়। প্রথমেই সমতল ভূভাগ হইতে ক্রমোচ্চ ভূমি পর্ব্বতাকারে উত্থিত হইয়াছে, তাহার শীর্ষস্থানে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর-বেষ্টিত গড় শোভা পাইতেছে। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বহুদূরব্যাপিনী অত্যুচ্চ শৈলমালা, অপর দুই দিকে নন্দীশ্বরী নদী রজতময় কাঞ্চীদামের ন্যায় উহার নিতম্বভাগ বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নগরীর কোন স্থানে হিন্দু গৌরবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ অত্যুচ্চ জয়স্তম্ভ অটলভাবে দণ্ডায়মান, কোন স্থানে বা

* জয়বিলাস, রাজরত্নাকর, রাজবিলাস, টড্ সাহেব কৃত রাজস্থান, মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদেব ভট্ট কৃত মিবার রাজ্যের ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ কর।

আশ্চর্য্য ভাস্করকার্য্য-সমম্বিত অভ্রংলিহ সৌধমালা, স্থানে স্থানে তরঙ্গমালা-সমন্বিত স্বচ্ছ-জলাশয় ও তাহার তীরস্থ প্রাসাদ সকল মহাপরাক্রান্ত রাণাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন ;—"বাপ্পাদিত্যই এইনগরীর প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের অনুন্ধান দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, চিতোর মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এই মৌর্য্যবংশের রাজা মান বাপ্পাদিত্যের মাতুল। তিনি প্রথমে নিরাশ্রয় বাপ্পাদিত্যকে আশ্রয় প্রদান করেন, শেষে বাপ্পা রাজ্য-লোভে মাতুলকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চিতোরের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই বাপ্পাদিত্যই "হিন্দু-সূর্য্য" এবং "ভারত সার্ব্বভৌম" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

বাপ্পাদিত্যের তিরোভাবের পর, বহু পুরুষ অতীত হইয়াছে। রাণা-কুম্ভ প্রভৃতি মহাবীরগণ বহু দেশ জয় করিয়া বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ চিতোরে কত জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। চিতোর দিন দিন বীরকীর্ত্তিতে বিভূষিত হইতেছে। চিতোরের নামে অন্যান্য প্রদেশের নৃপতিগণ কম্পিত-কলেবর। কালের কুটিল গতি। কোন্ সূত্রে কখন কি ঘটনা সংঘটিত হয়, কিছুই নির্ণয় করা যায় না। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণা লক্ষ্মণসিংহ পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত-ব্যবহারকালে তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সিংহলদ্বীপবাসী চোহানবংশীয় হামিরশঙ্করের কন্যা পদ্মিনীর সহিত ভীমসিংহের বিবাহ হয়। রাজকুমারী পদ্মিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীকুলের ললামভূতা ছিলেন। পদ্মপলাশ-নয়না পদ্মমুখী পদ্মিনীর অসাধারণ সৌন্দর্য্যের তুলনা ভারতের কোন স্থানেই দৃষ্ট হইত না। সেই লোকললামভূতা সুন্দরীকে পদ্মবাসিনী পদ্মালয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পদ্মিনী রূপে যেমন গুণেও সেই রূপ প্রতিষ্ঠাবতী ছিলেন। আজিও রাজবারা প্রদেশে তাঁহার গুণগরিমা কবির বর্ণনার প্রধানতম উপাদান উপযাস্থল হইয়া রহিয়াছে।

১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠানবংশীয় আলাউদ্দীন কৌশলে আপন পিতৃব্য স্থলতান্ জেলাল-উদ্দীনের প্রাণ সংহার করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। উহার কিছু দিন পরে তিনি দক্ষিণাপথ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। গুজরাট অধিকৃত ও দক্ষিণাপথ বিজিত হইলে আলাউদ্দীন পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপের কথা শ্রবণ করিলেন, উহাতে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। এখন বিজয়-বাসনা আর তাঁহার হৃদয়ে তত বলবতী নহে, কি উপায়ে পদ্মিনী লাভ হইবে, এই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন। তাহার পর, মহাবিক্রমে চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন কিন্তু কোনই ফল হইল না। কারণ, নগরমধ্যে খাদ্য পানীয়ের অভাব ছিল না। অবশেষে তিনি রাষ্ট্র করিয়া দিলেন "রূপবতী পদ্মিনীকে পাইলেই আমি তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিব।" এই সংবাদে রাজপুত বীরগণের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অঙ্ক হইতে অঙ্কলক্ষ্মী অপহৃত হইয়া অপরের ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করিবে—যবনের বিলাসের সামগ্রী হইবে, এ অবমাননাকর প্রস্তাবে রাজপুত বীরগণ দূরে থাকুক, কোন্ পাষণ্ড কুলাঙ্গারই বা সম্মত হইতে পারে? আলাউদ্দীনের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইল না, পদ্মিনীর আশাও তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে প্রস্তাব করিলেন "একবার মাত্র মুকুরে সেই ভুবনমোহিনীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেই আমি স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইব।"

সকলের পরামর্শে ভীমসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। রাজপুতের মুখ হইতে একবার যে বাক্য বহির্গত হয়, প্রাণান্তেও তাঁহারা তাহা উল্লঙ্ঘন করেন না। প্রবল আততায়ী অতিথি হইলেও রাজপুতের নিকট তিনি পূজ্য ও সম্মানের যোগ্য; তাঁহারা বঞ্চক অথবা বিশ্বাসঘাতক নহেন, সম্রাট্ আলাউদ্দীনের হৃদয়ে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল।

তিনি কতিপয়মাত্র আত্মরক্ষক সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে অসংখ্য-সৈন্যবেষ্টিত রাজপুত-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যথোচিত সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। সসম্মানে অতিথি-সৎকার করিয়া ভীমসিংহ তাঁহাকে দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করিলেন। সম্রাট্ উহা দর্শন করিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন এবং শিষ্টালাপের সহিত আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আপন শিবিরে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় সরলহৃদয় ভীমসিংহও দুর্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন।

শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনত্ব বিদূরিত হয় না, ধর্ম্ম-নিষ্ঠার শত শত উপদেশ শ্রবণ করিলে এবং প্রকৃত বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও পাপ হৃদয় হইতে পাপ-প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হয় না। বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দীন স্বয়ং প্রতারক, তাঁহার হৃদয় প্রতারণা-ধর্ম্মেরই বশবর্ত্তী হইল। শিষ্টালাপ করিতে করিতে ভীমসিংহ আলাউদ্দীনের সহিত গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে একদল অস্ত্রধারী পাঠানসেনা অতর্কিতে গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। সম্রাটের আদেশ প্রচারিত হইল, "পদ্মিনীকে পাইলেই ভীমসিংহের মুক্তি দান করা হইবে।" অচিরেই এই অশুভ সংবাদ চিতোরে পৌঁছিল। নগরবাসী বীরগণের মুখপদ্ম নিশাকমলের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল। কি উপায়ে ভীমসিংহের উদ্ধার হইবে, কি উপায়েই বা পদ্মিনীর নিকট এই অশুভ সংবাদ, এই জঘন্য ঘৃণিত প্রস্তাবের কথা উত্থাপন করা যাইবে, কেহই উহার কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলেই ভগ্নহৃদয়ে চিন্তামগ্ন রহিলেন। এদিকে লোক-পরম্পরায় সমস্ত সংবাদই পদ্মিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর, তিনি কহিলেন, "পতিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পবিত্র সতীত্বরত্ন তিনি যবন করে সমর্পণ করিতে সম্মত আছেন।" ইহা শুনিয়া

নগরবাসী সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন, প্রতিগৃহে আবাল-বৃদ্ধবনিতা এই কথা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করিতে লাগিল। এদিকে পদ্মিনী ঐরূপ সম্মতি দান করিয়া একটী নিভৃতকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গোরা ও বাদল নামক দুইটি আত্মীয় লোক তাঁহার নিকট আহূত হইল। ইঁহারা দুই জনে পদ্মিনীর পিতৃরাজ্যে বাস করেন। কি কৌশলে পতির উদ্ধার হইবে, কি কৌশলেই বা স্বয়ং অকলঙ্কিত-দেহে পবিত্রতম সতীত্বরত্ন লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যবন-শিবির হইতে প্রত্যাগত হইবেন, গোরা ও বাদলের সহিত পদ্মিনী গুপ্তগৃহে বসিয়া তাহারই গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ মন্ত্রণার পর কর্ত্তব্য স্থির হইল। অবিলম্বে আলাউদ্দীনের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, 'পদ্মিনী রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সাম্রাজ্ঞী; উপযুক্ত সম্মানের সহিত বাদসার শিবিরে গমন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যখন রাজমহিষী পদ্মিনী সম্রাট্-শিবিরে উপস্থিত হইবেন, তখন তদ্গতপ্রাণা চিরসহচরীগণ তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া আসিবেন। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত রাজপুত-ললনা পদ্মিনীকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও চিরবিদায় লইবার জন্য একবার মাত্র শিবির পর্য্যন্ত অনুগমন করিবেন। তাঁহাদের সম্মানরক্ষণে যেন কোন রূপ ত্রুটি না হয় এবং কেহ যেন তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করে। ঐ সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা শেষ বিদায় লইয়া পুনরায় চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট্ অবরোধকারী সৈন্যগণকে উঠাইয়া যে দিন অপেক্ষাকৃত দূরে গিয়া শিবির স্থাপন করিবেন, এই সত্য অঙ্গীকার শ্রবণে সেই দিনেই পদ্মিনী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন।' আনন্দে আলাউদ্দীনের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ অবরোধ-কারী সৈন্যগণকে উঠাইয়া লইবার জন্য দিন ধার্য্য হইয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে অন্যূন সাতশত পটাবৃত শিবিকা চিতোর হইতে বাদসার শিবিরাভি-

মুখে যাত্রা করিল। প্রত্যেক শিবিকাভ্যন্তরে চিতোরের এক একটি মহাবীর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত। প্রতিশিবিকাই গুপ্তাস্ত্রধারী ছদ্মবেশী ছয় জন যোদ্ধার দ্বারা বাহিত হইতে লাগিল। সাতশত শিবিকাই একে একে যবন-শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

ভীমসিংহের প্রার্থনায় প্রিয়তমা পদ্মিনীর সহিত জন্মের মত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য আলাউদ্দীন তাঁহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশ অনুসারে ভীমসিংহ যেমন শিবিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনি তাঁহার কতিপয় সেনানী একখানি শিবিকাভ্যন্তরে তাঁহাকে গোপনে অরোপিত করিয়া চিতোরাভিমুখে প্রস্থান করিল; সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি যান ও তাহার অনুগামী হইল। আলাউদ্দীনের আগমন প্রতীক্ষায় অবশিষ্ট শিবিকাগুলি মুসলমান-শিবিরাভ্যন্তরেই রহিল। যে শিবিকাগুলি চিতোরাভিমুখে প্রতিগমন করিতেছে, তাহা দেখিয়া আলাউদ্দীন ভাবিলেন পদ্মিনীর নিকট চিরবিদায় লইয়া চিতোরবাসিনী কুলললনারাই ঐ সকল শিবিকাতে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিতেছেন। পদ্মিনীর চিরসঙ্গিনী সহচরীরাই অবশিষ্ট শিবিকাগুলিতে রহিয়াছেন। অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল, পত্নীর নিকট হইতে ভীমসিংহ প্রত্যাগত হইলেন না। প্রিয়তমার সহিত তিনি বহুক্ষণ আলাপ করিতেছেন, আলাউদ্দীনের তাহা সহ্য হইল না; বিষময়ী ঈর্ষ্যা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। বিশেষতঃ বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শিবিকার পটাবরণ উন্মোচন করিবার জন্য তিনি আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে আবরণমুক্ত হইল। আলাউদ্দীন চমকিত ও বিস্মিত। শিবিকায় ভীমসিংহও নাই, পদ্মিনীও নাই, কতকগুলি সশস্ত্র যোদ্ধা বীরবিক্রমে অসি হস্তে শিবিকার অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইতেছে। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দীনের হৃদয়ে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

অচিরেই সেই ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। ভীমসিংহকে লইয়া যাহারা পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য একদল মুসলমান-সেনা তৎক্ষণাৎ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা পথি-মধ্যে রাজপুত-সেনার সম্মুখীন হইয়া তুমুলসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। দুই স্থানে দুইটি সংগ্রাম, দুই পক্ষই জিগীষু। শিবিকা হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ভীমসিংহ বেগবান্ তুরঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিলেন। পাঠানেরা দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত ধাবিত হইল কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। আত্মজীবন বিপন্ন করিয়াও গোরা এবং বাদল উভয়ে রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ-মধ্যেই আলাউদ্দীনের অভীষ্ট ব্যর্থ হইয়া গেল, চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক সসৈন্যে তিনি স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর গোরা এই যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার উপমা দুর্লভ। মুসলমানের হস্ত হইতে চিতোর-রাজ্য এবং ভীমসিংহ ও পদ্মিনীকে উদ্ধার করিয়া গোরা রণক্ষেত্রে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব-গৌরব অদ্যাপি কেহ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। এই সংগ্রামে চিতোর রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। কতিপয়মাত্র বীর রণস্থল হইতে প্রাণ লইয়া চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিয়াছিলেন। ঐ সংগ্রামে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে বালকবীর বাদল এক জন। বাদলের বয়স তখন দ্বাদশবর্ষ মাত্র। রাজপুত বীরেরা কৈশোরেই রণচর্য্যায় সুশিক্ষিত হন, কৈশোরেই তাঁহাদের হৃদয়ে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে, সুতরাং এত অল্পবয়সে রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন বালকবীর গোরার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। বাদল রণজয়ী হইয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইলে তদীয় পিতৃব্যপত্নী শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রাণপতির যুদ্ধকাহিনী বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। বালকবীর বাদল বলিল;—"মা! আমার পিতৃব্যের বিপুল বিক্রমের কথা আর

কি বলিব ? তাঁহার বীরত্ব দর্শনে বিপক্ষেরাও বিস্মিত হইয়া শত শত ধন্যবাদ করিয়াছিল। তিনি শাণিত করবালদ্বারা অসংখ্য শত্রু-সৈন্যের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক কোন মুসলমান-সৈনিকের শবদেহে স্বীয় মস্তক রাখিয়া সুখশয্যায় সসম্মানে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন।” ঐ কথা শুনিয়া বীরপত্নী বাৎসল্যভরে বাদলের মুখ চুম্বন করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ চিতাগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক উপরত পতির অনুগামিনী হইলেন।

দুর্ব্বৃত্ত আলাউদ্দীনের হৃদয় হইতে পদ্মিনী লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হইল না। তিনি ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। যদিও পূর্ব্ব যুদ্ধে চিতোরের অসংখ্য বীরপুরুষ রণশায়ী হওয়ায় চিতোর ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি বিক্রমে রণোৎসাহে এবং বীরত্ব প্রদর্শনে রাজপুত-জাতি মুহূর্ত্তের জন্যও পরাঙ্মুখ হইল না। তাহারা অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মুসলমানেরা নগরের দক্ষিণভাগস্থ পর্ব্বত-শ্রেণী অধিকার পূর্ব্বক তথায় শিবির স্থাপন ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিল। তাহারা যুদ্ধের বিপুল আয়োজনে কিছু মাত্র ত্রুটি করে নাই। অবিলম্বে হিন্দু-মুসলমানে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভীমসিংহ সসৈন্যে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রবীরগণকে সম্বোধন করিয়া নানা উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাহারা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রতিদিন অসংখ্য চিতোরবীর একে একে রণভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন। একদা রজনী দ্বিপ্রহর, প্রাসাদকক্ষে বসিয়া চিতোরের রাণা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। দৈনন্দিন যুদ্ধ-ব্যাপারে প্রিয়তম বীরগণ একে একে লীলা সম্বরণ করিতেছেন, চিতোরের ভবিষ্যগগন ক্রমে নিবিড় মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে, চারিদিকেই মহাযুদ্ধে নিপাতের মহান্ আর্ত্তনাদ, এ অবস্থায়

কিরূপে চিতোররাজ্য রক্ষা পাইবে, কি রূপেই বা দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একটিও জীবিত থাকিবে, এই চিন্তায় রাণার হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একটি পুত্রও যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলেও পিতৃপুরুষেরা এক গণ্ডূষ জল প্রাপ্ত হইতে পারেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে রাণা নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রিতে এই রূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রাণা লক্ষ্মণসিংহ বিজন কক্ষে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট আছেন, সহসা সুগভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মেই ভুখাহুঁ।" রাণা চমকিত হইয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে সুবর্ণপ্রদীপে আলোক প্রজ্বলিত ছিল, প্রকোষ্ঠ-ভিত্তিতে একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি বিরাজিত, মর্ম্মরস্তম্ভরাজির মধ্যভাগে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। দেবীকে দেখিবা মাত্র রাণা বলিয়া উঠিলেন "মা এখনও কি তোমার ক্ষুধার শান্তি হয় নাই, আমার বংশের অষ্টসহস্র বীরপুরুষ ক্রমে রণশায়ী হইলেন, তাঁহাদিগের শোণিতপানেও কি তোমার তৃষ্ণা শান্তি হইল না?" প্রত্যুত্তরে দেবী কহিলেন "রাজমুকুটধারী দ্বাদশটী রাজপুত্র চিতোরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ না করিলে আমার পিপাসা নিবৃত্তি হইবে না, চিতোর অন্যের করতলগত হইবে" এই বলিয়া দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। প্রভাতে রাণা সভা মণ্ডলীতে রজনীবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে সেনানীগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। কথাগুলি রাজার বিকৃত-মস্তিষ্কের ভ্রমবিজৃম্ভিত বলিয়াই সকলের ধারণা হইল। তাহার পর. রাণা সেই দিন নিশাভাগে সেনানী-গণকে তাঁহার কক্ষে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন। তাহাই হইল। পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেবী পুনরাবির্ভূত হইলেন;—কহিলেন, "সহস্র সহস্র যবন নিপাতিত হইলেও আমার তৃপ্তি হইবে না, প্রত্যহ এক একটি রাজকুমার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিন

দিন রাজ্য শাসনের পর চতুর্থ দিবসে রণক্ষেত্রে আত্মজীবন উৎসর্গ করিবে। এই প্রকার দ্বাদশটি পুত্র প্রাণত্যাগ করিলেই চিতোরের ভাগ্যগগন মেঘমুক্ত হইয়া উঠিবে।" এই বলিয়াই দেবী তিরোহিত হইলেন।

জন্মভূমি রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিতে রাজপুত-বীরেরা চিরাভ্যস্ত। তাহার উপর দেবীর আদেশ, প্রজ্বলিত অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল, দ্বিগুণ বিক্রমে দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বাদশটি রাজকুমারই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। অরিসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রথমে তিনিই রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিন দিন রাজ্য-ভোগের পর চতুর্থ দিবসে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মহাবিক্রমে মহাবীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন। অজয়সিংহ দ্বিতীয় পুত্র। রাণা তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। পিতার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় অজয়সিংহ অগ্রজের অনুগমন করিলেন না, অগত্যা অবশিষ্ট দশ ভ্রাতাও পর্য্যায়ক্রমে চিতোর-সিংহাসনে আরোহণ, পর্য্যায়ক্রমে যবন-সমরে প্রবেশ এবং পর্য্যায়ক্রমে রণক্ষেত্রে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বদেশ-হিতৈষিতার ও আর্য্যবীরত্বের দেদীপ্যমান উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। বহুদিনের সংগ্রামে চিতোরনগরী বীর-শূন্যা, গড়মধ্যে খাদ্যের অভাব, নগরবাসীর ক্লেশের সীমা নাই। রাণা লক্ষ্মণসিংহ আজ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। তিনি ভাবিতেছেন—নগরী ত গেলই এখন মহিলাদের ধর্ম্মরক্ষার উপায় কি? পূর্ব্বকাল হইতে রাণা বংশের একটি প্রথা আছে, তাঁহারা জেতৃকুলের অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়মহিলাগণকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া জহরব্রতের অনুষ্ঠান করেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ-রক্ষার যখন কোনই উপায় থাকিত না, তখনই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা হইত। সেই রূপ সঙ্কট সময় উপস্থিত দেখিয়া রাণাও সেই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠানে সমুদ্যত হইলেন। রাজপুরীর অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্য প্রদেশে একটি বিশাল কূপ

খনন করা হইল এবং তন্মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ ও ঘৃতের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইল। দেখিতে দেখিতে ধূমরাজি আকাশ আচ্ছন্ন করিল এবং বহ্নিদেব লোলরসনা বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনুপম রূপবতী অসংখ্য রাজপুত-মহিলা কুণ্ডের পার্শ্বে সমবেত হইলেন। লোক-ললামভূতা সতী পদ্মিনী ইঁহাদের অগ্রগণ্যা। তিনি রাজ-মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, কবি তাহার অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন ;——

"এসো সহচরীগণ,
এসো সহচরীগণ!
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ।
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়ে কেশ ;
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি আজি রে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন।
শুধিব জীবন দানে পতিপ্রেম-ঋণ ॥
আজি অতি সুখের দিবস,
পাব সুখ মোক্ষ যশ,
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস।
পরিণয় প্রমোদ উৎসবে,
ভেবে দেখ দেখি সবে
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে ?
সবে তবে ছিলে লো বালিকা,
যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা ?

সকলেতে জেনেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন।
যার লাগি রমণীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,
এই ছার কলেবরে।
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই।
কোনরূপে রক্ষা নাই।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥
সতীর পরমধর্ম্ম সার।
যার পর নাই আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে ॥ *

এই রূপ বলিতে বলিতে হুতাশন প্রদক্ষিণ করিয়া রাজমহিলারা কৌলিক উপাস্যদেব সূর্য্যকে প্রণিপাত করিলেন, এবং অগ্রে পদ্মিনী তাহার পর, অন্যান্য কুলরমণীগণ বহ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও অন্যান্য বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আজ চিতোরের কুললক্ষ্মীগণ চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে পদ্মিনীর জন্য পাপিষ্ঠ আলাউদ্দীনের এই দারুণ সমরাভিনয়, যাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য সহস্র সহস্র রাজপুতবীর অবলীলাক্রমে সমরানলে জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছে, যাঁহার পবিত্রতার মূল্য সমগ্র মীবাররাজ্য অপেক্ষা অসংখ্যগুণ অধিক, সেই বিধাতার অপূর্ব্বসৃষ্টি লোকললামভূতা

* পদ্মিনী-উপাখ্যান।

পদ্মিনীর কমনীয় সৌন্দর্য্যরাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গেল। যাও, পদ্মিনি! যাও, স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিয়া সুরলোকে গমন কর। যত দিন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন তোমার বিলয় নাই, তোমার কীর্ত্তি সাধ্বী রমণীগণের শিক্ষার স্থান হইয়া রহিল।

সমস্তই ফুরাইল, রহিলেন কেবল রাণা লক্ষ্মণসিংহ, আর তাঁহার স্নেহাস্পদ দ্বিতীয় পুত্র অজয়সিংহ। জহরব্রত উদ্‌যাপিত হইলে রাণা স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য রণসজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। উপযুক্ত পুত্র বিদ্যমানে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া পিতার পক্ষে অনুচিত। পিতৃভক্ত অজয়সিংহ এই প্রকারের নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন কিন্তু পুত্রবৎসল রাণা স্নেহপাশ ছেদন করিয়া প্রিয়পুত্রকে সমরসাগরে অবগাহন করিবার অনুমতি দিতে পারিলেন না। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা পিতৃভক্ত পুত্রের ধর্ম্ম নহে; সুতরাং পিতার অনুমতি লইয়া অজয়সিংহ অল্পমাত্র সৈন্য সহ শত্রু-শিবির অতিক্রমপূর্ব্বক কৈলবারা প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে রাণা দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রু-সমরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইলেন। যে কয়েকটি বীর চিতোরে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগকে সহায় করিয়া রাণা লক্ষ্মণসিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পাঠানেরাও ভীমবিক্রমে অগ্রসর হইল। উভয় দলে মহোৎসাহে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ভীষণ যুদ্ধের পর চিতোর-বীরগণ একে একে রণশায়ী হইলেন। রাণা লক্ষ্মণসিংহও অসংখ্য পাঠানের প্রাণ সংহার করিয়া সম্মুখসংগ্রামে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। ভারতের শেষ সম্রাট্ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের পতনের পর একমাত্র চিতোরনগরেই স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, আজ তাহা নিঃশেষ হইল। যুদ্ধান্তে জলস্রোতের ন্যায় দলে দলে মুসলমান চিতোর-নগরে প্রবেশ করিল। চিতোরের পথ ঘাট প্রাঙ্গণ চত্বর চতুষ্পথ

সমস্ত স্থানই রাজপুত বীরগণের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শোণিতাক্ত মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন, মুসলমানগণ সেই অরক্ষিত নগরীর দেবমন্দির প্রাসাদ অট্টালিকা সমুদয়ই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল এবং বহু কালের সঞ্চিত রাশি রাশি ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্ত, তিনি ভাবিতেছেন, এইবার পদ্মিনীকে লাভ করিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী সংগ্রামের দারুণ ক্লেশ বিদূরিত করিবেন। আলাউদ্দীন ভীমবেগে পদ্মিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, মূল্যবান্ গৃহসামগ্রী বসন ভূষণ আসন পরিচ্ছদ সমুদয়ই স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-মোহিনী পদ্মিনী নাই। বহু অন্বেষণেও পদ্মিনীর সন্ধান হইল না। হায় আলাউদ্দীন! তুমি নির্ব্বোধ, তুমি উন্মত্ত, ভেক কি কখনও কমলিনীর স্বর্গীয় সৌরভ উপভোগ করিতে পারে? যাঁহার জন্য তুমি লক্ষ লক্ষ অবলাকে পতিপুত্রবিহীনা করিয়াছ, কত অভ্রংলিহ মনোহর প্রাসাদ ভূমিসাৎ করিয়াছ, তাঁহার দর্শন কোথায় পাইবে? সেই পবিত্রহৃদয়া দেববালা সম্মুখসমরে নিহত পতিকে লইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। চিতোর আজ জনশূন্য, চিতোর আজ মহাশ্মশান। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ব্বৃত্ত আলাউদ্দীনের কঠোর হস্তে অমরাবতীসদৃশী চিতোরনগরী এই রূপে বিধ্বস্ত হইল, ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় অপেক্ষা দৃঢ়তর হইল।

—o—

১৩০৪ সালের ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প কি; উহার প্রকৃতি, ভূমিকম্পের ইতিহাসে কোন্ ভূমিকম্প সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে? লিস্‌বনের ভূমিকম্প ও ভারতের ভূমিকম্পের পরস্পর তুলনা, আসামের ভূমিকম্পের বিবরণ; উক্ত ভূমিকম্প-নিবন্ধন সংক্ষুব্ধ প্রদেশের অবস্থা, উহার শব্দ, উহার বিস্তার ও বেগ, ভূমিকম্পের কারণ।

(৩)

যে সকল নৈসর্গিক ঘটনা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করে, ভূমিকম্প উহাদের অন্যতম। বিদ্যার্থী ত্রিতল গৃহের বিজন কক্ষে পাঠে অভিনিবিষ্ট, প্রবাসাগত যুবা প্রণয়িনীর অঙ্কস্থিত নবজাত শিশুর মধুর হাস্যে আত্মবিস্মৃত, উকীল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিচারকের সম্মুখে বাগ্‌জাল বিস্তারে বদ্ধপরিকর, ধনী ধনরাশি সম্মুখে রাখিয়া কুসীদ-চিন্তায় নিরত, সকলেই অনন্যমনে আপন আপন কার্য্যে নিমগ্ন হইয়া আছে, সহসা ভীষণ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল। যতক্ষণ কম্পন অনুভূত হইল, তত ক্ষণ যেন হতচেতন, পরমুহূর্ত্তে জানা গেল, এই স্বল্পতর সময়ব্যাপি ঘটনা জগতের কত ইষ্ট ও অনিষ্ট সংসাধিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবীর এই সামান্য বিচলনে কত পর্ব্বত স্থানচ্যুত, কত স্রোতস্বতী বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ, কত নিম্নভূমি উচ্চ ও উচ্চভূমি সমতল অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ যে সকল স্তম্ভ প্রাসাদ অট্টালিকা প্রভৃতি কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া দীর্ঘকাল ধরাতলে দণ্ডায়মান হইয়া কৌতূহলী দর্শকের সম্মুখে প্রাচীন সমাজ এবং প্রাচীন নরপতিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের অবিকল চিত্র প্রদর্শন করিত, ভূমিকম্পের পর গিয়া দেখ তাহাদের অধিকাংশ ভূতলশায়ী হইয়া পার্থিব জগতের নশ্বরত্ব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আমাদের জননী ধরিত্রী কতবার আপন অঙ্গ সঞ্চালন করিয়াছেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, "ভূকম্পের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা স্থান পাইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত লিস্‌বননগরের ভূমিকম্প সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও বিস্তৃত। কিন্তু ভূবিদ্যাবিৎ ওল্ডহাম সাহেবের মতে ১৩০৪ সালের (১৮৯৭ খ্রীঃ) ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১২ ই জুন) শনিবার ভারতে যে ভূকম্প হয়, উহা লিস্‌বননগরের ভূকম্পকেও পরাজিত করিয়াছে।

লিস্‌বননগরের ভূকম্পের কেন্দ্রস্থল সমুদ্রে ছিল এবং সেই কম্পনজনিত সমুদ্রতরঙ্গ উক্ত মহানগরের এককালে ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। তজ্জন্যই উক্ত ব্যাপার পৃথিবীস্থ নরনারীর হৃদয়ে অতি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। নতুবা বিচার করিয়া দেখিলে লিস্‌বন নগরের ভূকম্প অপেক্ষা ভারতের ভূকম্পের প্রসার অনেক অধিক। লিস্‌বন নগরের ভূকম্পের কেন্দ্র সমুদ্রে না হইয়া যদি স্থলভাগে হইত, তাহা হইলে উহার প্রসার ১০ লক্ষ বর্গ মাইল স্থানে মাত্র অনুভূত হইত কিন্তু ভারতের ভূকম্প তদপেক্ষা অনেক অধিক স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। এই ভূমিকম্প ভারতের কতদূর ব্যাপিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দুরূহ। ওল্ডহাম সাহেব বলেন ;—"উত্তরে হিমালয় ও তিব্বত, পূর্ব্বে শ্যামও চীনরাজ্য হইতে এই ভূমিকম্পের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।" তিনি অনুমান করেন ঐ সকল স্থান সংক্ষুব্ধ প্রদেশের দুই তৃতীয়াংশ হইবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেও ১২ লক্ষ বর্গমাইল স্থানে ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। গুজরাটের কিয়দংশে ঐ ভূকম্প জানা গিয়াছিল। বঙ্গোপসাগর জলময় না হইয়া স্থলময় হইলে উহার কিয়দংশে ঐ কম্পন নিশ্চিত জানা যাইত। যদিও তিব্বত এবং চীন হইতে এই ভূকম্পের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই বটে কিন্তু ঐ সকল প্রদেশের কিয়দংশে যে কম্পন ঘটিয়াছিল, উহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অতএব সমস্ত একত্র করিলে দেখা যায়, ভারতের ভূকম্প ১৭৷৷ লক্ষ বর্গ মাইল স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। লিস্‌বন একে ঘনবসতিপূর্ণ এবং জ্ঞানালোকে আলোকিত য়ুরোপের অন্তর্গত, দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নৈসর্গিক ব্যাপারের তথ্য নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বদা উদগ্রীব। সুতরাং উক্ত ভূমিকম্প যে জনসাধারণের সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে ভারতের আসাম অল্পবসতিপূর্ণ দরিদ্রদেশ; ঐ

প্রদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই তৃণ-কুটিরবাসী, যে দুই একটি নগরে অট্টালিকা আছে, উহাদেরও পরস্পর দূরত্ব অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ এই দরিদ্র দেশে বৈজ্ঞানিকের অভাব এবং এ সকল দেশের অধিবাসীরা বৈজ্ঞানিক কারণ বুঝিতেও চেষ্টা করে না। ইহারা অদৃষ্টবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তজ্জন্য আসামের ভূকম্প ভীষণতর হইলেও জনসাধারণের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। আসামের ন্যায় ভূকম্প যদি য়ুরোপ অথবা আমেরিকায় সংঘটিত হইত, তাহা হইলে ঐ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থিতি লয় প্রভৃতি যাবতীয় প্রকৃতির আলোচনা করিবার জন্য কত বিজ্ঞান সমিতি ব্যগ্র হইয়া উঠিত। আসামে এমন একটা ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল অথচ জনসাধারণে উহা ভাল রূপ বুঝিতেও পারিলনা।

যাবতীয় ভূমিকম্প এক প্রকার নহে। সকল ভূকম্প সমান ভূভাগে ব্যাপ্ত অথবা সমান উগ্র হয় না। দুইটি ভূকম্পের প্রকোপের তুলনা করিতে হইলে, উভয়ের জাতশক্তির তুলনা আবশ্যক। প্রত্যক্ষভাবে এরূপ তুলনা সম্ভাবিত নহে, তবে ব্যাপ্তি দেখিয়া উভয়ের শক্তির তুলনা করা যাইতে পারে। যে প্রদেশে কম্পনের উগ্রতা সমান, তাহাকে একটি রেখাদ্বারা বেষ্টন করিলে সেই সীমারেখাকে সমকম্পরেখা (Isoseismic lines or isoleisto) বলে। ওল্ডহাম সাহেব ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আসামের ভূকম্পের সমকম্পরেখা নিম্নলিখিত প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। যে প্রদেশে ইষ্টকময় ও প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহাদি প্রায় সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছিল তাহা প্রথম।

২। যে প্রদেশে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদি প্রায় ভগ্ন হইয়াছিল এবং কোন কোনটা ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয়।

৩। যে প্রদেশে প্রায় সমুদয় ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহাদির ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা তৃতীয়।

৪। যে প্রদেশে ভূমিকম্প বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল এবং তৈজস পত্র নড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা চতুর্থ।

৫। যে প্রদেশে ভূমিকম্প জানা গিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তাহা পঞ্চম।

৬। যে প্রদেশে কেহ কেহ কম্পন অনুভব করিয়াছিল কিন্তু সকলে করে নাই তাহা ষষ্ঠ।

অবশ্য এই বিভাগ ঠিক বিজ্ঞান-সম্মত নহে। তথাপি এতদ্দ্বারা কম্পের উগ্রতা ও ব্যাপ্তি কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। ওল্ডহাম সাহেব যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহাতে ছয়টি সমকম্প-রেখা প্রদর্শিত হয় নাই। প্রথম রেখা এবং সংক্ষুব্ধ প্রদেশ মাত্র দেখান হইয়াছে। উক্ত চিত্রে দেখা যায় প্রথম রেখার ভিতরে শিলং ও গোয়ালপাড়া আছে। এই প্রদেশে ঘর বাড়ী কিছুই রক্ষা পায় নাই। এই প্রদেশের নীচে ভূত্বকের মধ্যে সংক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সংক্ষোভ একটী বিন্দুতে উৎপন্ন না হইয়া অনেক খানি স্থান ব্যাপিয়া হইয়াছিল। এজন্য সংক্ষোভকেন্দ্র না বলিয়া সংক্ষোভস্থল এবং উহার ঠিক উপরিস্থিত ভূপৃষ্ঠকে সংক্ষোভপৃষ্ঠ (Epicentral tract) বলা যাইবে। সংক্ষোভপৃষ্ঠে এই ভূকম্প অতীব ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। উহার সন্নিকটে পশ্চিমে রংপুর ও কোচবিহার এবং পূর্ব্বে শিলেট ছিল। দ্বিতীয় রেখার ভিতরে আগড়তলা মুর্শিদাবাদ মালদহ ও দার্জিলিঙ অবস্থিত। তৃতীয় রেখার ভিতরে ভাগলপুর কৃষ্ণনগর কলিকাতা চট্টগ্রাম। বিহারের পশ্চিমাংশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বার্দ্ধাংশ ছোটনাগপুর ও বালেশ্বর চতুর্থ রেখার মধ্যে বিদ্যমান। এলাহাবাদের নিকট দিয়া চতুর্থ রেখা এবং আগ্রার নিকট দিয়া পঞ্চম রেখা গিয়াছিল। এই পঞ্চম রেখার ভিতরে আগ্রা, সাগর রাইপুর, গঞ্জাম মান্দালে অবস্থিত। ইহার পরেও কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। দক্ষিণে ভিজিগাপত্তন, পশ্চিমে ভূপাল, আজমীড় পাতিয়ালা ছিল।

য়ুরোপের সহিত সংক্ষুব্ধ প্রদেশের ক্ষেত্রফলের তুলনা করিলে দেখা যায়, উহা য়ুরোপের প্রায় অর্দ্ধাংশ। যে প্রদেশে পাকা ঘর বাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাই গ্রেট্‌ব্রিটনের প্রায় দ্বিগুণ।

এই ভূকম্পের বিবরণ অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশের অনেকেই উহার প্রভাব বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। শিলঙের ভূবিদ্যা-বিভাগের মিঃ স্মিথ লিখিয়াছিলেন ;—"আমি সে সময় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম এবং শিলঙ্‌-স্কুলের সন্নিহিত জলের কলের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সাধারণ শিলঙ্‌ সময়ের পাঁচটা পনর মিনিটের সময় বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় একটা গম্ভীর দীর্ঘনাদ আরম্ভ হইল। বোধ হইল, যেন উহা দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ পশ্চিম হইতে আসিতেছে। উহার অব্যবহিত পরেই কম্পন হইল। নাদের প্রায় দুই সেকেণ্ড পরেই কম্পন এবং দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই উহা প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। মৃত্তিকা প্রবল বেগে দুলিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইল। এবং আমাকে হঠাৎ রাস্তার উপর বসিয়া পড়িতে হইল। কম্পন অনেক ক্ষণ ছিল এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকার উগ্র বোধ হইয়াছিল। সমুদ্রে জাহাজে যেমন বমনেচ্ছা হয়, কম্পনও ঠিক তেমনই ভাব জন্মাইয়াছিল। উহা একেবারে হঠাৎ আসিয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতে লাগিল, যেন কেহ মাটিটা অত্যন্তবেগে অগ্র পশ্চাৎ চালাইয়া দিতেছে। প্রত্যেক দিকে ভূপৃষ্ঠ স্পষ্টতঃ কাঁপিতে লগিল, যেন উহা কোমল কর্দ্দমময়। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারে ধারে দীর্ঘাকার ছিদ্র উৎপন্ন হইল। পুষ্করিণীর ঢালু পাড় প্রায় দশফুট উচ্চ ছিল, উহা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল এবং এক স্থানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেল। রাস্তার কোথাও কোথাও দুফুট উচ্চ মাটির আ'ল ছিল, সেগুলা নড়িতে নড়িতে রাস্তার সমান হইয়া পড়িল। স্কুলের বাড়ীটি দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভূমিসাৎ হইল এবং উপরের লোহার পাতের

ছাদ বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া মাটীতে গিয়া পড়িল। কম্পনের পরে আমার বোধ হইল, উহা এক মিনিটের কম স্থায়ী হইয়াছিল এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে আসিয়াছিল। কম্পনের উগ্রতা সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহার আরম্ভের ১০।১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে যত ক্ষতি হইয়াছিল। শিলঙের নিকটে অধিকাংশ সেতু আর যত কিছু পাথরের বাড়ী ঘর ছিল, সমুদয়ই মাটীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। রাস্তা মেরামতের নিমিত্ত পাশে এক ফুট উচ্চ পাথর সাজান ছিল, সে সমস্ত গোলাকার হইয়া ২।৩ ইঞ্চ উচ্চ হইয়া পড়িয়াছিল। কুইণ্টন্-কীর্ত্তি-স্তম্ভের চূড়া স্বস্থান হইতে কয়েক ফুট দূরে পূর্ব্বোত্তর কোণে পড়িয়া গিয়াছিল। অপর অনেকে তথাকার ভূকম্পের বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সকলেই বলিয়াছেন, ভূপৃষ্ঠ তরঙ্গের আকারে স্পষ্টতঃ তুলিয়া উঠিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ঐ তরঙ্গ ৮ হইতে ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ বলিয়াছেন। বোধ হয়, গড়ে ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং ১ ফুট উচ্চ ধরা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সকলেই বলিয়াছেন, ভূমি উপর নীচে ও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ঢাকের চামড়ার উপর কলাই রাখিয়া ঢাক পিটিলে কলাইগুলা উপরদিকে যেমন লাফাইয়া পড়ে, রাস্তার উপরের পাথরগুলা তেমনই শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। উহার সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের অগ্র পশ্চাৎ গতি ঘটিয়াছিল। বিড়ালে ইন্দুরকে যেমন নাড়া চাড়া করে, ঐ দুই গতিবশতঃ তেমনই অনুভব হইয়াছিল। উক্ত পার্শ্বগতি অন্যূন ৮।৯ ইঞ্চ হইয়াছিল। তথা হইতে দূরে কম্পনটা আর অকস্মাৎ ক্ষেপণের মত না হইয়া মৃদু দোলনের আকারে পরিণত হইয়াছিল। আর ও অধিক দূরে, যেখানে ভূকম্প জানা গিয়াছিল, কিংবা আদৌ জানা যায় নাই, কেবল জল নড়িতে দেখা গিয়াছিল, সেখানে বোধ হয় তরঙ্গগতি মাত্র গিয়াছিল।

ভূকম্পের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনা যায়। কিন্তু এই ভূকম্প যেমন

প্রচণ্ড, তাহার শব্দ ও তেমনই ঘোর হইয়াছিল। শিলঙের কোনও ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন ৫০।৬০ হাতের মধ্যে ঘর দরজা পড়িতেছিল কিন্তু ভূকম্প শব্দে উহাদের পড়িবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সংক্ষোভ-পৃষ্ঠ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সকলেই ঘোর শব্দ শুনিয়াছিলেন। কলিকাতায় কেহ বলিয়াছেন, শব্দ শুনা যায় নাই ; কেহ বলিয়াছেন, শুনা গিয়াছিল। যাঁহারা বলিয়াছেন, শব্দ শুনা যায় নাই, তাঁহারা নিশ্চিত অন্যমনস্ক ছিলেন। মেদিনীপুর, বালেশ্বর এমন কি, আরও দক্ষিণে কোকনদের লোকেরা শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা, গয়া, পালামৌ, আলাহাবাদ, জব্বলপুর, ভরতপুরে গভীর দীর্ঘনাদ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে ভামো হইতে ঐ প্রকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মান্দালে হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, কোনও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। উত্তরে দার্জিলিঙে শব্দ শুনা গিয়াছিল, উহার উত্তরের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে যে স্থানের লোকেরা শব্দ শুনিতে পায় নাই, সে সকল স্থলেই যে শব্দ না শুনিবার কারণ অন্যমনস্কতা, এমন বলিতে পারা যায় না। হয়ত সেখানকার মৃত্তিকা শব্দ শুনিবার পক্ষে প্রতিকূল ছিল। আবার রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কম্পন জানা যায় নাই কিন্তু শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বাড়ী ঘরের ও ক্ষতি করিয়াছিল। কিন্তু কি প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল ? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, যেন দূরস্থ বজ্র-গর্জ্জনের ন্যায়, কেহ বলিয়াছেন, চলন্ত রেলগাড়ী বা গরুর গাড়ীর ন্যায়। ফলে যে শব্দটি যাঁহার [illegible]ক পরিচিত, তিনি সেই শব্দের সহিত ভূকম্পনের শব্দের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, শব্দটা দীর্ঘ ও গভীর নহে, হ্রস্ব ও উচ্চ, যেন বন্দুকের আওয়াজ্। এই শব্দ শুনাও নূতন নহে।

১৮৬৯ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতেও বোম ফাটার মত শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ঐ প্রকার শব্দ শুনিয়া ব্লেয়ারবন্দরের ষ্টেসন-ষ্টিমারকে জাহাজ-ডুবি ভাবিয়া খুঁজিতে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু এবারে ও এই প্রকার শব্দ অধিক স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সকলগুলিই সংক্ষোভপৃষ্ঠ হইতে দূরে ছিল, এবং কম্পনের কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই প্রকার শব্দের সহিত ভূকম্পের সম্বন্ধ থাকিলেও কারণ অজ্ঞাত। বরিশালে কামান দাগার যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই প্রকার। ওল্ডহাম সাহেব মনে করেন যে, বরিশালের শব্দের মূলে হয়ত ভূকম্প আছে। শিলং টুরা প্রভৃতি সংক্ষোভ-পৃষ্ঠের স্থান সমূহে একদিনেই ভূকম্প শেষ হয় নাই। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ প্রধান ভূকম্প হইয়া যায়। তার পর দিন ঐ সকল স্থানে শতাধিক বার ভূকম্প হইয়াছিল। বস্তুতঃ উহাদের সংখ্যা করা দুষ্কর হইয়াছিল। ঐ সকল ভূকম্পের মধ্যে অনেকগুলি অন্য বৎসর হইলে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিত। ৩০শে জ্যৈষ্ঠের প্রবল ভূকম্পের নিকটে হওয়াতে তত প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই। কোথায় কোন্ সময়ে ভূকম্প আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে না জানিলে কম্পনগতির বেগ নিরূপণ করিতে পারা যায় না। ঠিক সময় জানা তত সহজ নহে। দৈনিক কার্য্যে ঘড়ীর অল্পদোষ তত গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু এরূপ গণনায় এক মিনিটেরও এমন কি, এক সেকেণ্ডের প্রভেদ ঘটিলে নিরূপিত বেগে ভুল হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন ভূমি একবার মাত্র কম্পিত হইয়া থামে না। তরঙ্গের আকারে একটির পর আর একটি, তার পর একটি, এইরূপ ভাবে হইতে থাকে। কাজেই কোন্ সময়ে কোন্ তরঙ্গ আসিয়া পড়িল, তাহা জানিতে না পারিলে সময় দেখা প্রায় বৃথা হয়। যাহা হউক, এই ভূকম্পের আরম্ভ কাল বিবিধ প্রকারে জানা গিয়াছিল। কলিকাতার

জোয়ার ভাটার পরিমাণ ও জোয়ার ভাটার কাল নিরূপিত হইয়া থাকে। আলিপুর-বেধালয়ে বায়ুচাপ-লেখন-যন্ত্র আছে। বায়ুমান-যন্ত্রের পারদের ঊর্দ্ধসীমা ফটোগ্রাফ্ হইয়া থাকে। ভূকম্পের ঐ পারদ ঊর্দ্ধাধঃ বিচলিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা ফটোগ্রাফ হইতে কতকটা জানিতে পারা গিয়াছিল। এই রূপ নানা উপায়ে দেখা গিয়াছে যে, মান্দ্রাজ সময়ের অপরাহ্ণ ৪টা ২৭ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ড অথবা কলিকাতার সময়ের ৫টা ও ৫টা ১ মিনিটের মধ্যে কলিকাতায় ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। বোম্বাইতে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব পরিমাণের নিমিত্ত একটি বেধালয় আছে। তথাকার কয়েকটি স্বয়ংলেখ যন্ত্র হইতে বোম্বাইতে ভূকম্পের কাল জানা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, তথায় মান্দ্রাজি সময়ের অপরাহ্ণ ৩৫ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড সময়ে ভূকম্প আরম্ভ হইয়াছিল। এই দুই স্থানের নিরূপিত সময় বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও নির্দ্দোষ।

এই ভূকম্পের কিরূপ প্রকৃতি, তাহা উপরের বিবরণ সমূহ হইতে কতকটা বুঝা যাইবে। প্রাচীনকাল হইতে ইটালীতে বিভিন্ন প্রকৃতির ভূকম্প পর্য্যালোচিত হইয়া আসিতেছে। তথায় ভূকম্প চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। কোন কোন ভূকম্পে ভূপৃষ্ঠকে পার্শ্বদিকে ইতস্ততঃ নড়িতে দেখা যায়। কোন কোনটায় তরঙ্গের আকারে চলিতে দেখা যায়। কোন কোনটায় উপর নীচে নড়িতে দেখা যায় এবং কোন কোনটায় ঘুড়িতে দেখা যায়। শেষোক্ত ঘূর্ণনগতি সকলে স্বীকার করেন না। কিন্তু এই ভূকম্পে ওল্‌ডহাম সাহেব ঐ প্রকার ঘূর্ণনগতির লক্ষণ পাইয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভূকম্পের গতি তত জানা ছিল না; কারণ স্থূল অনুমান ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। এক্ষণে ভূকম্পলেখন যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। জাপান ও ইটালী দেশেই এই সকল যন্ত্র সম্যক্ ব্যবহৃত এবং লেখনের অর্থ যথোচিত আলোচিত হইতেছে। তরঙ্গ শব্দ অনেকবার ব্যবহার করা গিয়াছে। তরঙ্গগতি

কিরূপ তাহা একটু বলা আবশ্যক। পুষ্করিণীর স্থির জলে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে জলে সংক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং ঐ সংক্ষোভ-স্থল হইতে চারি দিকে সমান্তরে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল তরঙ্গ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পুষ্করিণীর পাড়ের দিকে ধাবিত হয় এবং পুষ্করিণী বৃহৎ হইলে পাড়ের নিকট না আসিতে আসিতেই তরঙ্গগুলি মিশিয়া যায়। ভূকম্পের অবস্থাও অনেক সময় ঐ রূপ হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষযোগ্য ভূকম্পন-গতির বিশেষত্ব আছে। উহা যেমন চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, উহার স্থিতিকালও তেমন প্রথমে বাড়ে এবং পরে কমে। ১৩০৪ সালের ভূকম্পে ইহা সবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সংক্ষোভ-পৃষ্ঠ-স্থলের মধ্যে ঐ কম্পন ২মিনিটের অধিক স্থায়ী হয় নাই। কলিকাতায় উহা ৫।৬ মিনিট ছিল। পাঁচ শত মাইল দূরে প্রায় ৭ মিনিট ছিল। তাহার পর, স্থিতিকাল ক্রমে কমিয়া আমেদাবাদে ২।১ সেকেণ্ড মাত্র ছিল।

ভূকম্পের প্রকৃত কারণ এ পর্য্যন্ত অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেক সময় ভূমিতে আঘাত বা সংক্ষোভ বশতঃ উহা কাঁপিয়া উঠে এবং সেই কম্পন বশতঃ স্থিতিস্থাপকজ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিংবা পাহাড় ধসিয়া গেলে, ঘর পড়িয়া গেলে, খনি ফাটিয়া উঠিলে, বারুদ-খানায় আগুণ লাগিলে, চারিদিকের মৃত্তিকা কাঁপিয়া উঠে। এই প্রকার সংক্ষোভ বা আঘাত ভূমির পৃষ্ঠেই ঘটে। ভূকম্প শব্দে এই প্রকার কম্পন বুঝায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে নৈসর্গিক কারণবশতঃ যে সংক্ষোভ জন্মে এবং তাহাতে পৃথিবীর যে কম্পন অনুভূত হয়, তাহাকেই সচরাচর ভূকম্প বলা হইয়া থাকে। নৈসর্গিক কারণগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) ভূগর্ভস্থ গহ্বরের ছাদ ও পার্শ্বের পতন বশতঃ ভূমি কাঁপিয়া উঠে। এই কারণে কম্পন কিন্তু ক্ষীণ হয়; এমন কি, উহার শব্দ মাত্র শুনা যাইতে পারে, কিন্তু কম্পন আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। (২) আগ্নেয় গিরির উৎক্ষেপের সময় ভূমি

কাঁপিয়া উঠে; ভূপৃষ্ঠ-নিম্নে জলীয় বাষ্প হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘ বিবরপথে বহির্গমনের চেষ্টাতেও ভূকম্প হয়। এ সকল কারণে যে ভূকম্প হয় তাহাও তাদৃশ বহুদূরে অনুভূত হয় না। যে সকল ভূকম্প প্রচণ্ড ও বহুদূর ব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়, সে গুলির কারণ পৃথিবীর গঠনের সহিত সম্বদ্ধ। একটি খিলানের উপর ভারী ছাদ আছে। ছাদের ভারবশতঃ খিলানটি এমন অবস্থায় থাকে যে, উহার মধ্যভাগ বিস্তৃত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় খিলানটি বহুকাল থাকিতে পারে কিন্তু উহা টান বা তান অবস্থায় নিয়ত থাকে। ভূপৃষ্ঠের নিম্নে কোন কোন স্থানে মৃত্তিকা এই প্রকার তান অবস্থায় থাকে। সেই তানের হঠাৎ শান্তি হইলে ভূকম্প হয়। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ চেষ্টাতে তান হঠাৎ উৎপন্ন হয়, প্রকৃত ভূকম্পে সঞ্চিত তানের হঠাৎ শান্তি হয়। সুতরাং উভয়ের কারণে বিস্তর প্রভেদ।

মূলকারণ ছাড়িয়া দিলে ভূবিদ্যায় দেখা যায় যে, ভূত্বক্ প্রায় সর্ব্বত্রই বিকৃতাকার হইয়াছে। কোথাও উহার কিদংশ একদিকে উঠিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বাঁকিয়া গিয়াছে, কোথাও কুঞ্চিত হইয়াছে। সমান হইয়া পূর্ব্বে যতখানি স্থানে বিস্তৃত ছিল, এই রূপ বক্রণ কুঞ্চনের ফলে তাহার অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যত্র ভূত্বকের প্রস্তর সমূহ মাঝে এমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে, একটা পাশ হইতে অন্য পাশ শত বা সহস্র ফুট উপরে উঠিয়াছে। অবশ্য প্রচণ্ড বল ব্যতীত ভূত্বকের এরূপ বৈরূপ্য সম্ভাবিত হয় নাই। যেখানকার প্রস্তর সমধিক দৃঢ়, সেখানে সেই বলবশতঃ প্রস্তর সমূহে তান জন্মিয়াছে। সেই তানের হঠাৎ শান্তিতে ভূকম্পিত হইয়া উঠে।

এই তানাবস্থার কারণ প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। কেন না, ভূগর্ভের নিসর্গ চিরকাল অজ্ঞাত। তথাপি বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর অতীব উষ্ণ। উপরের কিয়দংশ নিয়ত প্রায় এক প্রকার উষ্ণ

বা শীতল দেখা যায়; সুতরাং তাপ বিকীরণ বশতঃ এখানে আর সঙ্কোচন হইতেছে না। কিন্তু উহার নীচের প্রস্তর-সমূহ এখন শীতল হয় নাই; সেখান হইতে তাপ বিকীর্ণ হইতেছে; এবং ফলে সেখানটা ক্রমশঃ হ্রস্বায়তন হইতেছে। এই দুই অবস্থার ক্রিয়ায় উপরের শীতল অংশটা কতকটা যেন নিরবলম্বন হইয়া আছে। কাজেই ভূত্বকের স্থানে স্থানে তান জন্মিয়াছে।

তানের এই আনুমানিক কারণ প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত জটিল। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, সকলেরই শেষ ফল ভূত্বকের বিদারণ। বিদারণ ও এক প্রকার নহে। বিদীর্ণ প্রস্তরের অংশদ্বয় ঊর্দ্ধাধঃ স্খলিত (Fault) হইতে পারে, কিম্বা একটি অংশের উপরে অপরটি সরিয়া পড়িতে পারে (Overthrust) ইত্যাদি। এই রূপে ভূত্বকের নব বিধান হয় বলিয়া জাত ভূকম্পকে বৈধানিক ভূকম্প (Lectonic-earthquake) বলা যায়। ইহাদের সহিত আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের বা উৎক্ষেপ-চেষ্টার কোন সম্বন্ধ নাই। ১৩০৪ সালের ভূকম্পের পর আসাম ও উত্তরবঙ্গে একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, কালে সেখানে আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইবে। বর্ত্তমান জ্ঞানে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

১৩০৪ সালের ভূকম্পের কারণ, ভূত্বকের নিম্নে প্রস্তর সমূহের হঠাৎ স্ফোটন (Explosion) কিম্বা দীর্ঘাকার বিবরের বিদারণ নহে। এত বহুস্থানে ভূপৃষ্ঠের এত স্থায়ী বিচলন দেখা গিয়াছে যে, তদ্দ্বারা বোধ হয় ভূত্বকের বিদীর্ণ অংশদ্বয়ের একটি অপরটির উপরে খসিয়া পড়িয়াছে। তাহাও এক ক্ষুদ্র স্থানে কিংবা এক রেখায় নহে। বহু বিস্তৃত স্থানে ভূমির বিচলনের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। এ জন্য ওল্‌হামসাহেব মনে করেন যে, উক্ত ভূকম্পের কেন্দ্র একটি না হইয়া অনেক ছিল, এবং অনেকগুলি ভূকম্প যুগপৎ ঘটিয়াছিল। কিংবা গভীর স্থানের একটি সংক্রান্ত কেন্দ্র হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়াছিল।

এই ভূকম্পের যে কারণ অনুমিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উহার অনেকগুলি নৈমিত্তিকের কারণ বুঝিতে পারা যায়। বহুবিস্তৃত স্থানের স্থায়ী বিচলন, স্থানীয় স্খলন, বিদারণ এবং পৃষ্ঠবিষমতা বুঝিতে পারা যায়। ভূপৃষ্ঠের কত নিম্নে সংক্ষোভ-কেন্দ্র ছিল, অন্যান্য উপায়ের মধ্যে কম্পন-বেগ হইতে তাহার গণনা করিতে পারা যায়। এতদ্দ্বারা দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ মাইল নিম্নে সংক্ষোভ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সূক্ষ্ম কাল নির্দ্দেশের অভাবে ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে ওল্ডহাম সাহেব উপরি উক্ত গভীরতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ভূগর্ভের আনুমানিক নিসর্গ বিচার করিয়া ওল্ডহাম সাহেব মনে করেন যে, ভূপৃষ্ঠের ৫ মাইল নিম্নের এ দিকেই সংক্ষোভ ঘটিয়াছিল।

১৩০৪ সালের আসামের ভূকম্পে বহুবিধ নৈমিত্তিক দৃষ্ট হইয়াছিল। উহা যেমন প্রচণ্ড হইয়াছিল, উহার নৈমিত্তিক গুলিও তেমনই ভয়ানক দেখা গিয়াছিল। ভূকম্প আরম্ভের দুই এক মিনিটের মধ্যে শিলঙের সমুদয় বড় বড় বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছিল, পাহাড় বিদীর্ণ হইয়াছিল, কোথাও ধসিয়া গিয়াছিল, সমস্থলীর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া দীর্ঘ বিবরের উৎপত্তি করিয়াছিল, কোন কোন বিবর হইতে জল ও বালুকা নির্গত হইয়াছিল, সংক্ষোভ পৃষ্ঠের স্তম্ভাদি ঘুরিয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত ভূকম্পনগতি স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সংক্ষোভ পৃষ্ঠের উপরের বড় বড় বাড়ী ভূকম্পে কখনই স্থির থাকিতে পারে না, এবং প্রচণ্ড ভূকম্পে নিশ্চয়ই সে গুলি ভূমিসাৎ হইবে। উক্ত ভূকম্পে দূরবর্ত্তী কলিকাতার অনেক বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছিল। সাহেব মহলের বাড়ীই অধিক ফাটিয়াছিল, দেশী মহলে তত ফাটে নাই। সাহেবী বাড়ী ফাটিবার অনেক কারণ ছিল। তন্মধ্যে বাড়ী নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রধান। সাহেবী বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী বারান্দা এবং পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা দোতলা বা তেতলা খোলা বারান্দা প্রায়ই থাকে।

এই প্রকার নির্ম্মাণের ফলে সমগ্র বাড়ীটি এক প্রকার ভারী দৃঢ় বা উচ্চ হয় না। বস্তুতঃ বিভিন্ন অংশের ভার ও পরিমাণ বিচার করিলে ঐ প্রকার বাড়ীকে তিন ভাগ করিতে পারা যায়। দুই দিকের বারান্দা এবং মধ্যের অংশ এই ভাগ তিনটি অসমান। সুতরাং ভূকম্পে যখন বাড়ীটি দুলিতে থাকে, উহার উক্ত তিন অংশ তিন প্রকার বেগে এদিক্ ওদিক্ হইতে থাকে। কোন অংশ অল্প দূরে বা কোন অংশ অধিক দূরে যাওয়ায় উহারা একবার পরস্পর নিকটস্থ এবং পরক্ষণে দূরস্থ হইয়া অবিলম্বে ফাটিয়া যায়।

প্রায় সমুদায় উগ্র ভূকম্পে ভূমিতে দীর্ঘাকার বিবরের উৎপত্তি এবং রন্ধ্রপথে জল বালুকা কর্দ্দমের নির্গম ঘটিয়া থাকে। গভীর ও অগভীর বিবরের উৎপত্তির কারণ এক নহে। অগভীর বিবরগুলি কম্পনগতির ফল। উপরের মাটি ফাটিয়া কিছু দূর নীচে পর্য্যন্ত সেই ফাট বিস্তৃত হয়। গভীর বিবরগুলির কারণ ভিতরের প্রস্তর-সমূহের স্খলন। তাহারই চিহ্ন-স্বরূপ উপরের ফাট দেখা যায়। সুতরাং গভীর বিবরগুলিকে বরং ভূকম্পের কারণ বলিতে পারা যায়। যেখানে এরূপ বিবরের উৎপত্তি হয়, সেখানে ভূকম্প অবশ্য প্রচণ্ড হয়।

এই ভূকম্পে আর এক প্রকার বিবর উৎপন্ন হইয়াছিল। খাসিয়া ও গারো পাহারের পাদ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পললময় মৃত্তিকা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ভূকম্পের পর পাদদেশের পরেই ১০।১২ হাত বিস্তৃত নালা বা খাত হইয়া খাতের এদিকের মাটি বাঁধের মত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল খাতের কারণ পাহাড় ও সমস্থলীর পরস্পর ঠেল। পুনঃ পুনঃ পাহাড়ের ঠেল পাইয়া পাদদেশের মৃত্তিকা সরিয়া পড়িয়াছিল। আসাম-বেঙ্গল-রেলপথের ধারে যে সকল টেলিগ্রাফ তারের খুঁটি ছিল, ভূকম্পের পরে তাহাদের অনেকগুলি পূর্ব্বের রেখায় না থাকিয়া ৭।৮ হাত দূরে চলিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, স্থানীয় মৃত্তিকার গুণে খুটিগুলি দূরে সরিয়া

গিয়াছিল। হয় ত, নীচে শিথিল মৃত্তিকা ছিল, তাহার উপর দিয়া খুঁটি-সহ উপরের মৃত্তিকা সরিয়া গিয়াছিল। এই রূপ, উত্তরবঙ্গে, নিম্ন আসামে ও ময়মনসিংহের সমান ধান্যক্ষেত্র সমূহে তরঙ্গের আকারে কোথাও গর্ত্ত ও কোথাও বা শিখরে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকার কারণে ইষ্টারণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথের মনশাই প্রভৃতি নদীর স্তম্ভ পার্শ্ব-দিকে বিচলিত হইয়া থাকিবে। কোন কোন নদীর পাড় গর্ত্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়াতে নদীর বিস্তার কম হইয়া ছিল। রেলপথের লৌহ-রেল-গুলা কোন কোন স্থানে পাশে বাঁকিয়া গিয়াছিল। রেল বাঁকা অর্থ চাপে দুই প্রান্ত নিকটস্থ হইরাছিল। দেখা গিয়া ছিল, যে স্থানে রেল বাঁকিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অতএব বোধ হইতেছে, স্থানে স্থানে মৃত্তিকা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত এদিকে বা ওদিকে সরিয়া গিয়াছিল। এই সকল নৈমিত্তিকের কারণ ভূপৃষ্ঠের পার্শ্বগতি; উহার সহিত উর্দ্ধাধোগতি যুক্ত হইলে অন্যবিধ নৈমিত্তিক ঘটে। বালুকাও জল-নির্গমের কারণ এই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, কোন কোন স্থানে ভূকম্পের পরে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্গমন বন্ধ হয় নাই। এত ঘণ্টা না হউক, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্গমনের সংবাদ অনেক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন স্থানে জল মিশ্রিত বালুকা ১০।১২ হাত উচ্চ হইয়া নির্গত হইয়াছিল। কামরূপ, ময়মনসিং, রংপুর প্রভৃতি স্থানে জলময় বালুকার উৎস দেখা গিয়াছিল। এ সকলের কারণ অজ্ঞাত।

কোন কোন স্থানে কূপ পুষ্করিণী ও নদীর গর্ত্ত উচ্চ হইয়াছিল। বালুকার উৎক্ষেপে কূপাদি পূর্ণ হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাই এক-মাত্র কারণ নহে। কোন কোন নদীর উপরে বাঁশের সেতু ছিল। দেখা গিয়াছে, মাঝের খুঁটি উপর দিকে উচ্চ হইয়াছে। অতএব নদীর গর্ত্তই উপরে উঠিয়াছিল। গারো পাহাড় ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে অনেক স্থান নিম্ন ছিল। মধ্যে মধ্যে খাল বা নালা ছিল। গ্রীষ্মকালে এই

সকল খালে বেশী জল থাকিত না বটে, কিন্তু বন্যার সময় বিস্তর জল ঐ সকল খালপথে চলিয়া যাইত। ভূকম্পে ১০।১২ হাত গভীর খাল-গুলা পাহাড়ের সমান উচ্চ হইয়াছিল। ফলে সেই বৎসর বর্ষাকালে তথাকার চারিদিকের ভূমি জলমগ্ন হইয়াছিল। বহু নিম্ন হইতে মৃত্তিকা আসিয়া নদীগর্ভ উচ্চ করে নাই। নদীর পাড়ের মাটী নিম্নগত হইয়া নদীগর্ভকে উচ্চ করিয়াছিল। বস্তুতঃ ভূকম্পের একটি সাধারণ ক্রিয়া এই দেখা যায় যে, নিম্নভূমি ঊর্দ্ধগত এবং উচ্চভূমি নিম্নগত হইয়া ভূপৃষ্ঠ সমান হয়।

ভূমিকম্পের আর একটি নৈমিত্তিকের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। চেরাপুঞ্জী, শিলঙ্, গৌহাটী, তেজপুর, দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি স্থানে কোন কোন স্তম্ভ আবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভূকম্পের পূর্ব্বে যে স্তম্ভ যে দিকে ছিল, ভূকম্পে তাহা হয়ত ১২, ২০ ৩০, ৪০, ৯০, অংশ পর্য্যন্ত বামে বা দক্ষিণে ঘুরিয়া গিয়াছিল। সংক্ষোভ-পৃষ্ঠের নিকটস্থ চটক নামক স্থানে একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিল। উহা টালি ইট দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। নীচে উহা লম্বা চৌড়ায় ৮ হাত এবং উচ্চতায় ৪০ হাতের ও অধিক ছিল। ভূকম্পে ঐ স্তম্ভ চারি খণ্ডে ভাঙ্গিয়া যায়। এই রূপে তেজপুরে ডাক্তার সাহেবের একটা লোহার সিন্দুক কাঠের চৌকীর উপর বসান ছিল, ভূকম্পে তাহা বামদিকে ৪০ অংশ ঘুরিয়া গিয়াছিল।

অন্যান্য কোন কোন ভূকম্পে স্তম্ভাদির এই রূপ আবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। এই আবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। ওল্ডহাম সাহেব এই সকল মতের আলোচনা করিয়া ভূকম্পে পৃষ্ঠভূমির ঘূর্ণন স্বীকার করিয়াছেন এবং বলেন যে, ভূকম্পের সংক্ষোভ একই দিক্ হইতে আসে না, ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আসে বলিয়া স্থানে স্থানের পৃষ্ঠভূমি ঘুরিয়া যায়।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার

করা যাইতেছে। এই বিষয় সম্বন্ধে ওল্‌ডহাম সাহেব তাঁহার ভূকম্প-বৃত্তান্তে কিছু লেখেন নাই। এ দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল উগ্র ভূকম্প অনুভূত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের কম্পন-পৃষ্ঠজ্ঞাপক একখানি মানচিত্র তিনি তদীয় প্রবন্ধের সহিত যোজিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, ১৮০৩, ১৮১৯, ১৮৩৩, ১৮৫৮, ১৮৬৯, ১৮৮১, ১৮৮৫, এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ আসাম ও বিহার প্রদেশে উগ্র ভূকম্প হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ১৮৪২ ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর প্রদেশে দুইবার ভূকম্প হইয়াছিল। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, একশত বৎসরের মধ্যে এদেশে দশবার ভূকম্প হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের দুইটি ভূকম্প ছাড়িয়া দিলে, অপর আটটি ভূকম্পের সংক্ষোভ পৃষ্ঠ প্রায়ই আসাম হইতে পাটনা পর্যান্ত কোন না কোন স্থানে ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ভূকম্পের কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরে এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভূকম্পের কেন্দ্র মালব প্রদেশে ছিল। কিন্তু কোনটিরই কেন্দ্র দক্ষিণাপথে বা পশ্চিম ভারতে ছিল না। মধ্যভারতে একটির মাত্র কেন্দ্র ছিল। সুতরাং বোধ হইতেছে, ভূগর্ভের যে নিসর্গ-বশতঃ দক্ষিণাপথের জন্ম হইয়াছিল, তাহার শান্তি হইয়াছে কিন্তু যদ্দারা আসামের পাহাড় ও হিমালয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার এখন ও বিরাম হয় নাই। ইহার ফলে বঙ্গদেশকে এখনও অনেকবার কম্পিত হইতে হইবে। এই শতাব্দীতে যে সকল ভূকম্প ভারতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেগুলির কেন্দ্র যেন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে। আসামের পাহাড়গুলিও অত্যন্ত পুরাতন নহে। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলিতে অদ্যাপি উহাদের ত্রিবিধ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রথমে যে পুরাতন পৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সেই পুরাতন পৃষ্ঠ সহিত ভূত্বক্ স্খলিত হইয়া পাহাড় হইয়াছে। সমভাবে সর্ব্বত্র এক সঙ্গে স্খলিত না হইয়া এখানে ওখানে বিদীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উহাই পাহাড়গুলির দ্বিতীয় অবস্থা। তার পর, নদীসকল

উহাদের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে করিতে উহাদিগকে তৃতীয় অবস্থায় আনিয়াছে। যখন পূর্ব্বাবস্থার লক্ষণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তখন উহাদের বয়ঃক্রম অধিক নহে। সুতরাং যে কারণে উহাদের উৎপত্তি, তাহাদের বোধ হয় অবসান হয় নাই। তাই বোধ হয়, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভাগ্যে এখনও অনেক বিপত্তি লিখিত আছে।

—o—

বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত।

জন্ম, শিক্ষা, বৈরাগ্য, গৃহত্যাগ, ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ, গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে যোগ, বারাণসীতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মপ্রচার, শিষ্যসংগ্রহ, শিষ্য ও শিষ্যাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ, নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, কুশীনগরে দেহ ত্যাগ। বুদ্ধদেবের মত ও কার্য্য, জনসমাজ তাঁহার নিকট কিরূপ ঋণী, মহারাজ অশোকের সময়ে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অবস্থা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ পরিণতি।

(৪)

নিদাঘের অত্যন্ত প্রবলতা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সহস্রাংশুর অংশু রাশিতে চতুর্দ্দিক্ জ্বালাময়, ধরিত্রীবক্ষঃ উত্তপ্ত, জলাশয়ে বিন্দুমাত্র জল নাই, শুষ্ক বৃক্ষপত্রগুলির মুর্ম্মুর ধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত, তৃষার্ত্ত প্রাণিকুল কাতর নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে, দুঃসহ গ্রীষ্মতাপ আর সহ্য হয় না, সহসা নভোমণ্ডলে মেঘোদয় হইল, নবজলধরের শ্যামলতনু কি মনোহর! মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীর মন্দ্রধ্বনি, দেখিতে দেখিতে তুষার-শীতল বারি পাতে জীবজগৎ পুলকিত, নিদাঘের সন্তাপ প্রশমিত হইল, প্রান্তরে শস্তের শোভা ধরে না, হাহাকারের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র আনন্দকোলাহল, অশান্তির রাজ্যে পরম শান্তি প্রতিষ্ঠিত।

ঋতু পরিবর্ত্তনে যেমন জগতের ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে, মহাপুরুষদের আবির্ভাবে ও জগতের অবস্থা তদ্রূপই হয়। যখন অত্যাচারে ও অনাচারে দেশ প্রপীড়িত হয়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সর্ব্বত্র আপন অধিকার বিস্তার করে, জীবজগৎ হইতে শান্তি ও নৈতিক ভাব তিরোহিত হয়, তখনই এক একজন মহাপুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ঐশী শক্তি প্রভাবে ধর্ম্মও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। উহাই ঐশী-লীলা বা অবতার নামে কীর্ত্তিত।

দ্বাপরযুগের অবসানে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ভারতের রাজন্যশক্তি বিলুপ্ত প্রায় হয়। সেই মহাশোকের সময়ে সমাজে ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠে। শাস্ত্রকারেরা অবসর বুঝিয়া যাগযজ্ঞ শ্রাদ্ধ পূজা ও ব্রত নিয়মাদির সংখ্যা বাড়াইয়া দেন এবং ঐ সকল কার্য্যের পরিণামে যে পারত্রিক সুখ সংঘটিত হয়, শাস্ত্রমধ্যে উহার মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়া জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেন। ইহার ফলে সমাজে ধর্ম্মান্ধতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্মের নামে ন্যায় অন্যায় বোধ অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাগ যজ্ঞে অজস্র পশুহিংসা যাজক সম্প্রাদায়ের অতিরিক্ত প্রভাব ও নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি অবজ্ঞার ভাব দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই ঘোর অশান্তির সময়ে সমাজে অভিনব সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়, তজ্জন্যই ভগবান্ বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব। তাঁহার আগমনে সমাজের ঐ সকল বৈষম্য ও অশান্তি কি পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গে উহা বিবৃত করা যাইতেছে।

পুরাকালে অযোধ্যার উত্তর পূর্ব্ব কোণে কপিলবাস্তু নামে একটি সমৃদ্ধ নগরী বিদ্যমান ছিল। উক্ত নগরে শাক্যরাজ সিংহহনু রাজত্ব করিতেন। সিংহহনুর শুদ্ধোদন ধৌতোদন শুক্লোদন ও অমৃতোদন নামে চারি পুত্র ও অমিতা প্রমিতা নাম্নী দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন শুদ্ধোধন পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি দেবদহ নগরের অন্য এক শাক্যরাজ (১) অঞ্জনের (২) দুই কন্যা মায়া ও মহাপ্রজাবতীর পাণি গ্রহণ করেন। এই দুই মহিষীর অন্যতমা মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবী অন্তঃসত্ত্বা হন। মহাপুরুষদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রায়ই নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়, বুদ্ধের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বেও উহা ঘটিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন, রজতগিরিনিভ সূর্য্যাতিরিক্ত-তেজস্বী সুলক্ষণাক্রান্ত কোন সুন্দর মহাত্মা তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা শুদ্ধোদন স্বপ্নাধ্যায়পাঠক ব্রাহ্মণগণের নিকট উক্ত স্বপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন;—"দেবীর গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন। উক্ত পুত্র গৃহে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, আর যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বলোকানুকম্পী বুদ্ধ হইবেন।"

দশম মাস অতীত হইল, একদা মায়াদেবী পতির সহিত কপিলবাস্তু নগরের সন্নিহিত লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে

---

(১) পুরাতত্ত্ববিৎগণ অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন;—শাক্য শব্দে শকজাতি সম্ভূত ক্ষত্রিয়। কারণ, বুদ্ধের পিতা, পিতামহ, শ্বশুর সকলেই শাক্যরাজ। প্রকৃতপক্ষে ও পুরাকালে যাহারা প্রজারক্ষণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শাক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, আর্য্য ও শক একস্থান হইতেই সমাগত। শক শব্দের ব্যুৎপত্তি;—(শক্নোতি প্রজাঃ (রক্ষিতুম্) ইতি শকঃ (বস্তুতঃ অশ্বমেধ প্রভৃতি বলবীর্য্যের পরিচায়ক যজ্ঞাদি প্রথমে শক জাতি কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইত। অতএব শক শব্দের অর্থই ক্ষত্রিয়। রাজপুতানার চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ যাদববংশ প্রভৃতি রাজবংশ সকলও শক নামধেয় ক্ষত্রিয় হইতেই উৎপন্ন।

(২) কোন কোন গ্রন্থের মতে মায়াও প্রজাবতী শাক্যরাজ স্বভূতির কন্যা। অন্য মতে মায়াও মহাপ্রজাবতী সুপ্রবুদ্ধ নামক শাক্যরাজের দুহিতা।

ছিলেন, এমন সময় তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি অচিরকাল মধ্যে একটি মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ সময় জগৎ এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। দিক্ সকল প্রসন্ন এবং চতুর্দ্দিকে সুখ-শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবাকর সুবর্ণময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বিশ্ব আলোকিত করিলেন। জনসাধারণের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। পুত্রের জন্ম গ্রহণে রাজা শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন 'সিদ্ধার্থ' ও 'সর্ব্বার্থসিদ্ধ'। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ বহু অনুসন্ধানদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। তিনি যে দিবস ভূমিষ্ঠ হন, উহার সাত দিবস পরে তাঁহার জননী মায়াদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পর, রাজা অচিরজাত তনয়কে লইয়া কপিলবাস্তু রাজধানীতে উপনীত হন। সিদ্ধার্থের মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতীগৌতমীই তাঁহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন শিশুর পরিচর্য্যার নিমিত্ত অঙ্গ-ধাত্রী, ক্ষীরধাত্রী, ক্রীড়াধাত্রী প্রভৃতি বহু পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেখানে বিশ্বামিত্র নামক উপধ্যায়ের নিকট তিনি নানাদেশীয় চতুঃষষ্ঠি-প্রকার লিপি শিক্ষা করেন। ঐ সকল লিপির মধ্যে দেবলিপি, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, হূণ-লিপি, চীনলিপি, গৌড়ানীলিপি, অসুরলিপি প্রভৃতিও ছিল। এইরূপে সিদ্ধার্থ সর্ব্বদেশীয় বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, বার্হস্পত্য-নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি গুরুগৃহ হইতে কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রত্যানীত হন। একদা রাজা শুদ্ধোদন অন্যান্য কুমারগণের সহিত সিদ্ধার্থকে কৃষিগ্রাম পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। সকলে নানাবিধ

শস্যক্ষেত্র ও নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু সিদ্ধার্থ অচঞ্চল, তিনি একটি জম্বুবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া প্রথম ধ্যান দ্বিতীয় ধ্যান তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সময় যাইতে লাগিল, সিদ্ধার্থ দিন দিন গম্ভীর অপেক্ষাও গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে হিমবৎ-প্রদেশস্থ কালদেবলনামা কোন ঋষি স্বীয় ভাগিনেয়ের সহিত কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। তিনি সিদ্ধার্থের সর্ব্বশরীরে মহাপুরুষের লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা শুদ্ধোদনকে বলিয়াছিলেন ;—"আপনার পুত্র গৃহে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, আর গৃহত্যাগী হইলে সম্যক্ সম্বুদ্ধি লাভ করিবেন।" পুত্রের নিরতিশয় গাম্ভীর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার মনে আশঙ্কার উদয় হইল, স্বপ্নাধ্যায়বেত্তা ব্রাহ্মণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্ ঋষি কালদেবলের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। সুতরাং যাহাতে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ না করেন, তজ্জন্য রাজা তাঁহাকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন ;—"ওহে দ্বিজবর! এই কপিলবাস্তু মহানগরে ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা বা শূদ্রকন্যার মধ্যে যাহাতে সর্ব্বগুণ বিদ্যমান আছে, এরূপ একটি কন্যার সন্ধান কর।" পুরোহিত বহু অনুসন্ধানের পর সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরার সহিত সিদ্ধার্থের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করেন। *

বিবাহের পর কিছুদিন পরে সিদ্ধার্থের একটি পুত্র জন্মে। পুত্রটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত। ইনিই শেষে রাহুল নামে বিখ্যাত হন। পূর্ণযৌবনে সংসারের প্রতি অত্যাসক্তিই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কিন্তু সিদ্ধার্থের জীবনে উহার বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বক্ষণ

* কোন কোন মতে সিদ্ধার্থ দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা গোপার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

সংসারের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন ;—'জগতের সর্ব্ব পদার্থই ক্ষয়ান্তধর্ম্মী। কামরাজ্য-ভোগ অনিত্য। অধুনা জন্ম জরা ব্যাধি মরণ প্রভৃতি দ্বারা বিশ্বসংসার প্রজ্বলিত হইতেছে। কল্পান্তকালে ভীষণ হুতাশন জগৎকে দগ্ধ করিবে। শরৎকালীন মেঘের ন্যায় এই জগৎ অধ্রুব। নভঃস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় আয়ু নিতান্ত চঞ্চল। সংসারের সকল বস্তুই জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণিক। স্বপ্ন, উদকচন্দ্র এবং মায়ামরীচিকা যেরূপ অলীক, পৃথিবীও সেইরূপ মিথ্যাভূত। ভ্রমর যেমন কুম্ভমধ্যে বদ্ধ হইয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করে, সংসারের মূঢ় জীবগণও সেইরূপ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া নিরন্তর সংসার-পথে বিচরণ করিতেছে। অতএব এরূপ মায়াময় সংসারে আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।' পুত্রের ঐরূপ চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদনের অন্তঃকরণে দিন দিন আশঙ্কার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি পুত্রের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনের নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। রাজা, পুত্রের গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত প্রভৃতি ঋতুতে সুখে বাসের জন্য উদ্যান ও জলাশয়-সমন্বিত বিভিন্ন-আকার প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইল না। তিনি দিন দিন সংসারের প্রতি আসক্তি-শূন্য হইতে লাগিলেন।

একদা সিদ্ধার্থ উদ্যানভূমি সন্দর্শনের মানস করেন। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া নগরে ঘণ্টা-ঘোষণা করিয়া দিলেন "কুমার উদ্যানভূমি সন্দর্শনে যাইবেন। অতএব পথিস্থিত অপ্রীতিকর বস্তু সকল দূরে অপসারিত করা হউক। যে পথে কুমার গমন করিবেন, ঐ পথ যেন ছত্র ধ্বজ পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত ও গন্ধোদক দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়। পথের উভয় পার্শ্বে পূর্ণ কুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ বিরাজ, করুক"। রাজার আদেশ অনুসারে উদ্যানপথ উত্তমরূপে সুশোভিত করা হইল। কুমার সুসজ্জিত রথে গিয়া আরোহণ

করিলেন। রথ দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সহসা রাজকুমারের নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি উহাকে দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, তথাপি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে সারথি! ঐ যে লোকটি দণ্ড ধারণ করিয়া স্খলিতপদে যাইতেছে, উহার দেহ দুর্ব্বল ও স্থৈর্য্য-বিহীন, মাংস রুধির ও ত্বক্ সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহের স্নায়ু সকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উহার মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্ত বিরল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিকৃশ, ইহার কারণ কি?"

সারথি উত্তর করিল;—"দেব! ঐ ব্যক্তি জরা দ্বারা অভিভূত হইয়া ক্লিষ্ট ও বলবীর্য্য-বিহীন হইয়াছে। আত্মীয়গণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকাষ্ঠ যেমন পড়িয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া দুঃখে কাল যাপন করিতেছে।"

কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এই রূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি ঐ ব্যক্তির কুলধর্ম্ম অথবা সংসারের সকল লোকেরই ঈদৃশ অবস্থা ঘটিয়া থাকে? তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর প্রদান কর। তোমার কথা শুনিয়া ইহার প্রকৃত কারণ চিন্তা করিব।"

তখন সারথি বলিলেন;—"দেব! ইহা এ ব্যক্তির কুলধর্ম্ম নহে, সংসারের সকল লোকেরই যৌবন জরা কর্ত্তৃক অভিভূত হয়। আপনি এবং আপনার পিতা মাতা বান্ধব জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই জরার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। লোকের অন্যগতি নাই।"

কুমার পুনরায় বলিলেন;—"ওহে সারথি! লোক সকল নির্ব্বোধ, তাহাদের বুদ্ধিকে ধিক্; তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া বার্দ্ধক্যের বিষয় চিন্তা করে না। তুমি রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি ঐ জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকেও আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়া সুখে প্রয়োজন নাই।"

আর এক দিন কুমার নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় একটি ব্যাধিগ্রস্ত লোক তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ যে লোকটি কুৎসিত মলমূত্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহার গাত্র বিবর্ণ ইন্দ্রিয়সকল বিকল ও সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক হইয়াছে কেন ?"

সারথি উত্তর করিল ;—"দেব ! এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন, আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার শরীরের সামর্থ্য বিনষ্ট হইয়াছে, রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই, সুতরাং এ ব্যক্তি অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।"

কুমার বলিলেন ;—"আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অলীক, ব্যাধিসমূহ অতি ভয়ঙ্কর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা জগতে সুখ আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন ?"

অন্য এক দিবস কুমার যখন নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যান ভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন একটি মৃত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"সারথি ! ঐ লোকটি মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন ? লোকেরা উহাকে বেষ্টন করিয়া বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে এবং নানা প্রকারে বিলাপ করিতেছে, ইহার কারণ কি ?"

সারথি বলিল ;—"দেব ! এই লোকটির মৃত্যু হইয়াছে, এ ব্যক্তি পুনরায় পিতা মাতা পুত্র ও পত্নী প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে না। এ চির-কালের জন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিতেছে।"

কুমার বলিলেন ;—"মানুষের যৌবনে ধিক্, কারণ জরা উহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যে হেতু বিবিধ প্রকার ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। জীবনে ধিক্, কারণ কোন প্রাণীই চিরজীবী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে

ধিক্, যে হেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া থাকেন। যদি জরা ব্যাধি এবং মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলেও মানুষের বিবিধ মানসিক মহাদুঃখ ভোগ করিতে হইত। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্যসহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিব।"

অন্য এক দিবস কুমার নগরের উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যান-ভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, সহসা একটি শান্ত দান্ত সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষু তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"সারথে! ঐ গৈরিকবসন যুবা কে? আহা উনি কেমন বিনয়ী এবং প্রশান্ত-চিত্ত। উঁহার চক্ষুদ্বয় স্থির। উনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। ভিক্ষাপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া কেমন শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, দেখিলে বোধ হয় যেন ইনি সর্ব্বদা অন্তকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

সারথি বলিলেন;—"দেব! ইনি ব্রহ্মচারী ভিক্ষু, কামসুখ পরিত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মার শান্তি অন্বেষণে নিরত। ইঁহার আসক্তি অথবা বিদ্বেষ নাই, সামান্য আহারেই ইনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট।"

কুমার বলিলেন;—"সারথে! তুমি উত্তম কথা বলিলে, উহা অতি সৎ ও রমণীয়। উহাতে আমার রুচি হইতেছে। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা প্রব্রজ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া নিজের হিত ও অন্য জীবের হিত সাধন করিতে পারা যায় এবং পবিত্র সুখে জীবন অতিবাহিত হয়। সুমধুর অমৃত (মুক্তি) ঐ আশ্রমের ফল।"

তাহার পর, কুমারের ঐরূপ সংসার-বৈরাগ্যের বিষয় নগর মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিবার

জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত কোন উপায়ই সফল হইল না। কুমার গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি একদা নিশীথকালে পিতার শয়নাগারে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ;—"পিতঃ অদ্য আমি গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিব"। সেই সময়ে সিদ্ধার্থের মনে চারিটি বিষয়ে প্রণিধান উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম ;—সংসার বন্ধন হইতে জনসাধারণের মোচন। দ্বিতীয় ;—সংসার মহান্ধকারে প্রক্ষিপ্ত জনসাধারণের প্রজ্ঞাচক্ষু প্রদান। তৃতীয় ;—অহঙ্কারে মত্ত জনসাধারণের প্রকৃত পথ প্রদর্শন। চতুর্থ ;—সংসার-চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল জনসাধারণের প্রজ্ঞা-তৃপ্তিকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান।

এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন শোকে স্তম্ভিত, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইলনা। কুমার অবিলম্বে সারথি ছন্দককে রথ সজ্জিত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ছন্দক কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল ;—"দেব! আপনি বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্তু-রাজ্য সমৃদ্ধ ও রমণীয়। মুনিগণ ঈদৃশ সম্পদ্ ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়াই কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ্ পাইয়াও পরিত্যাগ করিতেছেন? দেখুন আপনার পত্নীর সৌন্দর্য্য কেমন রমণীয়। পদ্মপলাশের ন্যায় লোচন, সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা, চিত্তাকর্ষক বদনমণ্ডল। ইনি নানবিধ উজ্জ্বল মণিরত্নে ভূষিত হইয়া শয্যায় নিদ্রিত আছেন। সংপ্রতি আপনার একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই শিশু সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, কালে চতুর্দ্বীপের অধিপতি হইবে। অতএব আপনি এই দুর্লভ বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, আপনি বিরত হউন।"

কুমার সিদ্ধার্থ উত্তর করিলেন ;—"ছন্দক! আমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি বহুবিধ কাম্য বস্তু ইহলোকে ও দেবলোকে ভোগ

করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহ ত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার মস্তকে বজ্র শর কুঠার প্রস্তর প্রজ্বলিত-লৌহ অথবা অগ্নেয়গিরি নিক্ষিপ্ত হউক, তথাপি আমি গৃহস্থাশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।" সিদ্ধার্থের ঐরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ছন্দক রথ সজ্জিত করিল। অর্দ্ধরাত্র সময়ে তিনি জগতের যাবতীয় দুর্লভ পার্থিব ঐশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় বিসর্জ্জন করিয়া গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন। সিদ্ধার্থ শাক্য কোড্য মল্ল ও মৈত্রেয় প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম পূর্ব্বক ছয় যোজনের পথ গমন করিলে রজনী প্রভাত হইল। কুমার গাত্র হইতে সমুদয় আভরণ উন্মুক্ত করিয়া ছন্দককে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন। ছন্দক অশ্রু মোচন করিতে করিতে কপিলবাস্তু নগরে ফিরিয়া গেল। সিদ্ধার্থ মস্তকের চূড়া উন্মোচনপূর্ব্বক বনপথে এক ব্যাধের কাষায় বস্ত্রের সহিত আপন কৌষিক বস্ত্রের বিনিময় করিয়া পরিধান করিলেন। সারথি সিদ্ধার্থের আভরণ লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ আর গৃহে ফিরিবেন না, শুনিয়া শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাবতী গভীর শোকে নিমগ্ন হইলেন। যশোধরা প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া জানিতে পারিলেন, স্বামী সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন এবং মূর্চ্ছাপগমে উঠিয়া গাত্র হইতে সমুদয় অলঙ্কার উন্মোচন ও মস্তকের কেশরাশি কর্ত্তিত করিলেন। যশোধরা নিতান্ত দীনার ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন;—"আমার পরিণেতা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, আমি অদ্য হইতে জীবনের সমুদয় প্রিয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হইলাম।"

* সিদ্ধার্থ ছন্দককে বিদায় করিয়া যথাক্রমে শাক্যা ও পদ্মাবতী নাম্নী দুই ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য অঙ্গীকার করেন। তাহার পর, ব্রহ্মর্ষি রৈবতের আশ্রম সন্দর্শনপূর্ব্বক বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন।

সেখানে আড়ারকালাম নামক এক অধ্যাপকের মঠে গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত অধ্যাপকের নিকট তিন শত শিষ্য অধ্যয়ন করিত। বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হওয়াই মুক্তি, আড়ারকালাম শিষ্যদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেন কিন্তু সিদ্ধার্থ ঐরূপ শিক্ষায় বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাহার পর, তিনি মগধের পাণ্ডবরাজ-পর্ব্বত সমীপে কিছু কাল বিহার করেন। ঐ সময় রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। একদিন রাজগৃহের রাজা বিম্বিসার নগরবাসীদের নিকট এক অপরিচিত ব্রহ্মচারীর সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী ও প্রজাগণের সহিত পাণ্ডবপর্ব্বত-রাজ সমীপে উপনীত হইলেন। জ্যোতিঃপুঞ্জ-কলেবর সিদ্ধার্থকে দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত প্রীতি উপস্থিত হইল। রাজা সিদ্ধার্থকে স্বকীয় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া আপন সহকারী করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধার্থ কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি কামসুখের প্রার্থী নহি। কামের বশে লোকে নরকে গমন করে। তজ্জন্য জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা কামনার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি উহা পরিত্যাগ করিয়াছি।" তাহার পর, রাজা, সিদ্ধার্থের পরিচয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "স্বামিন্ আপনি যদি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিব।" বিম্বিসার সিদ্ধার্থকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলে সিদ্ধার্থ রাজগৃহনগরবাসী রুদ্রক নামক এক অধ্যাপকের নিকট গমন করেন। রুদ্রক বলেন;—"শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটি অবলম্বন করিয়া মোক্ষ মার্গের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তি হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়।" সিদ্ধার্থ রুদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি মগধের গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপস্থিত হন। তাঁহার মনে হয় 'যদি কেহ অগ্নি উৎপাদন করিতে মানস করিয়া আর্দ্র কাষ্ঠ জলমধ্যে

সংস্থাপন করে এবং আর্দ্র অরণি দ্বারা ঘর্ষণ করে, তাহা হইলে সে কখন অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে না, যাঁহার চিত্ত রাগাদি দ্বারা আর্দ্র রহিয়াছে, তিনি কখনও জ্ঞান জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারেন না।'

অনন্তর তিনি গয়া-প্রদেশের উরুবিল্বা গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জনা নাম্নী নদী দেখিতে পাইলেন। ঐ নদীর রমণীয় তীরে বোধিদ্রুম-মূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন;—'বর্ত্তমান জম্বুদ্বীপ পঞ্চবিধ পাপদ্বারা কলুষিত হইয়াছে, অতএব এই দ্বীপবাসীদিগকে কিরূপে ধর্ম্ম কার্য্যে অভিনিবিষ্ট করা যায়, ইহা আমার চিন্তনীয়।' তাহার পর, ষড়্‌বর্ষব্যাপিনী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সিদ্ধার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন;—"এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক অথবা আমার ত্বক্ অস্থি মাংস এই স্থানে বিলীন হউক, তথাপি আমি বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া এই আসন হইতে উত্থিত হইব না।" ঐ স্থানে যোগস্থ হওয়ার পর তাঁহার অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ স্বীয় প্রভাবে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল এবং তাহাতে রাগ দ্বেষ মোহ বিন্দুমাত্র রহিল না। তিনি সমাধিমগ্ন হইয়া নিরুপদ্রবে ধ্যান সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ষড়্‌বর্ষের অবসানে একদিন রাত্রির প্রথম যামে তাঁহার দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হইল, মধ্যম যামে তাঁহার পূর্ব্বতন বিষয় সমূহ মনে পড়িল, শেষ যামে তিনি জগতের দুঃখের কারণ সমূহ ভাবিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখসমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হইল। এই সময় বোধিসত্ত্বের বয়স পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ। তিনি বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন;—"আমি এই দেহরূপ গৃহ-রচনাকারিণী তৃষ্ণার অন্বেষণ করিতে করিতে অনেকবার পৃথিবীতে পরিভ্রমণ ও নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। হায় হায়, পুনঃ পুনঃ

জন্মগ্রহণ কি দুঃখজনক। হে গৃহরচয়িত্রি! আজ আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি আর পুনরায় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের স্তম্ভ পার্শ্বদণ্ড প্রভৃতি আমি সম্পূর্ণ রূপে ভগ্ন করিয়াছি। আমার চিত্ত তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়াছে।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব জগতে স্বোদ্ভাবিত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যাঁহাদের রাগ দ্বেষ মোহ মন্দীভূত হইয়াছে, এমন শুদ্ধসত্ত্ব সুবিনীত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে সর্ব্ব প্রথমে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা উচিত। তাহার পর, তাঁহার পূর্ব্বতন পাঁচ জন সঙ্গীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তাঁহারা বারাণসী নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে আজীবক সম্প্রদায়ের কোন দার্শনিকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;—"গৌতম! তুমি কোথা যাইবে?" বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন "আমি বারাণসী গমন করিব, আমি কাশিকা পুরীতে গিয়া অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব"। তখন পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক শ্লেষ পূর্ব্বক বলিবেন;—"গৌতম! তোমার গন্তব্য পথ অনেক দূর, আমি চলিলাম বলিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া কৌণ্ডিন্য ভদ্রজিৎ বাষ্প মহানাম ও অশ্বজিৎ নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীর মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে * যখন ঐ ব্রাহ্মণগণের অভিমুখে গমন করেন, তখন তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, সুতরাং বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, আপন মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেবর বুদ্ধদেব যখন তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন,

---

* অধুনা বারাণসীর কয়েক ক্রোশ দূরে যেখানে সারনাথ নামক বহুদূরব্যাপী অরণ্যময় স্থান দৃষ্ট হয়, উহাই পুরাকালে মৃগদাব ঋষিপত্তন নামে অভিহিত হইত। এখনও ঐ স্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তির অসংখ্য নষ্টাবশেষ দৃষ্ট হয়।

তখন তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না, কম্পিতকলেবরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন। বোধিসত্ত্বের সহিত ব্রাহ্মণগণের বহুক্ষণ ধর্ম্মালাপ হইল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন :— "হে গৌতম! আপনার দেহকান্তি সুবিমল দেখিতেছি, আপনার ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, আপনি অলৌকিক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন "আমি অমৃত সাক্ষাৎ করিয়াছি, অমৃতগামী পথ আমার নয়ন গোচর হইয়াছে।" তাহার পর, ব্রাহ্মণগণ বোধিসত্ত্বের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন "প্রব্রজিতগণ প্রায়শঃ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কেহ কেহ হীন গ্রাম্যসাধারণ লোকের ন্যায় সর্ব্বদা কামসুখে রত থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান বা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধের প্রয়াস করেন না। অপর শ্রেণীর প্রব্রজিতগণ সতত নিজকে নিপীড়িত করেন। যাহাতে নিজের কষ্ট হয়, সেইরূপ কার্য্যেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। এই উভয় পদ্ধতিই হেয় এবং আর্য্যজন-বিগর্হিত। বোধিসত্ত্ব এই উভয় পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর, তিনি চুয়ান্নটি রাজকুমার এবং অগ্ন্যুপাসক-সম্প্রদায়ের এক সহস্র লোককে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

কিয়ৎকাল পরে বারাণসীর মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন যশনামক এক শ্রেষ্ঠি-পুত্র বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের অল্পদিন পরে তাঁহার আরও চুয়ান্ন জন বন্ধু বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকে কতিপয় নিয়মের অধীন করিয়া সদ্ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত নানাস্থানে প্রেরণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি বারাণসী ত্যাগ করিয়া গয়ার সন্নিহিত উরুবেলায় প্রত্যাগত হন। প্রথমে উরুবেলার ত্রিশ জন ধনী যুবক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ স্থানে উরুবেলাকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ নামে তিনটি ব্রাহ্মণ বাস

করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্রী। পাঁচশত শিষ্য উঁহাদের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় বোধিসত্ত্বের প্রভাবে উঁহারা তিনজনেই শিষ্যগণ সহ আসিয়া বোধিসত্ত্বের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেন। তাহার-পর, তথাগত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গমন করিয়া এক সহস্র শিষ্যের সম্মুখে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। উক্ত স্থান হইতে তিনি রাজগৃহের যষ্টিকবনে আসিয়া বাস করেন। মগধরাজ বিম্বিসার দ্বাদশ সহস্র মাগধ ব্রাহ্মণ সহ আগমন করিয়া তথাগতের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে তিনি বলিয়াছিলেন;— "আমার পাঁচটি বাসনা ছিল। ১ম; আমি যেন রাজপদে অভিষিক্ত হই। ২য়; ভগবান্ বোধিসত্ত্ব যেন আমার রাজ্যে আগমন করেন। ৩য়; আমি যেন ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে পূজা করিতে পারি। ৪র্থ; ভগবান্ বোধিসত্ত্ব যেন আমার নিকট ধর্ম্ম প্রচার করেন। ৫; আমি যেন ভগবান্ বোধিসত্ত্বের প্রচারিত ধর্ম্মমত সম্যক্‌রূপে ধারণ করিতে পারি। হে ভগবন্ আজ আমার সেই পাঁচটি আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইল।" ঐ দিন ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্ব রাজা বিম্বিসারের গৃহে ভোজন করেন। মগধরাজ বিম্বিসারের বেণুবন নামে একটি রমণীয় উদ্যান ছিল। তিনি একটি সুবর্ণপাত্রে জল লইয়া উহা তথাগতের হস্তে প্রক্ষেপপূর্ব্বক উক্ত উদ্যানটি বোধিসত্ত্ব-প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করেন। ঐ সময় রাজগৃহে সঞ্জয়নামক এক পরিব্রাজক বাস করিতেন। তিনি দুইশত পঞ্চাশ জন পরিব্রাজকের গুরু। সঞ্জয়ের শিষ্যগণের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন প্রধান। একদিন বুদ্ধের অশ্বজিৎ নামক এক শিষ্য রাজগৃহে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া সারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ওহে বন্ধো! আপনার মূর্ত্তি প্রশান্ত, বর্ণ পরিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল, আপনি কাহার শিষ্য, কোন্ ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন?" অশ্বজিৎ উত্তর করিলেন;—"আমি শাক্য-বংশীয় গৌতম বুদ্ধের শিষ্য, তাঁহারই নামে সংসার ত্যাগ করিয়াছি,

তদুপদিষ্ট ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া থাকি।" সারিপুত্র অশ্বজিতের নিকট বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম অবগত হইয়া মৌদ্গল্যায়নের নিকট গিয়া উহা ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার পর, উভয়েরই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইল। তাঁহারা সঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বেণুবন বিহারে আগমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই ঘটনায় রাজগৃহবাসীরা বুদ্ধের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে তাহাদের কোপ প্রশমিত হইল, তাহারা বুঝিল, বোধিসত্ত্ব সত্যপথে লোককে পরিচালিত করিতেছেন।

কিয়ৎকাল পরে বোধিসত্ত্ব কপিলবাস্তু নগরে উপস্থিত হইয়া শিষ্যগণ সহ তত্রত্য ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করেন। একদা পূর্ব্বাহ্ণে তিনি পীতবসন পরিধানপূর্ব্বক ভিক্ষা পাত্র হস্তে করিয়া শিষ্যগণ সহ শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের রাজধানীতে উপস্থিত হন। রাজা শুদ্ধোদন তথাগতের সমীপে আগমন করিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন;—"বৎস! তুমি আমাদিগকে কেন লজ্জিত করিতেছ, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবার কারণ কি? তুমি কি মনে কর, আমি তোমাকে ও তোমার শিষ্য-মণ্ডলীকে আহার দানে অসমর্থ?" তথাগত উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ইহা আমার কুলধর্ম্ম।" শুদ্ধোদন বলিলেন, "আমরা ক্ষত্রিয়, রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মধ্যে কেহ কি কখনও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে?" তথাগত উত্তর করিলেন, "আমার বংশ রাজবংশ নহে, বুদ্ধগণ আমার পূর্ব্বপুরুষ, আমি তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথা অনুসারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি।" তাহার পর, রাজা শুদ্ধোদন শিষ্যগণ সহ তথাগতকে গৃহ-মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি রাজা মন্ত্রী ও প্রজাবর্গের নিকট সদ্ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলেন। বোধিসত্ত্বের উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত রাজপরিবারস্থ সকলেই উপস্থিত

হইলেন, কেবল তাঁহার পত্নী যশোধরা সেখানে আগমন করেন নাই। রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে বোধিসত্ত্ব একবার যশোধরার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যশোধরা দীনবেশে ভূতলে উপবিষ্ট আছেন। তিনি নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা যশোধরাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় ন্যগ্রোধারামে ফিরিয়া গেলেন। একদিন যশোধরা পুত্র রাহুলকে বলিলেন, "বৎস! ন্যগ্রোধারামে যে সন্ন্যাসী বাস করেন, তিনি তোমার পিতা, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন প্রার্থনা কর।" রাহুল তথাগতের নিকট গমন করিয়া বলিলেন;—"হে শ্রমণ! আপনার ছায়া আমার পদ দ্বারা স্পৃষ্ট হইবে আশঙ্কায় আমি আপনার নিকট দাঁড়াইতে পারিতেছি না।" বোধিসত্ত্ব ঐ কথা শুনিয়া আসন ত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। রাহুল তাঁহার অনুগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে শ্রমণ! উত্তরাধিকার সত্ত্বে আমার যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা আমাকে প্রদান করুন।" তথাগত স্বীয় শিষ্য সারিপুত্রকে বলিলেন;—"হে ভিক্ষো! রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান কর।" সারিপুত্র তথাগতের আজ্ঞা অনুসারে রাহুলের মস্তক মুণ্ডিত এবং পীতবসনে দেহ আবৃত করিয়া ভিক্ষুদের চরণ বন্দনা করিতে বলিলেন। তাহার পর, রাহুল কৃতাঞ্জলিপুটে তিনবার বলিলেন, "আমি বুদ্ধের আশ্রয় লইলাম, আমি ধর্ম্মের আশ্রয় লইলাম, আমি সঙ্ঘের আশ্রয় লইলাম।" এই রূপে রাহুল সাত বর্ষ বয়সে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। রাহুলকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেখিয়া শাক্যরাজ শুদ্ধোদন ন্যগ্রোধারামে বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন;—"ভগবন্ আপনি আমার পুত্র, যখন আপনি সংসার ত্যাগ করেন, তখন দুঃখে আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছিল। আমার অন্য পুত্র নন্দ যখন গৃহ ত্যাগ করে, তখনও আমার শোকের পরিসীমা ছিল না। রাহুল সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করায় আমি একেবারে বিকল হইয়া পড়িয়াছি। ভগবন্ পুত্রাদির বিরহে পিতার যে কি কষ্ট তাহা আমি বিলক্ষণ

অনুভব করিতেছি। অতএব হে ভগবন্ আমার নিবেদন এই, পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত আপনি যেন কাহাকেও সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত না করেন।" শুদ্ধোদনের প্রার্থনা অনুসারে তথাগত নিয়ম করিলেন, 'যিনি কোন ব্যক্তিকে পিতা মাতার আদেশ ব্যতীত প্রব্রজ্যা প্রদান করিবেন, তিনি দুষ্কৃত করার অপরাধে অপরাধী হইবেন।'

বোধিসত্ত্ব দীর্ঘকাল কপিলবাস্তুতে অবস্থিতির পর শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করেন। তথায় অনাথপিণ্ডদ নামক কোন ধনীর জেতবন বিহারে অবস্থিতিকালে কতিপয় বালককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শ্রামণ্য-ব্রত প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন। অনাথপিণ্ডদ বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তি-বশতঃ জেতবন নামক উদ্যান তাঁহাকে অর্পণ করেন। তাহার পর, রাজগৃহ নগরের শ্রেষ্ঠি-পুত্র উগ্রসেনকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। তথাগত গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া বৈশালী নগরীর মহাবন বিহারে গমন করিয়া শুনেন, শাক্য ও কোলীয়গণ উভয়ের রাজ্যের সীমান্তস্থিত কোন নদীর জল লইয়া বিবাদ করিতেছে। পুনরায় কপিলবাস্তুতে উপস্থিত হইয়া তিনি উক্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। এই সময় তথাগত বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিছুকাল পরে তিনি শুনিতে পান, তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদন উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত। বোধিসত্ত্ব পিতৃদর্শন মানসে পুনরায় কপিলবাস্তুতে উপস্থিত হইবার পর তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন ৯৭ বর্ষ বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি পিতার মৃতদেহ ভস্মীভূত ও জ্ঞাতিগণকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় মহাবনে প্রত্যাগত হন। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ব্রাহ্মণগণ বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাঁহারা চিঞ্চানাম্নী কোন রমণীর সাহায্যে বোধিসত্ত্বের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু যখন ঐ ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন সহস্র সহস্র লোক আসিয়া তথাগতের

শরণাপন্ন হইল। ইহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য শত গুণে বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর, বোধিসত্ত্ব শংশুমার পর্ব্বতে গিয়া বর্ষা যাপন করেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার শিষ্য নকুল ও মৌদ্গলির পিতা মাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কৌশাম্বী নগরীতে ফিরিয়া আসেন। কৌশাম্বীতে অবস্থান কালে মৌদ্গলি বোধিসত্ত্বের বিরোধী হইয়া সংঘের মধ্যে ভেদ উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু বোধিসত্ত্ব উক্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন। ইহার পর, তিনি শ্রাবস্তীতে কিছু কাল বাস করিয়া মগধে উপস্থিত হন। ঐ সময় ভারদ্বাজ নামক এক ধনশালী ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন। ভারদ্বাজ রাজগৃহ-সন্নিহিত কোন গ্রামবাসী। তিনি একদিন কৃষিমহোৎসব করিতেছিলেন, এমন সময় বোধিসত্ত্ব ভিক্ষাপাত্র হস্তে তথায় উপস্থিত হন। অনেকে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণিপাত করিল কিন্তু ভারদ্বাজ ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন ;—"ওহে শ্রমণ! আমি কর্ষক, বীজ বপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তুমিও বীজ বপন কর, অনায়াসে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পরিবে।" বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন ;—"ওহে ব্রাহ্মণ! আমিও কৃষিকার্য্য করি, আমিও বীজ বপন করিয়া আহার সংগ্রহ করি।" ভারদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"তুমি যদি কৃষক তবে তোমার বলীবর্দ্দ বীজ লাঙ্গল প্রভৃতি কিছুই দেখিতেছি না কেন?" তথাগত উত্তর করিলেন ;—"শ্রদ্ধাই আমার বীজ, আমি উহা সর্ব্বত্র বপন করি। প্রজ্ঞা আমার লাঙ্গল এবং বীর্য্যই আমার বলীবর্দ্দ। আমি লাঙ্গল সঞ্চালন করিয়া অজ্ঞান কণ্টক দূর করি। আমার কৃষি দ্বারা যে শস্য লব্ধ হয়, উহার নাম অমৃতফল বা নির্ব্বাণ।" বলা বাহুল্য ভারদ্বাজের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়া তদুপদিষ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন।

তাঁহার পর, বোধিসত্ত্ব লঙ্কায় (সিংহলে) গমন করেন। সেখানে

বহু লোক তাঁহার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি পরে আরও দুই বার ধর্ম্ম প্রচারার্থ লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। কিছুকাল গত হইলে বোধিসত্ত্বের খুল্লতাত দ্রোণোদন ও অমৃতোদনের পুত্র অনিরুদ্ধ ও আনন্দ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অনুরুদ্ধের ভদ্রীয় নামে এক বন্ধু ছিলেন, তিনিও তাঁহার অনুসরণ করেন। কিয়ৎ কাল পরে যশোধরার ভ্রাতা বোধিসত্ত্বের শ্যালক দেবদত্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিন তথাগত মল্লগণের অনুপিয়া গ্রামে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় রাজা শুদ্ধোদনের নাপিত উপালি আসিয়া দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করে। বোধিসত্ত্ব কৃপা করিয়া তাহাকে স্বীয় সম্প্রদায়-মধ্যে স্থান দান করেন। এই সময় বোধিসত্ত্ব একদিন ভিক্ষুমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলেন ;—"ওহে ভিক্ষুগণ! আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৫৫ বৎসর, যদিও আমার দেহের কোন প্রকার ক্ষয় আরম্ভ হয় নাই, তথাপি আমার একজন উপস্থায়কের (attendant) প্রয়োজন। পরিচারকের অভাবে আমার অসুবিধা ঘটিতেছে।" সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি অনেকেই উপস্থায়ক হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে মনোনীত না করিয়া আনন্দকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। আনন্দ আটটি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে, তথাগত মগধ রাজ্যের নালন্দা নগরে গমন করেন। সেখানে দীর্ঘতাপস নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার ঘোরতর তর্ক হয়। ব্রাহ্মণ তাঁহার অধ্যাপক নির্গ্রন্থনাথের মঠে আসিয়া সমুদয় নিবেদন করেন। নির্গ্রন্থনাথের উপালি নামক এক ধনী শিষ্য সেখানে বসিয়াছিল, সে বোধিসত্ত্বের প্রভাব অবগত হইয়া অচিরে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিল। রাজগৃহ নগরের জীবক নামক কোন ব্যক্তি পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার না পাইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বেতন দানে অশক্ত হইয়া তত্রত্য আত্রেয়

নামক এক জন অধ্যাপকের পরিচারকের কার্য্য করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। জীবক চিকিৎসা বিদ্যায় অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলা হইতে যখন মগধে ফিরিয়া আসেন, সেই সময় সাকেত নগরীতে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। পুষ্পের ঘ্রাণ লওয়াইয়া তত্রত্য কোন ধনি-কন্যাকে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করায় তাঁহার অত্যন্ত খ্যাতি লাভ হয়। জীবক রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারকেও কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বারাণসী ও উজ্জয়িনীর রাজার নিয়মিত চিকিৎসক ছিলেন। কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্ব রোগাক্রান্ত হন। জীবক আশ্চর্য্য কৌশলে বোধিসত্ত্বকে ব্যাধি-মুক্ত করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। জীবক বোধিসত্ত্বের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। প্রত্যহ তিন বার তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন এই আশয়ে স্বীয় উদ্যান মধ্যে বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া উহা বোধিসত্ত্বকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তাহার পর, কোশলের রাজা মহাকোশল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যশোধরার ভ্রাতা বোধিসত্ত্বের শ্যালক দেবদত্ত কিছু কাল পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজগৃহ নগরে অবস্থানকালে তিনি এক দিন বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলেন;— "মহাশয়! রাজার অধীনে যুবরাজ থাকে, আপনি ধর্ম্মরাজ, সুতরাং আপনার অধীনেও ধর্ম্মের যুবরাজ থাকা প্রয়োজন। আমি উক্ত পদের প্রার্থী। অতএব আমাকে যুবরাজ-পদে নিযুক্ত করুন।" ঐ কথা শুনিয়া তথাগত উত্তর করেন, "সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন পরমজ্ঞানী ও আমার প্রিয়শিষ্য। তাঁহারা জীবিত থাকিতে আমি কোন বিশেষ কার্য্যের ভার অন্যের উপর অর্পণ করিতে পারিব না।" ঐ কথা শুনিয়া দেবদত্ত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং পাঁচশত শিষ্য সহ রাজগৃহের তদানীন্তন রাজা অজাতশত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বোধিসত্ত্বের প্রাণ সংহারের

চেষ্টা করেন কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শেষে তিনি সমগ্র শিষ্য সহ সমাগত হইয়া পুনরায় বোধিসত্ত্বের শরণাগত হন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এই ঘটনার পরই সুরাপরান্ত প্রদেশের দুইটি ধনী বণিক্ বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বণিক্ ভ্রাতৃদ্বয় স্বদেশে প্রতিগমনকালে বোধিসত্ত্বের প্রশ্নের উত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহারা স্বদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

এক সময় বোধিসত্ত্ব কপিলবাস্তুর ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা শুদ্ধোদনের অন্যতমা মহিষী মহাপ্রজাবতী গোতমী তাঁহার নিকটে গিয়া বলেন;—"ভগবন্ আপনি রমণীগণকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন এবং সংসারত্যাগিনী মহিলামণ্ডলী দ্বারা ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করুন।" উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলেন;—"গোতমি! আপনি আর এরূপ প্রস্তাব করিবেন না।" এই কথা বলিয়া তিনি কপিলবাস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বৈশালীর মহাবন বিহারে প্রস্থান করেন। গোতমী ও সহজে স্বীয় বাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি কেশ ছেদনপূর্ব্বক কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া শাক্যবংশীয় বহুরমণী সহ বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন। গোতমীকে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণের জন্য একান্ত অভিলাষিণী দেখিয়া আনন্দ বোধিসত্ত্বের সমীপে গিয়া বলিলেন;—"ভগবন্ যদি রমণীদিগকে সন্ন্যাসিনী করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রভূত মঙ্গল হইবে।" তখন বোধিসত্ত্ব আনন্দকে বলিলেন;—"আনন্দ! তুমি আর এরূপ প্রস্তাব করিও না।" তখন আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ভগবন্ ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ করিলে স্ত্রীজাতির কোন উপকার হয় কি না, রমণীগণ অর্হৎপদ পাইবার যোগ্য কি না?" উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন;—"ধর্ম্মালাপ

শ্রবণ করিলে রমণীগণের অবশ্যই উপকার হয় এবং রমণীগণও সদ্গতি লাভের অনধিকারিণী নহেন।" তখন আনন্দ বলিলেন;—"ভগবন্ যদি তাহাই হয়, তবে, গোতমীকে আপনি উপকার করিতেছেন না কেন? আপনার জননীর স্বর্গলাভ হইলে গোতমী আপনার লালন পালন করিয়া মহোপকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রত্যুপকার করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য।" বোধিসত্ত্ব প্রত্যুত্তরে বলিলেন;—"ওহে আনন্দ! গোতমী যদি সাধারণ নিয়ম ব্যতীত আর আটটি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিব।" তাহার পর, তিনি আনন্দের নিকট ঐ সকল নিয়মের কথা বিবৃত করিলেন। গোতমী আনন্দের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—"কোন তরুণবয়স্কা রমণী স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান-পূর্ব্বক যেমন মস্তকে পুষ্পমালা ধারণ করে, তেমনি আমি ও আটটি নিয়ম অতি আহ্লাদ সহকারে শিরোধার্য্য করিলাম।" তাহার পর, আনন্দ বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া সমুদয় নিবেদন করিলে তিনি গোতমীকে উপসম্পদা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। আনন্দ তৎক্ষণাৎ গোতমীকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্ষণকাল পরে বোধিসত্ত্ব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"ওহে আনন্দ! যদি রমণীদিগকে গৃহত্যাগিনী করিয়া ভিক্ষুণীব্রতে দীক্ষিত করা না হইত, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম বহুকাল জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত কিন্তু যখন রমণীদিগকে সন্ন্যাসিনী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সুতরাং আমার ধর্ম্ম পাঁচশত বৎসরের অধিক পবিত্রভাবে থাকিবে না। যাহাতে রমণীগণের সন্ন্যাস অবলম্বনে ও আমার ধর্ম্ম দূষিত না হয়, তজ্জন্য আমি কেবল রমণীগণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত আটটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছি।" তদনন্তর গোতমী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া অবনতমস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ভগবন্ আমার সঙ্গে শাক্যবংশীয় যে সকল রমণী আগমন

করিয়াছেন, তাঁহাদের কি উপায় হইবে?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমি ভিক্ষুগণকে অনুমতি দিতেছি তাঁহারা রমণীগণকে উপসম্পদা প্রদান করিয়া ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করুন।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কিছুকাল পরে কপিলবাস্তু নগরে উপনীত হন। রাহুলকে যখন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তাহার পূর্ব্বেই তদীয় পত্নী যশোধরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত অভিলাষিণী হইয়াছিলেন কিন্তু রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে রাখেন। এখন গোতমী ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া যশোধরা গৃহবাসের বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি অচিরে বৈশালীতে গমন পূর্ব্বক গোতমীর সঙ্গে করিয়া শ্রাবস্তী নগরীতে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হন। সেখানে স্বয়ং বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে উপসম্পদা প্রদান করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই বিম্বিসারের প্রথমা মহিষী ক্ষেমা বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করেন। শ্রাবস্তী নগরীতে কোন ধনবান্ গৃহপতির উৎপলবর্ণা নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সেই কন্যার, রূপ লাবণ্যের সীমা ছিল না। ঐ রূপবতী কুমারী বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে অনেক রাজা ও ধনী তাঁহার কর গ্রহণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। গৃহপতি ভাবিলেন, 'এই অনুপমা লাবণ্যবতী কন্যা যাহাকে প্রদান করিব, অন্যেরা তাহার পরম শত্রু হইবে। অতএব ইহার বিবাহ না দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করাই শ্রেয়ঃ।' তাহার পর উৎপলবর্ণাকে অচিরে সন্ন্যাসিনী করা হইল। তিনি তপস্যা প্রভাবে অর্হৎপদ লাভ করিয়া শেষে বৌদ্ধভিক্ষুণীসমাজে বিশেষ পূজনীয়া হইয়াছিলেন। কিসা গোতমী শ্রাবস্তী নগরীর কোন ঐশ্বর্য্যশালীর বনিতা। যৌবনের প্রথমেই ইঁহার একটি পুত্র হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গোতমী পুত্রকে পুনর্জীবিত করিবার আশায় নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অবশেষে উন্মাদিনীর ন্যায় গিয়া বোধিসত্ত্বের

শরণাগত হন। তাঁহার উপদেশের প্রভাবে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন। ইনিও বৌদ্ধরমণী সমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। বিশাখা অঙ্গরাজ্যের ভদ্রীয়নগরের শ্রেষ্ঠিবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ মেণ্ডক ও পিতা ধনঞ্জয় উভয়েই যথাক্রমে অঙ্গরাজের কোষাধ্যক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিশাখার বয়স যখন সাত বৎসর, সেই সময় তিনি পাঁচ শত সহচরী সহ বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালে ঐরূপ অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রাবস্তীরাজের কোষাধ্যক্ষের পুত্র পুণ্যবর্দ্ধনের সহিত বিশাখার বিবাহ হয়। বিশাখা বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অশেষ উপকার সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। বিশাখা ভিক্ষুদিগকে নিরন্তর অন্ন বস্ত্র দান করিতেন এবং তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য শ্রাবস্তীর পূর্ব্বদিকস্থ একটি রমণীয় উদ্যান বোধিসত্ত্ব-প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে অর্পণ করিয়াছিলেন। উহার নাম পূর্ব্বারাম। এতদ্ভিন্ন বোধিসত্ত্বের জীবৎকালে যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এরূপ অসংখ্য মহিলার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের জীবন অত্যন্ত পবিত্র ও সৎকর্ম্মময় ছিল। ঐ সকল মহিলার অধিকাংশ বিদুষী ও অধ্যবসায়সম্পন্না ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের নারীজাতির জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ঐ সময় ভারতমহিলাদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের অপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল।

বুদ্ধের জীবন যেমন পবিত্র, তাঁহার আত্মসংযম এবং সহিষ্ণুতা ও তেমনি অসাধারণ ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়গণকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন যে, সকল অবস্থাতেই আপনাকে সুখী মনে করিয়া প্রসন্ন থাকিতেন। একদা অতিপ্রত্যূষে বোধিসত্ত্ব শ্রাবস্তীনগরীতে কোন পর্ণাবৃত

শিংশপা-বনে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় হস্তক নামক এক জন ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"ভগবন্ আপনি রজনীতে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন ?" ভগবান্ উত্তর করিলেন ;—"হে বৎস ! আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, সংসারে যে সকল লোক সুখে নিদ্রা লাভ করে, আমি তাহাদের অন্যতম।" হস্তক বলিলেন ;—"ভগবন্ এখন শীতকাল, রাত্রিতে হিমপাত হইয়া থাকে, অবিরত শীতল বাতাস প্রবাহিত হইতেছে; আপনি যে ভূমিতে শয়ান ছিলেন, উহা বন্ধুর এবং গোরুর খুরের দ্বারা আহত, বিরল নিবিষ্ট পত্রসমূহে আপনার শয্যা বিরচিত হইয়াছিল, আপনার পরিধেয় কাষায়-রঞ্জিত, অথচ আপনি বলিতেছেন, "যে সকল লোক সুখে নিদ্রা লাভ করে, আপনি তাহাদের অন্যতম। অতএব আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন ;—"বৎস ! মনে কর, কোন গৃহপতির গৃহ চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত ; উহাতে শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহার অভ্যন্তরে সুন্দর পর্য্যঙ্ক সংস্থাপিত, পর্য্যঙ্কের উপর কোমল শয্যা, তাহার উপর মসৃণ উত্তরচ্ছদ, শয্যার চতুর্দ্দিকে লোহিত বস্ত্রে আবৃত উপাধান বিদ্যমান। গৃহে তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। উক্ত গৃহপতি সেই মনোহর শয্যায় শয়ান আছেন। আর তাঁহার কায়িক বাচিক মানসিক কোন পরিদাহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি কামক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন কি না ?" হস্তক উত্তর করিলেন "ভগবন্ সেই গৃহপতি কামক্রোধাদি দ্বারা দহ্যমান হইয়া কখনই সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না।" ভগবান্ বলিলেন, "বৎস ! যে কামক্রোধাদি নিদ্রার অন্তরায়, আমি তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়াছি। আমার রাগ দ্বেষ মোহ সম্পূর্ণ উন্মূলিত হইয়াছে। অতএব আমার অসুখের কিছুমাত্র কারণ নাই। বৎস ! তজ্জন্যই বলিয়াছি শীতরাত্রে বন্ধুর ভূমিতে পর্ণাবৃত শয্যায়, অনাবৃত

দেহে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।” তাহার পর, তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—“ওহে ভিক্ষুগণ! লোকে কায়িক বাচিক ও মানসিক দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইহকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না এবং পরকালে নিরয়গামী হয়।”

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ স্বোদ্ভাবিত ধর্ম্ম উচ্চশ্রেণীর মানব-মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকে উহার দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হয় নাই। বোধিসত্ত্ব সেরূপ করেন নাই, তাঁহার ধর্ম্ম আপামর সাধারণ সকলের মধ্যে সমভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভিনব আলোক প্রাপ্ত হইয়া কত পশুবৎ মানবসম্প্রদায় জ্ঞানবিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া উচ্চশ্রেণীর মানব-পদবীতে উন্নীত হইয়াছিল। তিনি জ্ঞানী ব্রাহ্মণ হইতে অজ্ঞান ব্যাধ পর্য্যন্ত সকলকেই নিজ রোপিত ধর্ম্ম-তরুর সুরস ফলের রসাস্বাদনে অধিকারী করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকে অনায়াসে তাঁহার ধর্ম্মমত বুঝিতে পারে, তজ্জন্য সহজ ভাষায় অতি সুন্দর প্রণালীতে উপদেশ প্রদান করিতেন। অনেক সময় তিনি এক কথা দুইবার অথবা ততোঽধিক বার বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কখন কখন সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়া জটিল দার্শনিক মত উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার উপমা বড় সুন্দর ছিল। তিনি সহজ উপমার সাহায্যে জটিল ও সূক্ষ্মতম বিষয় সকল বিশদরূপে ব্যক্ত করিতেন। বুদ্ধের উপদেশ সকল সূত্রপিটকে পালিভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

এক সময়ে ভগবান্ বুদ্ধদেব সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবকের রাজগৃহ-নগরস্থ মনোহর আম্রবাটিকায় সাড়ে বারশত শিষ্যের সহিত বাস করিতে ছিলেন। ঐ সময় একদিন মগধাধিপ রাজা অজাতশত্রু স্বীয় প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত নৈশ গগনের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন। তখন শরৎকাল, প্রসন্ন অম্বরে পূর্ণশশধর সুন্দর

শীতরশ্মি বিকীরণ করিতেছিলেন। রাজা বিমুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"বন্ধুগণ! এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী কি সুন্দর! কি প্রিয়দর্শন! কি সান্ত্বনাদায়িনী! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কি মহৎ চিহ্ন! এমন কোন শ্রমন অথবা ব্রাহ্মণ আছেন কি, আজি এই জ্যোৎস্নাশীতল যামিনীতে যাঁহার নিকট গেলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিব?" মন্ত্রিবর্গের মধ্যে কেহ পুরাণ-কাশ্যপের নাম করিলেন, কেহ মস্করিপুত্র গোশালের নাম করিলেন, কেহ অজিতকেশকম্বলের নাম করিলেন, কেহ ককুদকাত্যায়নের নাম করিলেন, কেহ বা নিগ্রন্থ-জ্ঞাতিপুত্রের নাম করিলেন, কিন্তু রাজা কোন কথাই বলিলেন না, নীরব হইয়া রহিলেন। ঐ সময়ে ভিষক্‌বর জীবক মহারাজ অজাতশত্রুর অনতিদূরে নীরবে বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—"সুহৃদ্বর জীবক! আপনি ত কাহারই নাম করিলেন না?" জীবক বলিলেন ;—"আমার আম্রোদ্যানে ভগবান্ বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছেন, তিনি জ্ঞান ও পবিত্রতার আধার, মুমুক্ষুবৃন্দের একমাত্র পথপ্রদর্শক, মহারাজ তাঁহার নিকট চলুন, শান্তি পাইবেন।" তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশে পাঁচশত বৃহৎকায় হস্তী সুসজ্জিত হইল। পাঁচশত সুন্দরী মহিলা বিবিধ বেশ ভূষায় শোভিত হইয়া আলোকবর্ত্তি হস্তে হস্তি-পৃষ্ঠে রাজাকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন। বিশাল আম্রোদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজা সহসা ভয়াভিভূত হইলেন। তিনি জীবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"জীবক! তুমি কি ছলনা করিয়া আমাকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য এখানে আনিয়াছ? যেখানে সাড়ে বারশত শিষ্য ও সহস্র সহস্র শ্রোতা বিদ্যমান, সেই স্থান হইতে একটি হাঁচি কিংবা কাশীর শব্দ শুনা যাইতেছে না?" জীবক উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি ছলনা করিয়া আপনাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিতে আনি নাই, আমি তদ্রূপ পাষণ্ড নহি। ঐ পটমণ্ডপে

দীপ জ্বলিতেছে, ঐ দিকে চলুন। ঐ দেখুন মধ্যস্থ স্তম্ভের সম্মুখে পূর্ব্বমুখ হইয়া শিষ্য-পরিবৃত ভগবান্ বোধিসত্ত্ব উপবিষ্ট আছেন।” রাজা হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার সেই নিঃশব্দ জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উর্ম্মিহীন বিশাল হ্রদের ন্যায় শিষ্যমণ্ডলী নীরব ও প্রশান্ত। রাজা উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিলেন, “কি সুন্দর! কি প্রশান্ত! আমার প্রাণাধিক পুত্র উদায়িভদ্রের জীবন যেন এইরূপ শান্তিপূর্ণ হয়।” তাহার পর, তিনি ভগবান্ বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ রাজাকে প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ অনুজ্ঞা করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন;—“ভগবান্ এ সংসারে মন্ত্রী অমাত্য পুরোহিত জ্যোতির্ব্বিদ্ সেনাপতি সৈনিক পাচক নাপিত মোদক মালাকার কুম্ভকার তন্তুবায় প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক আছে। ইহারা স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহ জীবনেই স্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিতেছে। তাহারা শ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা বন্ধু বান্ধব প্রতিপালন এবং দান ধ্যান ইত্যাদি করিয়া সুখে সময় যাপন করিতেছে। অতএব গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মের পুরস্কার ইহ জীবনেই লক্ষিত হইতেছে কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের এরূপ কোন পুরস্কার দেখাইতে পারেন কি, যাহার ফল ইহ জীবনেই লাভ করা যায়?” তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন;— “আপনি এই প্রশ্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণ কিংবা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?” রাজা বলিলেন “হাঁ আমি পুরাণকাশ্যপ প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।”

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব বলিলেন;—“আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। মহারাজ! আপনার দাসগণ

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া সমস্ত দিন প্রাণপনে পরিশ্রম করিয়া আপনার সেবা করে। তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করে, আপনি সমস্ত সুখ সম্ভোগ করেন। উহাদের মধ্যে যদি কেহ মনে করে, অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? তাহার পর, যদি সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষুর বৃত্তি অবলম্বন করে, ক্রমে যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয় এবং আপনি শুনিতে পান যে, আপনার ভৃত্যগণের মধ্যে একজন সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য আহারে সন্তুষ্ট হইয়া নির্জ্জনে ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করিতেছে, তাহা হইলে আপনি কি তাহাকে পুনরায় দাসত্বে নিযুক্ত হইতে বাধ্য করেন?" রাজা বলিলেন "কখন না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আসন ত্যাগ করিয়া সম্মান দেখাইব এবং তাহার শুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।" তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ! তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে সন্ন্যাসধর্ম্মের কিছু ফল ইহ জীবনেই লাভ করা যাইতে পারে। ইহা অতিসামান্য ফল, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফলের বিষয় শুনুন। পৃথিবীতে এরূপ কোন প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ হইতে পারে, যিনি কামনা-শূন্য বিগতস্পৃহ ইন্দ্রিয়বিজয়ী, লোভমোহাদি ক্রীড়নকের ন্যায় যাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে পারে না, যাঁহাকে দর্শনমাত্র অন্ধ গৃহস্থগণের মায়া পাশ কাটিয়া যায়। শৃঙ্খলিত পক্ষী উড্ডীয়মান পক্ষী দর্শনে যেমন তাহার স্বীয় স্বাধীনতা স্মরণ করে, বিড়ম্বিত গৃহস্থগণ ও ঐ রূপ মুক্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উৎকৃষ্টতর জীবন ও মোক্ষার্থী হইতে চেষ্টা করে। ভিক্ষু আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া যখন কামনা হইতে মুক্তি লাভ করেন, তখন রোগমুক্ত কারামুক্ত অথবা মরুভূমি উত্তীর্ণ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত হয়। আত্মসংযমের ফলে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, উহা সম্পূর্ণরূপ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, পাপ উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। চিত্ত প্রশান্ত হইলে জন্ম

জন্মান্তরের কথা স্মৃতি পথে উদিত হয়। মুক্ত সন্ন্যাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হয়। তিনি বস্তু ও জীবের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। এই জ্ঞানই সন্ন্যাস জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, এই জ্ঞানের তুল্য উৎকৃষ্ট ফল মনুষ্য জীবনে আর কিছু লব্ধ হইতে পারে না।"

বোধিসত্ত্ব যখন এই রূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, তখন অজাতশত্রু কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "পরমাবাধ্য দেব! পতিত দ্রব্যকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলে, লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশিত করিলে, তিমিরাবৃত স্থানে আলোক জ্বালিলে অথবা পথহারা বিপন্ন পথিককে পথ দেখাইয়া দিলে যেরূপ হয়, ভগবন্ আপনি ও সেই রূপ নানা বিচিত্র উপমা দ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হে দেব! আমি অপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি মহাপাপী, আমার হৃদয় মালিন্যে পরিপূর্ণ, রাজ্য লাভের আশায় দেবতুল্য উদারচরিত পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া এই নরাধমকে আশ্রয়দান করুন, নচেৎ উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।" ভগবান্ বলিলেন;—"মহারাজ! আপনি যখন পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, আত্মগ্লানিতে দহ্যমান হইতেছেন, তখনই আপনার পাপভার লঘু হইয়াছে, ক্রমে আপনার হৃদয় সম্পূর্ণ নির্ম্মল এবং পবিত্র হইবে। আর পাপ আপনাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।" অজাতশত্রু সেই জ্যোৎস্নাশীতল রমণীয় নিশীথে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়া মহোপকার লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি ন্যায়পরায়ণ পরম পুণ্যবান্ ভূপতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব অশীতিবর্ষবয়সে খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার নির্ব্বাণ লাভের দুই বর্ষ পূর্ব্বে যশোধরা গতাসু হন। তিনি শেষজীবনে রাজগৃহ পাটলিগ্রাম কোটিগ্রাম বৈশালী ভণ্ডগ্রাম হস্তিগ্রাম তাম্রগ্রাম জম্বুগ্রাম ভোগনগর পাবা কুশী-

নগর প্রভৃতি স্থানে সমবেত অসংখ্য ভিক্ষুর নিকট বৌধর্ম্মের সারমর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। তিনি শোণগঙ্গার সঙ্গমস্থলে পাটলিগ্রাম সন্দর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন, "এই শস্যশালী রমণীয় গ্রাম কালে মহানগরে পরিণত হইবে।" তাঁহার ভবিষ্যবাণী সফল হইয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম কালে পাটলিপুত্র নগরে পরিণত হইয়াছিল। যে দিবস বোধিসত্ত্বের পরিনির্ব্বাণ লাভ হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবস তিনি পাবা নামক স্থানে চুন্দ নামক এক কর্ম্মকারের আম্রবনে বিহার করেন। চুন্দ বুদ্ধের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করে;—"ভগবন্ আগামী কল্য ভিক্ষুসংঘ সহ আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" বুদ্ধ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুন্দ স্বয়ং যেরূপ আহার্য্য আহার করিত, ভগবান্ বোধিসত্ত্ব ও ভিক্ষুসংঘের নিমিত্ত তদনুরূপ বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিল। তন্মধ্যে দুষ্পাচ্য একটি নিষিদ্ধ আহার্য্য ছিল। বুদ্ধ ভোজনে বসিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যান্য ভিক্ষুকে ঐ কদর্য্য দ্রব্য পরিবেশন করিতে বারণ করিয়া চুন্দের অপ্রসন্নতা দূর করিবার জন্য স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট ভোজ্যগুলি গর্ত্ত মধ্যে প্রোথিত করিতে আদেশ করা হইল। ভোজনের অব্যবহিত পরেই তাঁহার লোহিত-প্রস্কন্দিকা (রক্তামাশয়) জন্মিল। তিনি সেই অবস্থায়ই কুশীনগর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি আনন্দকে বলিবেন;—"আনন্দ! আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, তুমি একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত্ত করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর।" আনন্দ তাহাই করিলেন। তাহার পর, বোধিসত্ত্ব কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। পুক্কস নামক এক ব্যক্তি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত হয়। সে আড়ারকালামের শিষ্য। পুক্কস বুদ্ধের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পুক্কস তথাগতকে এক

খানি সুবর্ণবর্ণ বস্ত্র প্রদান করিল। আনন্দ ঐ বস্ত্রের দ্বারা বোধিসত্ত্বের দেহ আবৃত করিয়া দিলেন। তাহার পর, ভিক্ষুসংঘ সহ তিনি ককুৎথা নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া কিছু ক্ষণের জন্য আম্রবনে আবাস গ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি আনন্দকে একান্তে ডাকিয়া বলেন, "আনন্দ। চুন্দের মনে যদি কোন প্রকার পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি উহা দূর করিতে চেষ্টা কর। তাহার গৃহে ভোজন করিয়া আমার প্রবল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া সে যেন দুঃখিত না হয়। তুমি তাহাকে বলিও সে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করাইয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার ফলে তাহার সদ্গতি লাভ হইবে। দানশীল ব্যক্তির পুণ্য প্রবর্দ্ধিত হয়, সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জ্জন করিতে পারে, রাগদ্বেষ মোহের ক্ষয়ে মুক্তি লাভ হয়।"

অনন্তর তিনি হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া কুশীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উত্তরশীর্ষ হইয়া এক মঞ্চের উপর শয়ন করিলেন। এবং আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"হে আনন্দ! চারিটি স্থান শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করা উচিত; যেখানে তথাগত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, যেখানে তিনি প্রথমে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং যেখানে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।" আনন্দ ভিক্ষুসংঘের সহিত ঐ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। তাহার পর, তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধকে কিছু জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ঐ বিষয়ে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। আনন্দ বোধিসত্ত্বকে বলিলেন;—"ভগবন্ কুশীনগর একটি জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্রনগর, এখানে আপনি পরিনির্বৃত হইবেন না। চম্পা রাজগৃহ শ্রাবস্তী সাকেত কৌশাম্বী বারাণসী প্রভৃতি অনেক সমৃদ্ধ মহানগর আছে। সেখানকার

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ ভগবানের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন, তাহারা ভগবানের শরীর পূজা করিবে। অতএব ভগবান্ শাখানগরে পরিনির্ব্বাণগত হইবেন না।” বুদ্ধ বলিলেন আনন্দ! তুমি এরূপ বলিও না। পুরাকালে সুদর্শন নামে চতুরন্তবিজয়ী এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, তিনি কুশীনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগর দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত, বহুজন-সমাকীর্ণ ও অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। অতএব ইহাকে সামান্য স্থান মনে করিও না। তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে এই স্থানে ভগবান্ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।” ঐ সংবাদ শ্রবণে কুশীনগরের মল্লগণ আসিয়া ভগবানের বন্দনা ও পূজা করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে, সুভদ্র নামক এক পরিব্রাজক কুশীনগরে আসিয়া শুনিলেন, “ভগবান্ ঐদিন রজনীর শেষযামে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।” তিনি বলিলেন, “আমি প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি বহুসহস্র বর্ষ পরে কদাচিৎ কখনও দৈবক্রমে বুদ্ধের জন্ম হয়। আজ ভগবান্ পরিনির্ব্বৃত হইবেন, অতএব আমার ধর্ম্ম বিষয়ে কয়েকটি সন্দেহ আছে, আমি উহা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিব।” আনন্দ বলিলেন “ভগবান্ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এখন উঁহাকে আপনি বিরক্ত করিবেন না।” বুদ্ধ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, “আনন্দ! তুমি সুভদ্রকে নিষেধ করিও না, উহাকে আমার সমীপে আসিতে দাও। তাহার পর, সুভদ্র বুদ্ধের সন্নিহিত হইয়া নিজের সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সমুদয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। সুভদ্র পরম আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের সম্মুখে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “হে আনন্দ! অতঃপর আমার ধর্ম্মই তোমাদের পরিচালক হইবে।” তাহার পর, তিনি প্রাচীন ও নব্য ভিক্ষুগণের পরস্পর ব্যবহার-সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়া সমস্ত ভিক্ষুমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,

"ওহে ভিক্ষুগণ! আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন বিষয়ে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ কিংবা মত ভেদ থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কর।" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আনন্দপ্রমুখ ভিক্ষুগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "ভগবন্ আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে আমাদের কাহারও কোন সন্দেহ কিংবা মতদ্বৈধ নাই।" ঐ কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"সংযোগোৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। আপনারা সাবধান হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিবেন, এই বুদ্ধের শেষ উপদেশ।" তাহার পর, বোধিসত্ত্ব রাত্রির প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যামে ধ্যান-নিমগ্ন রহিলেন। চতুর্থ যামে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আকাশ অসীম, জ্ঞান অনন্ত, জগৎ অকিঞ্চন, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা উভয়ই অলীক;—এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের লয় হওয়ায় বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

কুশীনগরের মল্লগণ আসিয়া গন্ধপুষ্প প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা বুদ্ধের শরীর পূজা করিল এবং সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত কবিয়া তাহাতে বুদ্ধের দেহ স্থাপন করিল। ঐ সময় মহাকাশ্যপ পাঁচশত ভিক্ষু সহ পাবা হইতে কুশীনগরে আগমন করিলেন। তিনি, তিন বার বুদ্ধের চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া অবনত মস্তকে বুদ্ধের পাদ বন্দনা করিলেন। অনন্তর, চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বুদ্ধের চর্ম্ম মাংস স্নায়ু সমস্তই দগ্ধ হইল, কেবল অস্থি অবশিষ্ট রহিল। ঐ সময় মগধরাজ অজাতশত্রু দূতের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন;—"ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, অতএব আমি ভগবানের শরীরাংশ গ্রহণ করিব এবং উহার উপর চৈত্য নির্ম্মাণ করিব।" বৈশালীর লিচ্ছবিগণ কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকল্পের বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, পাবার মল্লগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিয়া বুদ্ধের শরীরাংশ প্রার্থনা করিল। এতদ্ভিন্ন বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণও বুদ্ধের দেহাংশ গ্রহণের জন্য আগমন করিলেন। ঐ সময় কুশীনগরের

মল্লগণ আসিয়া বলিল ;—"ভগবান্ আমাদের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, অতএব আমরা ভগবানের শরীরাংশ কাহাকেও দিব না।" ঐ সময় দ্রোণনামক এক ব্রাহ্মণ বলিলেন ;—"ভগবান্ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন, অতএব তাঁহার শরীরাংশ লইয়া আর বিবাদ করা উচিত নহে, আপনারা সমবেত হন, আমি সপ্রণয়ে দেহাংশ অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া দিতেছি।" শেষে তাহাই হইল। যে কুম্ভে করিয়া শরীরাংশ ভাগ করা হইয়াছিল, দ্রোণ ব্রাহ্মণ সেই কুম্ভটি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে কুম্ভ প্রদত্ত হইল। অবশেষে পিপ্পলবনীয় মৌর্য্যগণ আসিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিয়া বুদ্ধের দেহাংশ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তখন ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে অঙ্গারমাত্র লইয়া ফিরিতে হইল। এই রূপে আটটি শরীর স্তূপ একটি কুম্ভস্তূপ ও একটি অঙ্গারস্তূপ, সর্ব্বশুদ্ধ বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর দশটি স্তূপ নির্ম্মিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি অভিনিষ্ক্রমণ কালে যেখানে আভরণ উন্মোচন করেন, যেখান হইতে সারথি ছন্দক ফিরিয়া যায়, যেখানে তিনি চূড়া ছেদন করেন এবং যেখানে কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, সেই সকল স্থানে অতি বিশাল অভ্রস্পর্শী স্তূপ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন "বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষের লাভ কি ক্ষতি হইয়াছে ?" এ প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত সহজ নহে। তবে উহা দ্বারা বেদোক্ত ধর্ম্ম ও বেদোক্ত আচারের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এমন সময়ও হইয়াছিল, যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক বেদোক্ত আচার পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন অপর দিকে লাভও হইয়াছিল। যাহারা জ্ঞান ধর্ম্মে চিরবঞ্চিত ছিল, তাহারা বুদ্ধের প্রদত্ত নবশিক্ষা ও নব আলোক প্রাপ্ত হইয়া উচ্চবর্ণের লোকের ন্যায় অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। অনেক নিম্ন বর্ণের লোকও

ধর্ম্মপ্রচার, পান্থশালাস্থাপন, জলাশয়-খনন, রাজপথ-নির্ম্মাণ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য দ্বারা প্রাণিগণের বহু উপকার সাধন করিয়াছিল। আর যে ন্যায় ও বেদান্তদর্শন মানব-চিন্তার চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহাও বৌদ্ধ দার্শনিক মতের সহিত হিন্দু দার্শনিক মতের সংঘর্ষের ফল। দার্শনিক মূল সূত্র ব্যতীত অধিকাংশ দার্শনিক গ্রন্থই বৌদ্ধমত খণ্ডনার্থ বিরচিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত অভ্যুদয় হয়। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বভৌম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক মনীষিগণ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অতিদুর্গম পথে সিংহল, যবদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন, কোরিয়া, তিব্বত, কাশ্মীর, মিসর, গ্রীস্, রোম প্রভৃতি জনপদে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য অদ্যাপি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী।

প্রশ্ন।

নিম্ন লিখিত ঘটনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখ।

১। নচিকেতার তত্ত্বজ্ঞান লাভ।
২। রঘুর দিগ্‌বিজয়।
৩। দশরথের পুত্রস্নেহ।
৪। রামের বনবাস।
৫। সীতার অগ্নিপরীক্ষা।
৬। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃসেবা।
৭। মহাভারতের মূল ইতিবৃত্ত।
৮। শকুন্তলার গল্প।
৯। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বৃত্তান্ত।
১০। শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত।
১১। বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা রামানুজাচার্য্য।
১২। আলেক্‌জেণ্ডার্ দি গ্রেট্।
১৩। আলেক্‌জেণ্ডারের ভারত আক্রমণ।
১৪। গ্রীক্ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত ভারতবর্ষের বিবরণ।
১৫। মহম্মদ গজনীর ভারত আক্রমণ।
১৬। পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক মহম্মদ গজনীর পরাজয়।

১৭। বিজয়নগর রাজ্যের বিবরণ।
১৮। পাণিপথের তিনটি যুদ্ধ। (১৫২৬।১৫৫৬।১৭৬১।)
১৯। আকবরের জীবনবৃত্তান্ত।
২০। আকবরের রাজ্য-শাসন-প্রণালী।
২১। সাজাহানের উত্তরাধিকারিগণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য-বিস্তার ও তাহার ধ্বংসের বীজবপন।
২২। পিটার্ দি গ্রেট্। (১৬৮৯-১৭২৫)
২৩। শিবাজীচরিত।
২৪। মহারাষ্ট্রীয় শক্তি-বিস্তার।
২৫। ভাস্কো ডাগামাকর্ত্তৃক ভারত আগমনের পথ আবিষ্কার।
২৬। ভারতে পর্ত্তুগিজগণের রাজ্য-বিস্তার ও তাঁহাদের অবনতির কারণ।
২৭। ডেন্মার্কবাসীদিগের প্রতিষ্ঠিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি। (১৬০২—১৭৫৮)।
২৮। আর্কটে ক্লাইভ্।
২৯। পলাশীর যুদ্ধ।
৩০। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকাল।
৩১। হাইদার্ আলি।(১৭৮০-১৭৮৪)
৩২। বঙ্গদেশের দশশালা বন্দোবস্ত।
৩৩। দক্ষিণাপথে লর্ড ওয়েলেস্লির কার্য্যকলাপ।
৩৪। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরাজ-দিগের যুদ্ধ।
৩৫। ফ্রান্সিস্ বেকন্।
৩৬। জর্জষ্টিফেন্সন্।
৩৭। জর্জ ওয়াসিংটন্।
৩৮। কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার।
৩৯। জোয়ান্ অফ্ আর্ক।
৪০। মিলটন্।
৪১। সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্।
৪২। নিউটন্।
৪৩। গোল্ড্স্মিথ্।
৪৪। মেকলে।
৪৫। গুরু নানক।
৪৬। শিখযুদ্ধ।
৪৭। আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক দয়ানন্দ সরস্বতী।
৪৮। রাজা রামমোহন রায়।
৪৯। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৫০। রামকৃষ্ণ পরমহংস।

—০—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা-বিষয়ক রচনা।

(শিক্ষা)

শিক্ষা, শিক্ষার উপযোগিতা, বৈদিক যুগের ও বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা-প্রণালী, বোধিসত্ত্বের শিক্ষার বিশিষ্টতা, মুসলমান অধিকারে শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য, ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা, উক্ত শিক্ষায় সাংসারিক জ্ঞানের আধিক্য, পঠিত বিদ্যা কার্য্যে পরিণত করিবার অনাস্থা, শিক্ষিত পরার্থপর লোকের অভাব।

(১)

শিক্ষা মানব জীবনের প্রধান সম্বল। শিক্ষা ব্যতীত মানব মানব নামের যোগ্য হইতে পারে না। অশিক্ষিত মানবে ও পশুতে প্রভেদ নিতান্ত অল্প। দেবদর্শন মানবের শক্তিসাধ্য না হইলেও যে সকল গুণের জন্য দেবতা দেবতা নামে পরিকল্পিত, প্রকৃত শিক্ষিত মানবে উহার অধিকাংশ পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি মানসিকবৃত্তি লইয়া মানবকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়, শিক্ষা দ্বারা ঐ সকল বৃত্তি যথাযথ বিকসিত হইয়া তাহাকে প্রকৃত মানব-পদবীতে আরূঢ় করে। শিক্ষার উপায় অনন্ত। মানব প্রতিভা-বলে ঐ সকল উপায়ের অধিকাংশ আবিষ্কৃত করিয়া শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ মানব-সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহা-দের অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত স্বার্থের সম্বন্ধ বড় অধিক ছিল না। তাঁহারা কর্ত্তব্য বোধে অজ্ঞানান্ধ মানবসমাজকে জ্ঞানের আলোক দেখাইয়া পবিত্র পথে লইয়া যাইতেন। যখন, গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা

গোদাবরী সরস্বতী প্রভৃতি পুণ্যনদীর বিজন তীরে এবং হিমালয় বিন্ধ্য মাল্যবান্ প্রমুখ শৈলমালার রমণীয় নির্ঝরিণী-পার্শ্বে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময় গ্রাম ও নগর হইতে গৃহস্থ বটুগণ আসিয়া ঐ আশ্রমবাসী উপাধ্যায়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিত। উপদেষ্টা ঋষিগণ ধ্যান ধারণা এবং শাস্ত্র-চিন্তার পর অবশিষ্ট সময় অধ্যাপনায় ব্যয়িত করিতেন। দেশের নামে অথবা গোত্রের নামে বিদ্যার্থিগণ আহূত হইতেন। তাঁহারা গৃহ হইতে আগমন কালে কপর্দ্দক ও সঙ্গে আনিতেন না, ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যই তাঁহাদের জীবন রক্ষার উপায় ও গুরুর পরিচর্য্যাই একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল।

বিদ্যার্থীর ভিক্ষায় দৈন্য প্রকটিত হইত না। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য-পালন কালে উহা ব্যতীত উপায়ান্তর নির্দ্দিষ্ট ছিল না। গৃহী ঐ রূপ অধ্যয়নশীল ভিক্ষার্থীকে দেখিলে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ভিক্ষা অর্পণ করিতেন। যিনি আজ ভিক্ষাদাতা গৃহস্থ এক সময় তিনিও ভিক্ষানিরত ব্রহ্মচারী ছিলেন। যাহা সমাজের পরস্পর নিত্য কর্ত্তব্য, তাহাতে লজ্জা কিংবা বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইবে কেন? তাহার পর, গুরু-শুশ্রূষা। উহা যে অধ্যাপকের শুধু প্রত্যুপকার তাহা নহে; বিদ্যার্থী যদি শ্রমসাধ্য সমস্ত ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে শরীর সঞ্চালনের অভাবে তাঁহার দেহ অপুষ্ট ও শরীর দিন দিন কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারে। তজ্জন্য কুশপুষ্প আহরণ, কাষ্ঠসংগ্রহ, ধেনুরক্ষণ শস্যক্ষেত্রে জলসেচন প্রভৃতি ক্লেশসাধ্য কার্য্যে বিদ্যার্থীর নিয়োগ ব্যবস্থিত ছিল। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমের সামঞ্জস্য হেতু বিদ্যার্থিগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক বৃত্তিগুলি সমভাবে বিকসিত হইবার অবসর পাইত।

বিদ্যাদাতা ঋষিগণের অনেকে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহারা আমরণ অকৃতদার থাকিয়া ব্রহ্মচিন্তা ও শাস্ত্রাধ্যাপনায় জীবন যাপন

করিতেন। উপাধ্যায়দিগের মধ্যে গৃহীর সংখ্যা ও নিতান্ত অল্প ছিল না। তাঁহাদের পত্নী ও কন্যাগণই বিদ্যার্থীদের মাতা ও ভগিনীর স্থান অধিকার করিয়া সুমধুর স্নেহ বিতরণ করিতেন। প্রলোভনশূন্য শান্তিময় স্থানে নিয়ত অবস্থানে বিদ্যার্থীদের প্রতিভা বা মানসিক শক্তি বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে পারিত না। জ্ঞানই একমাত্র চিন্তার বিষয় হওয়াতে অধীত বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়া মনোবৃত্তিকে সুশোভিত করিত। এই রূপে ছত্রিশ বর্ষ আঠার বর্ষ বা নয় বর্ষ, যাহার যেরূপ শক্তি অধ্যয়ন করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। কেহ কেহ বা জ্ঞানের উপাসনায় চিরজীবন যাপনের নিমিত্ত বৈখানস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। যখন, বিদ্যার্থিগণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহাদের দেহ পরিপুষ্ট সবল, মনোবৃত্তি গর্ব্বহীন অচঞ্চল, অভিনব উদ্যমে হৃদয় পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহারা বিনয়ে আনত-বদন হইয়া গুরুজনের সমীপে উপনীত হইতেন। ধর্ম্ম ও সমাজের সেবায় মন প্রাণ সমর্পণ করিবার নিমিত্ত দার পরিগ্রহ করিতেন। সহধর্ম্মিণী ঐ উন্নত সাধনার সহকারিণী হইতেন। সংসারাশ্রমে থাকিয়া গৃহী জ্ঞানচর্চ্চা, ব্রহ্মোপাসনা, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি কিছুই বিস্মৃত হইতেন না, এমন কি ইতর পশু-পক্ষিগণও যথানিয়মে তাঁহাদের করুণা উপভোগ করিত।

ভগবান্ বোধিসত্ত্বের শিক্ষা ভারতীয় প্রাচীন প্রথাকে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। অনেকে বলেন, এই শিক্ষাপদ্ধতি পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি অপেক্ষাও কোন কোন অংশে উন্নত ছিল। প্রাচীন শিক্ষার স্রোত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নদী-পথেই প্রবাহিত হইত, উপনদী শাখানদী কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃ-প্রণালীতে একেবারেই প্রবেশ করিত না। কিন্তু শেষোক্ত শিক্ষা চিরান্ধকার বন্য-নির্ঝরিণীকে ও উপেক্ষা করে নাই, সর্ব্বত্র সমভাবে নির্ম্মল সলিল

প্রদান করিয়া প্রাচীন শিক্ষার কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছিল। আর প্রাচীন শিক্ষা একেবারে স্বার্থের গন্ধ পরিবর্জ্জিত ছিল না কিন্তু শোষোক্ত শিক্ষা একমাত্র পরার্থে জীবন উৎসর্গ কবিবার জন্যই প্রোৎসাহিত করিত। কালধর্ম্ম-প্রভাবে পৌরাণিক যুগে প্রণালীর কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলেও প্রাচীন আর্য্য ও বৌদ্ধ প্রথাই তাহার আদর্শ ছিল। মুসলমান অধিকার কালে রাজার সাহায্যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার তেমন কোন চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন সম্প্রদায় সেই প্রাচীন প্রথার আদর্শ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, অন্যেরা সুযোগ ও সামর্থ্য অনুসারে আরবী পার্সী প্রভৃতি রাজার ভাষা শিক্ষা করিয়া রাজকীয় কার্য্যের উপযুক্ততা লাভ করিত।

ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ হইতে অসভ্য বন্যজাতির পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার অভিনব আলোক প্রবিষ্ট হইয়া দিন দিন মানুষের মনোবৃত্তিকে নূতন ভাবে গঠিত করিতেছে। যদিও এই পাশ্চাত্য প্রথা এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব কিন্তু ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে কোন বিষয়ই উপেক্ষিত বা পরিত্যক্ত হয় নাই। সমস্ত ভূমণ্ডলের জ্ঞানরাশির সমুজ্জল আলোক সমাহৃত করিয়া ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ করা হইতেছে। পার্থিব সংসারে মানুষের যে যে বিষয়ের প্রয়োজন আছে, ইচ্ছা করিলে বিদ্যার্থী তাহার সমুদয় বিষয় শিক্ষা করিয়া সফলমনোরথ হইতে পারেন। প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর সহিত আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর তুলনা করিলে বুঝা যায়, প্রাচীন প্রণালীতে শিক্ষিত লোক অপেক্ষা আধুনিক প্রাণালীতে শিক্ষিত লোকের সাংসারিক জ্ঞান অধিক হয় এবং অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সহিত ধন-সঞ্চয় করিয়া প্রাচীন-শ্রেণীর লোকদের লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠে।

উল্লিখিত উপকারিতা সত্ত্বে ও বর্ত্তমান সময়ে নব্যপ্রণালীতে "যেরূপ

বিদ্যাগ্রহণের প্রথা দাঁড়াইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। লব্ধ জ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করাই শিক্ষার প্রধান ফল। কিন্তু আজ কাল সে চেষ্টা কদাচিৎ কখন ও দৃষ্ট হয়। এখন বৈজ্ঞানিক ব্যবহারাজীব, বিধি-শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের মীমাংসায় তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়, তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা করিবেন কখন? দার্শনিক চিকিৎসক, তিনি সর্ব্বদা রোগীর রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচনে ব্যাপৃত থাকেন, সুতরাং তাঁহার দর্শনিক চিন্তার অবসর কোথায়? অতএব বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপত্র সংগ্রহ করিয়া লাভ কি? বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরই যদি অধীত বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, উক্ত বিদ্যা-সংক্রান্ত কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিবার সঙ্কল্প না থাকে, তবে ঐরূপ কঠোর সাধনার ফল কি হইল? বিদ্যার্থী মাত্রেরই অধীত বিদ্যা কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অধীত বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অধীত নীতি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। প্রাচীন কালের অল্পবিদ্য ও বিদ্যাহীন ব্যক্তিদের স্বার্থত্যাগের যে সকল উদাহরণ শ্রবণ করা যায়, আজ কাল কৃতবিদ্যদের জীবনে তাহার সহস্রাংশের একাংশ ও দৃষ্ট হয় না। অবশ্য বিদ্যালয়ে অনেক নীতিকথা এবং অনেক মহাজনের জীবন-বৃত্তান্ত পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে, কিন্তু পাঠার্থিগণ কদাচিৎ ঐ সকল নীতি স্বীয় জীবনে অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন। কিঞ্চিদূন এক শতাব্দী হইল, নূতন প্রণালীতে শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম, পরদুঃখকাতর জীমূতবাহন কিংবা লোকশিক্ষক বোধিসত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের ও আবির্ভাব হইল না।

———○———

বাসভবন।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকার বাসগৃহ, গৃহোপকরণ, দৃশ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগিতা এবং য়ুরোপীয়দের বাসগৃহের বিভিন্নতা ও উৎকর্ষ, রাজা ও ধনীর বাসভবন, বাসভবন সম্বন্ধে গৃহীমাত্রের কর্ত্তব্য।

(২)

ভারতবর্ষে বিবিধ অবস্থাপন্ন নানাশ্রেণীর লোক বাস করে। ধন-সম্পদ্ শিক্ষা ও সংস্কার অনুসারে তাহাদের বাসগৃহও বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। কৃষক ভারতীয় জনসমাজের ভিত্তিস্বরূপ; সুতরাং আমরা প্রথমে কৃষকের বাসভবনের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অধিকাংশ কৃষক নগর ও শাখানগর হইতে দূরে প্রান্তরে কিংবা নদীর চড়ে বাস করে। বাঁশ, খর, কঞ্চি ও মৃত্তিকাই প্রধানতঃ তাহাদের গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ। স্থান বিশেষে কৃষকেরা বাঁশের খুঁটির উপর বাঁশ ও বাখারির ছাউনি করিয়া খরের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করে এবং ঘন কঞ্চি দ্বারা বেড়া দিয়া উহার উপর মৃত্তিকার লেপ দেয়। কোথাও কোথাও মাটীর দেয়ালের উপর বাঁশ বাখারির ছাউনি করিয়া খর কিংবা ধানের বিচালী দ্বারা আচ্ছাদিত করে। প্রত্যেক কৃষকের বাটীতে দুই তিনখানি, অবস্থা-বিশেষে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক গৃহ থাকে। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কৃষকের গৃহে দেখা যায়। প্রদীপ রাখার ক্ষুদ্র মাটীর দেল্‌খো, দুই তিনখানি চাটাই কিংবা মাদুর, একটি কাঠের বাক্স, একখানা ক্ষুদ্র আয়না, একখানা ক্ষুদ্র কাঠের চিরুনী, কতকগুলি পিতলের ও মাটীর বাসন, একটা হুঁকা এবং চাষের যন্ত্র লাঙ্গল কাস্তে প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক কৃষিজীবীই দুইটি অথবা ততোহধিক বলদ এবং গাভী পালন করে। আগন্তু লোক দেখিলেই কৃষক-মহিলারা সন্তানগুলি অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখে। এই ডাইনের ভয় যে শুধু কৃষকদের গৃহেই বিরাজমান তাহা নহে, উহার

অস্তিত্ব প্রতাপান্বিত জমিদারের ভবনেও পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। কৃষকের বাটীর বড় ঘরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত দাওয়া বা বারেণ্ডা থাকে। কৃষকেরা উহাতে বসিয়াই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

গ্রাম্য দোকানদার মুদী ময়রা প্রভৃতির বাসভবন কৃষকের বাসভবন অপেক্ষা কিছু উন্নত। একটি উঠানের চারিদিকে চারিখানি খরের ঘর। বাহিরের ঘরখানির মুখ রাস্তার দিকে থাকে। ঐখানিই দোকানরূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ ঘরের মধ্যে ইটের উপর ক্রম-নিম্নভাবে তক্তা পাতিয়া চাউল, ডা'ল, লবণ, তেল, ময়দা, ঘি, তামাক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখিয়া উহার উপর সাজাইয়া রাখা হয়। ভিতরের দিকেও দোকানঘরের একটা দর্‌জা থাকে। ঐ দর্‌জা দিয়া ভিতরে যাতায়াত করা যায়। ময়রারাও তক্তার উপর মুড়ি মুড়কি বাতাসা সন্দেশ গুড়, চিনি প্রভৃতির পাত্র সাজাইয়া বাহিরের দিকে জাল দিয়া ঘিরিয়া রাখে। কোন কোন দোকানদারের বাটীতে উঠানের দুই দিকে দুইটি একতলা ইটের কুঠরী একদিকে প্রাচীর। বাহিরের ঘরখানির ইটের দেয়াল কিন্তু খরের চাল। ঐ ঘরেই দোকান সাজান হয়। দোকানদারদেব বাড়ীতে নিম্নলিখিত আস্‌বাবগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বড় কাঠের বাক্স, প্রদীপ রাখার কাঠের ডেল্‌খো, পিতল ও কাঁসার বাসন, আয়না, চিরুণী, দাঁড়ি পাল্লা ও হুঁকা। অপেক্ষাকৃত ধনী দোকানদার, যাহারা কাপড় ও সোণা রূপার ব্যবসায় করে, তাহারা প্রায়ই পাকা বাড়ীতে বাস করে এবং ঐ শ্রেণীর দোকানদারের বাড়ীর ভিতরের কোন কোন অংশে দ্বিতল গৃহও দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের একতালা বড় হলের অর্দ্ধেকটায় আদ হাত উচু তক্তপোষ পাতা থাকে। উহার উপর লাল সালুকের পাতলা গদি ময়লা চাদরে আচ্ছাদিত। পাশের তাকে কাপড় সাজান থাকে। সোণা রূপার দোকানদারের হাতের কাছেই একটা লোহার সিন্দুক দুই তিন প্রকার নিক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ফরাসের বাহিরে কয়েকখানি টুল ও বেতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোড়া থাকে। ধনী দোকানদারদের গৃহে নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি অতিযত্নের সহিত রক্ষিত হয়। ঘরের দেয়ালে জগন্নাথের ও কালীঘাটের কালীর পট, প্রদীপ রাখার জন্য পিতলের পিলসুজ, শক্ত কাঠের সিন্দুক, পিতলের বৈঠকের উপর হুঁকা, পিতল কাঁসার বাসন, উঠানে তুলসীবেদী প্রভৃতি। গ্রাম্য-শিল্পীদের বাসভবনও দোকানদেরই মত। তন্তুবায় ও স্বর্ণকারেরাও যথাক্রমে বাহিরের ঘরেই তাঁত বুনে ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করে। লোহাগড়া কামারদের দোকান ঘরে সর্ব্বদা দমাদম্ হাতুড়ির শব্দ হয়।

গ্রাম্য ভদ্রলোকদের বাটী দুই অংশে বিভক্ত, অন্দর ও সদর। সদরে চণ্ডীমণ্ডপ নাটমন্দির ও বৈঠকখানা থাকে। অবস্থাবিশেষে কোন কোন বাড়ীতে একাধিক বৈঠকখানা দেখা যায়। উহার একটিতে বসিয়া বাড়ীর বালকেরা অধ্যয়ন করে। প্রত্যেক গৃহেরই বারান্দাগুলি বেশ প্রশস্ত। ঐ বারান্দায় মাদুর কিংবা চৌকীতে বসিয়া পাড়ার লোকে গল্প করে, দাবা পাশা খেলে ও তামাক খায়। অন্দরে একটি চতুষ্কোণ উঠানের চারিদিকে সাত আটখানি ঘর থাকে। ঐ ঘরগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকে বলিয়া উহাতে আলো হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই দুর্গন্ধ হয়। প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তির জন্য অন্দরে এক একটি নির্দ্দিষ্ট ঘর থাকে, স্ত্রী ও সন্তানাদি সহ তাহারা উহাতে বাস করে। বাটীর বিধবারা একটি ঘরে থাকে, বয়স্কা বালিকারাও তাহাদেরই সঙ্গে শয়ন করে। উঠান অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। বাসন ধোয়া, স্নান, ময়লা ও আবর্জ্জনা ফেলা প্রভৃতি উঠানেই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে দুইটি করিয়া রান্না ঘর থাকে। বিধবাদের জন্য যে ঘরটি নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাতে কেহ মাছ মাংস প্রবেশ করাইতে পারে না। কারণ, হিন্দুবিধবারা আতপান্ন শাক সজী ডাল তরকারী ফলমূল দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিয়াই কাল

যাপন করেন, মৎস্য মাংস প্রভৃতি তাঁহাদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ভদ্র-লোকদের বাড়ীতে যে সকল গৃহোপকরণ থাকে, তন্মধ্যে এই গুলি প্রধান। তক্তপোষ, পালঙ্ক, গদি মশারি পিতলের পিলসুজ্ লণ্ঠন গালিচা সতরঞ্চ মাদুর, তাঁবা পিতল ও কাঁশার বাসন, রূপা-বাঁধা হুঁকা দুই একখানা কেদারা ইত্যাদি। আজ কাল অনেকেই চেয়ার্ টেবিল সোফা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যুরোপীয়দের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি অত্যন্ত অধিক। এ জন্য যে সকল বাড়ীতে ভাল আলো হাওয়া লাগে, সেই সকল বড়ীতেই তাঁহারা বাস করেন। যুরোপীয়দিগের বাড়ীতে যেরূপ শোভা সৌষ্টব সুখ ও নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়, দেশীয় লোকের বাড়ীতে সেরূপ আশা করা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে সকল যুরোপীয়ের বাড়ী আছে, উহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড খোলা যায়গা থাকে। ঐ যায়গায় সমশীর্ষ শ্যামল দুর্ব্বাক্ষেত্রে সদা মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ ক্ষেত্র পার হইলেই বৃহৎ বৈঠকখানা (Drawing room) উহার মেঝো ম্যাটিং করা এবং উহাতে সুন্দর চেয়ার্, টেবিল, কৌচ্, ইজি চেয়ার্, বৃহৎ বৃহৎ আয়না, নানাবিধ ছবি, শূন্যে লম্বমান আলোকাধার, সিঁড়িতে ফুলের টব প্রভৃতি মনোজ্ঞ ও মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি এত পরিপাটীর সহিত সাজান থাকে যে, দেখিলে আনন্দ বোধ হয়। বসিবার ঘরের পাশেই একটি পাঠাগার (Library) থাকে। উহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট বাঁধান পুস্তক মাসিক পত্র ও সংবাদ পত্র উত্তমরূপে সাজাইয়া রাখা হয়। ভোজনের ঘরটিও (Dining room) বিলক্ষণ প্রশস্ত। উহাতে যেমন আলো তেমনি হাওয়া খেলে। উহার মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল ও উহার পার্শ্বে চেয়ার্ সাজাইয়া রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন যুরোপীয়দের বাড়ীতে একটি স্নানাগার (Bath room) ও মনোহর শয়ন গৃহ (Bed chamber) থাকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই মাত্র বলা উচিত যে, একজন মধ্য-শ্রেণীর

য়ুরোপীয়ের বাড়ী দেখিলেও মনে হয় যেন উহা সুখ স্বচ্ছন্দতা ও স্বাস্থ্যের নিলয় কিন্তু দেশীয়দিগের বাড়ী প্রায়ই ঐ রূপ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে না। তবে আজকাল যে সকল দেশীয় লোক য়ুরোপে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুমোদিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের বাসভবনও য়ুরোপীয় প্রণালীতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

এদেশের রাজা জমিদার ও ধনকুবেরদের বাসভবনের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সেই অভ্রস্পর্শি-অনন্ত-সৌধমালা, মর্ম্মর-সোপান-শোভিত প্রশস্ত জলাশয় সকল এবং নন্দন-কাননতুল্য মনোহর উদ্যানরাজি, সুবর্ণ ও রৌপ্যময় পালঙ্কে সাটিন্ ও মকমলের শয্যা, স্বর্ণ-নির্ম্মিত দীপাধার, হীরক-মণিমাণিক্য-খচিত গৃহোপকরণ প্রত্যক্ষ করিয়া য়ুরোপীয়েরাও অনেক সময় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। আমরা এখানে কেবল গ্রাম্য চিত্র প্রদর্শন করিলাম, নগরের কথা কিছু বলা হইল না। উপসংহারে বক্তব্য, গৃহ এবং গৃহোপকরণ অধিক মূল্য বা অল্প মূল্যের হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু উহার দৃশ্য রুচি-সঙ্গত এবং নির্ম্মাণ-প্রণালী স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং সংসারের শুভাকাঙ্ক্ষী গৃহীমাত্রেরই গৃহ এবং গৃহোপকরণ সকল পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

স্বাবলম্বন-শক্তি।

স্বাবলম্বন কি, উহার প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব, স্বাবলম্বী মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্ত, ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাবলম্বন-শক্তির উপকারিতা ও উহার অভাবে অপকারিতা, ভারতে স্বাবলম্বন-শক্তির উন্মেষ ও উহার ফল।

(৩)

নিজের শক্তিতে নির্ভর করার নাম স্বাবলম্বন। ধেনুবৎস ভূমিষ্ঠ হইয়া একবার আপন পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। যেই উঠিয়া দাঁড়ায়, অমনি ভূতলে পড়িয়া আছাড় খায়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইয়াও চেষ্টায় বিরত হয় না। কিছুক্ষণ পরে গিয়া, দেখ, সদ্যঃ-প্রসূত বৎস দ্রুতবেগে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। বৎস যদি প্রথম আঘাতেই হতাশ হইয়া শুইয়া থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ দ্রুত ধাবনের শক্তি কখনই লাভ করিতে পারিত না। অতএব স্বাবলম্বনই তাহার দৈহিক শক্তি লাভের মূল বলিতে হয়। এই স্বাবলম্বনবৃত্তি প্রত্যেক জীবের পক্ষেই কার্য্যকরী। যাহার স্বাবলম্বন-স্পৃহা যত অধিক, সে তত উন্নত। স্বাবলম্বী বনবিহঙ্গ ও গৃহ-পালিত পক্ষীর সহিত তুলনা করিয়া দেখ, একটি কেমন বলশালী ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত অপরটি ভীত ও কিরূপ নিস্তেজ। এই স্বাবলম্বন-শক্তির সাহায্যে কত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও উন্নতির অত্যুচ্চ সোপানে আরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উহার অভাবে সহস্র সহস্র উন্নত ব্যক্তিকেও অনুন্নত অবস্থায় কাল যাপন করিতে হয়। শবরবালক একলব্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে গেল। রাজগুরু নীচজাতীয় শিক্ষার্থীকে অবজ্ঞা ভরে ফিরাইয়া দিলেন। বালক নিরাশ হইল না, স্বাবলম্বন-শক্তির আরাধনায় নিযুক্ত হইল। সে মৃত্তিকার দ্বারা দ্রোণের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই সম্মুখে ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। শেষে একলব্যেরই জয় হইল। জীবন্ত দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য মহাবীর পার্থ যে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অক্ষম হইলেন, দ্রোণের প্রতিকৃতির শিষ্য অবজ্ঞাত একলব্য অনায়াসে তাহা বিদ্ধ করিল। অতএব স্বাবলম্বন-শক্তি দ্বারা মানুষ কিরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, এই ঘটনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পুরাকালে স্বাবলম্বন-শক্তির বড়ই সমাদর ছিল। কোন রাজাধিরাজের

পুত্রও দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ হীনদশা প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বাবলম্বন-শক্তির সাহায্যে পরম সন্তোষসহকারে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। রাজভ্রষ্ট অন্ধ রাজা দ্যুৎসেনের পুত্র সত্যবান্ বৃদ্ধ পিতা মাতা ও সাধ্বী পত্নী সাবিত্রীর জন্য স্বয়ং কাষ্ঠসংগ্রহ ও ফল মূল আহরণ করিতেন। মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন অজ্ঞাতবাসকালে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নরপতি বিরাটের গৃহ-শিক্ষক হওয়া অবজ্ঞার বিষয় মনে করেন নাই। যে যে, অবস্থায়ই পতিত হউক না কেন, সকল সময়েই স্বাবলম্বন শক্তির সাহায্য প্রার্থনীয়। ঈসপের রচিত গল্প পুস্তকে লিখিত আছে;—গ্রীক্ দেশের এক গোশকটের চালক কর্দ্দমে প্রোথিত শকটকে চালাইবার জন্য বলীবর্দ্দের প্রতি তিরস্কার গালাগালি ও ভয়ানকরূপে প্রহার পর্য্যন্ত করিল, তথাপি শকট চলিল না। অবশেষে সে নিরুপায় হইয়া হার্‌কিউলিস্ নামক শক্তিধর দেবতার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেবতা শকট চালকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন;—"বাপু! শুধু আমাকে ডাকিলে কি হইবে? চাকায় কাঁধ দিয়া ঠেল এবং পরমেশ্বরকে ডাক, তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। উদ্যমহীন হইয়া পরমেশ্বরকে ডাকিলে তিনি প্রসন্ন হন না। যে কার্য্য করে এবং পরমেশ্বরকে ডাকে, পরমেশ্বর তাহারই সাহায্য করেন"। উক্ত গল্প হইতেও শিক্ষা লাভ করা যায়, স্বাবলম্বন ব্যতীত মানবের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতে পারে না।

সর্ব্বদাই দেখা যায় অনেক ধনকুবেরের পুত্রের প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য শৈশব হইতেই বহু লোক নিযুক্ত থাকে। কেহ স্নান করাইয়া দেয়, কেহ পোষাক পরাইয়া দেয়, কেহ গাড়ীর পার্শ্বে বসিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে রাত্রিতে সকল সময়েই শিক্ষক ছেলের পিছনে লাগিয়াই থাকেন। এমন কি বালক স্বাধীনমনে নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে না। এত যত্নের পরও দেখিতে পাওয়া যায়, বালক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয় এবং

অভিভাবকের যৎকিঞ্চিৎ অনবধানতা ঘটিলেই কুসঙ্গে মিশিয়া কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। আর, যাহারা দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, যাহাদের প্রতিপালন কিংবা শিক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত হওয়া ত দূরের কথা, নিজেদেরই অনেক সময় অনেক গৃহকর্ম্ম করিতে হয়, শিক্ষক সকালে সন্ধ্যায় বিদ্যার বোঝা লইয়া যাহাদের গৃহদ্বারে দেখা দেন না, যাহারা আপন শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মনের অনুরাগে জ্ঞানানুশীলন করে, বিদ্যালয়েই শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করিয়া সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লয়, তাহারাই প্রত্যেক পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে। অতএব বিদ্যার্জ্জন বিষয়ে যে স্বাবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তাহার পর, দৈহিক শক্তি-সঞ্চয়ের কথা। ধনবানের নয়নের মণি শিশু সর্ব্বদা দাস দাসীর অঙ্কে অঙ্কে পরিভ্রমণ করে, সুতরাং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়িতে পায় না। এতদ্ভিন্ন প্রতিমুহূর্ত্তে ভৃত্যবর্গও যান বাহনের এত সাহায্য পায় যে, বিধাতৃদত্ত হস্ত পদাদির কদাচিৎ ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং অবয়ব সকল যথারীতি সঞ্চালিত না হওয়ায় শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আর ঐ রূপে প্রতিপালিত ব্যক্তি কখনও যদি চোর দস্যু কিংবা শত্রু হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ক্ষণকালও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। আর যাহাদিগকে শত শত অভাব এবং দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যদিয়া পরিপালিত হইতে হয়, নিজের কার্য্য নিজের করিতে হয়; কখনও সাংসারিক দ্রব্যের ভার বহন করিয়া আনিতে হয়, কখন ও গৃহসংলগ্ন উদ্যানে কিংবা বাগানে ভূমি খনন বৃক্ষ রোপণ কিংবা তরু লতিকার মূলে জল সেচন করিতে হয়, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিশ্চয়ই নৈসর্গিক নিয়মে বিকাশ লাভ করিয়া বলশালী ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকে। দুঃখে পড়িয়াও হিমক্লিষ্ট পঙ্কজের ন্যায় তাহাদের মুখ মলিন হয় না, চৌর কিংবা দস্যুর আক্রমণও

তাহারা অবাধে সহ্য করিতে পারে এবং শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ও কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে দেহ বিসর্জ্জন করে না, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভও করে। অতএব দেখা যাইতেছে, বহু আদরে প্রতিপালিত লোক অপেক্ষা আপন শক্তির সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত লোক অপেক্ষাকৃত ঘাতসহিষ্ণু।

কর্ম্মক্ষেত্রেও ঐ কথা। যাহাদের বহু সহায়, বহু লোক যাহাদের উঁচু করিয়া ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ এরূপ শ্যালক সম্বন্ধী কিংবা জামাতৃ-সম্প্রদায় অপেক্ষা নিঃসহায় সহানুভূতি-বঞ্চিত আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিরা যে সমধিক কার্য্য-কুশল, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা পরের উপর নির্ভরশীল এবং নিশ্চিন্ত সুতরাং কার্য্যে বীতরাগ। আর শেষোক্ত ব্যক্তিরা আত্মনির্ভর-সম্পন্ন চিন্তাশীল সুতরাং কার্য্যে অনুরক্ত। অতএব বীতরাগ ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিরা যে কার্য্যে সমধিক প্রশংসাভাজন হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? স্বাবলম্বী স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াও মাসিক পাঁচ ছয় হাজার টাকা আয় ও কত লোকহিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। দরিদ্র শ্যামাচরণ সরকার স্বাবলম্বন-শক্তির সাহায্যে বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত ও যথেষ্ট সাংসারিক উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন-শক্তির প্রভাবে যেমন ব্যক্তিগত উন্নতি হয়, তদ্রূপ জাতিগত স্বাবলম্বন-শক্তির প্রভাবে জাতিগত উন্নতি হয়। যে দেশের লোক স্বাবলম্বন-শক্তি-বিহীন তাহাদের চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া অতিদীনভাবে কাল যাপন করিতে হয়। আর, যাহারা স্বাবলম্বী তাহাদের অশেষ উন্নতি। এসিয়া মহাদেশের তুলনায় ক্ষুদ্র য়ুরোপ একমাত্র স্বাবলম্বন-শক্তির বলে, জলে স্থলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অসাধারণ প্রভুত্ব লাভ

করিয়াছে। আর স্বাবলম্বন-শক্তিহীন ভারতবর্ষ নিয়ত য়ুরোপের মুখাপেক্ষী হইয়া বহুক্লেশে সঞ্চিত অর্থরাশি বিদেশীর করে ঢালিয়া দিয়া নিতান্ত দীনভাবে কাল যাপন করিতেছে। কিছু দিন হইল, ভারতবাসী স্বাবলম্বন-শক্তির আরাধনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহার স্বর্গীয় আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া সকলের হৃদয় প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতের পুষ্প ও ফল।

ভারতে বিবিধ পুষ্প ফলের সমাবেশ, ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফল ও পুষ্পের উৎপত্তি, উহাদের আকার শোভা সৌরভও আস্বাদ, অন্য দেশের পুষ্প ও ফলের তুলনায় ভারতীয় পুষ্প ফলের উৎকর্ষ।

(৪)

ভারতবর্ষের প্রতি প্রকৃতি দেবীর অনন্ত কৃপা। বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশই তাঁহার এত দূর কৃপা লাভে অধিকারী নহে। বিভিন্ন জল বায়ুর গুণে যত প্রকার পুষ্প ও ফল হওয়া সম্ভব, প্রকৃতি সে সমস্তই ভারতবাসীর করে অকাতরে ঢালিয়া দিতে তিল মাত্র কুণ্ঠিত নহেন। নূতন নূতন ঋতু, নূতন নূতন পুষ্প ও ফল সম্ভার লইয়া প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষে দেখা দেয়, তাহাদের নৈসর্গিক শোভাও সৌরভ, দিঙ্মণ্ডল পরিশোভিত ও আমোদিত করে।

আমাদের জন্মভূমি অনন্ত কুসুমের জননী। তন্মধ্যে চম্পক একটি। কষিত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণের জন্য উহার কবিদত্ত 'হেমপুষ্প' নামটি সার্থক। চম্পক পুষ্পের আকৃতি ক্রমহ্রস্ব, সৌরভ অত্যন্ত তীব্র এবং দূরগামী। পদ্মিনী কুসুম-রাজ্যের রাণী। দেবতাই হউন, আর মানুষই হউন, সকলের নিকটেই ইঁহার সমান আদর। ভাবুকেরা

বলেন, "ইনি ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ সহস্রাংশুর প্রণয়িনী।" সূর্য্যোদয়ে পদ্মিনীর মুখ ভরা হাঁসি দেখিলে সে কথায় আর কোন সন্দেহ থাকে না। পদ্মিনীর গন্ধ বড় মধুর, বড় স্নিগ্ধ। তজ্জন্য মধুলুব্ধ ভৃঙ্গগণ নিয়তই গুণ্ গুণ্ রবে মানিনী পদ্মিনীর তোষামোদে ব্যস্ত। এই পুষ্পের বর্ণ দ্বিবিধ, শ্বেত ও লোহিত। দুইই শোভা ও সৌরভের আধার। যখন সরোবরে প্রফুল্ল পদ্মিনীকুল বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া একটি আর একটির গায়ে ঢলিয়া পড়ে, তখন তাহা দেখিয়া কেনা মুগ্ধ হয়? ইন্দীবর নামক নীলপদ্মের কল্পিতমূর্ত্তি কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ভারতের হ্রদ বা সরোবরে উহা প্রত্যক্ষ হয় না।

গোলাপ বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই পুষ্প শ্বেত পীত ও লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণে বিভক্ত। ভ্রমণকারীর মুখে শুনা যায়, কাশ্মীরের পীত গোলাপ নাকি শোভা ও সৌরভে অদ্বিতীয়। কিন্তু আমি ত লোহিত বর্ণের বড় বড় গোলাপের ন্যায় সৌন্দর্য্য কিছুতেই দেখিতে পাই না। কোন গোলাপ-বাগে প্রবেশ করিলে ক্রোশব্যাপী গোলাপ ফুল দেখিয়াও হৃদয়ের আশা মিটে না। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ বলেন;—"গোলাপ বিদেশাগত পুষ্প।" পারস্যই নাকি এই সুন্দর কুসুমের আদিম জন্ম-স্থান। যেখানেই জন্মভূমি হউক না কেন, গোলাপ হৃদয়ের অতুল আনন্দপ্রদ। সংস্কৃত কাব্যে জাতি যূথিকা কুন্দ শেফালী নবমালিকা প্রভৃতি কুসুম সমূহের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। জাতি পুষ্পের নামান্তর মালতী। যূথিকা এখন প্রচলিত ভাষায় যুঁই নামে পরিচিত। নবমালিকা ও মল্লিকা একই পুষ্প। উহা মল্লিকা ও কাষ্ঠমল্লিকা ভেদে দুই প্রকার। এই সকল পুষ্পের বর্ণ তুষারশুভ্র এবং গন্ধ অতিমনোহর। কবিগণ সুন্দরীদের অঙ্গুলির সহিত চম্পক-পুষ্পের, মুখের সহিত পদ্মের, দন্তের সহিত কুন্দ কুসুমের এবং নাকের সহিত তিল ফুলের উপমা দিয়া থাকেন। চম্পক এবং পদ্মের নাম ইংরাজী কবিতাতে ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার

পরই বকুল ও কামিনী ফুলের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। কামিনী ফুলের নাম হইতেই বুঝা যায়, উহা অত্যন্ত কোমল, স্পর্শমাত্র দল ঝরিয়া যায়। কিন্তু এই পুষ্পের সৌরভ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং উহার শ্বেত উজ্জ্বলকান্তি অত্যন্ত নয়নপ্রীতিকর। বকুল ফুলের বর্ণ কিংবা আকারে তাদৃশ বিশেষত্ব না থাকিলেও মনোরম সুগন্ধই উহাকে প্রথম শ্রেণীস্থ পুষ্পের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছে। শেফালিকাও বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক। ইহার আকার সুন্দর, দল তুষারের ন্যায় শুভ্র, বৃন্ত ঈষৎ রক্তাভ পীতবর্ণ। কামিনী ফুলের সুগন্ধের সহিত শেফালিকার সুগন্ধের তুলনা করিলে অসঙ্গত হয় না। বালিকারা শেফালিকা ফুলকে বড় ভালবাসে। শরৎকালে যখন এই পুষ্প মুক্তারাশির ন্যায় বৃক্ষমূলে বহুদূর পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তখন তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাহারা উহা সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথে এবং বসন রঞ্জিত করে। শ্বেত পুষ্পের মধ্যে গন্ধরাজ এবং টগরের সম্মানও নিতান্ত অল্প নহে। প্রথমটির নামেই বুঝিতে পারা যায় উহা সুগন্ধের আধার, দ্বিতীয়টিও মিষ্টগন্ধ-বিহীন নহে। রজনীগন্ধা আর একটি সৌরভশালী শুভ্র কুসুম। ঐ পুষ্প উন্মাদিনী শুক্লবসনা বালার ন্যায় বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া উদ্যানের শোভা বিস্তার করিয়া থাকে।

স্থলপদ্ম সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয় হইলেও সৌগন্ধবিহীন। তজ্জন্য কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন ;—"হায় বিধাতা একাধারে সমুদয় গুণের সমাবেশ করিতে নিতান্তই পরাঙ্মুখ।" কাঞ্চন অশোক দুইটিই পরম-শোভাশালী মনোজ্ঞ কুসুম। ইহারা বসন্তের প্রারম্ভে যখন উপবন মধ্যে দেখা দেয়,তখন রক্তাভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। জবা দেবতাবিশেষের বড় প্রিয়। এই পুষ্প শ্বেত পীত পাণ্ডু লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের অদ্বিতীয় উদাহরণ। অতসী পুষ্প সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ। পৌরাণিক কবিগণ উহার বর্ণের সহিত গিরিরাজ-

নন্দিনীর দেহ-প্রভার উপমা দিয়াছেন। জয়ন্তী কবরীর কৃষ্ণকেলি কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি উপাসকদিগের নিকট নিতান্ত অনাদৃত নহে। দোপাটি কেবল শরৎকালেও গাঁদা শীতকালে বিকসিত হয়। মধুমক্ষিকারা শরৎও হেমন্তে বক পুষ্প হইতে যথেষ্ট মধু আহরণ করে। শিরীষ কুসুমে কোমলতার পারাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ঝিন্টী, আকন্দ, বাকস, বন্ধুজীব কুরুবক নাগকেশর প্রমুখ অনন্ত কুসুম ভারতের উদ্যান ও অরণ্যরাজিকে সুশোভিত করিয়া রাখে। মাধবী তরুলতা ও ঝুমকো লতা, লতা জাতীয় কুসুমের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মাধবীর নামান্তর বাসন্তী লতা। এই লতা দ্বারা দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে কৃত্রিম কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তেরা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। উদ্যান কিংবা বৃক্ষবাটিকার দ্বারশোভিনী তরুলতাও মেঘমালার সৌসাদৃশ্য ধারণ করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথমেই আম্রের নাম করা উচিত। এই ফল যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। তজ্জন্য ইহার নামান্তর 'রসাল'। অতি সৌরভযুক্ত আম্রকে আভিধানিকেরা 'সহকার' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন "পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আম ছিলনা। হনুমান্ যখন সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে স্বর্ণপুরী লঙ্কার অশোকবনিকায় উপস্থিত হন, তখন জনক-নন্দিনী তাঁহার ক্ষুধা বিদূরিত করিবার নিমিত্ত একটি 'রসাল ফল' প্রদান করিয়াছিলেন। চতুর কপিবর ঐ মধুর ফলের আস্বাদনে বিমুগ্ধ হইয়া যত্নের সহিত বীজটি আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের এই সহস্র সহস্র রসাল তরু নাকি তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া থাকে।" এই কিম্বদন্তীর মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বাল্মীকি-রামায়ণে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। কাঁঠাল অত্যন্ত বৃহৎ-আকার ফল। সময়ে সময়ে উহা এত বৃহৎ হয় যে, দশ পনর জনের উদর পূর্ণ করিয়া ও একটী কাঁঠাল নিঃশেষ হয় না। কাঁঠালের মধ্যস্থ কোষ অত্যন্ত মধুর এবং বীজগুলি

ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়। তাল ফল কাঁঠালের ন্যায় বড় না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। কচি অবস্থায় ইহার সুকোমল জলপূর্ণ শাঁস বড় শীতল মধুর এবং স্নিগ্ধ। ছাকনির সাহায্যে পাকাতালের ঘন মিষ্ট রস বাহির করা হয়। নারিকেল অত্যন্ত লোভজনকও সুস্বাদু। ডাব এবং ঝুনো উভয় অবস্থায়ই নারিকেলের সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। আনারস পেয়ারা এবং কমলা লেবু তিনটি ফলই স্বাদুতার জন্য প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন;—"পূর্ব্বে শ্রীহট্ট কমিল্লা প্রভৃতি দেশকে কমলাঙ্ক প্রদেশ বলিত। সেই কমলাঙ্ক প্রদেশের ফল বলিয়াই ইহার (কমলা) নাম হইয়াছে।" প্রকৃতপক্ষেও ঐ দেশের কমলাই আকারে বড় এবং সুমিষ্ট। দার্জ্জিলিঙ্ এবং নাগপুর প্রদেশেও মিষ্ট লেবু জন্মে এবং উহাও কমলা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে কিন্তু উভয়ের স্বাদুতায় বিস্তর প্রভেদ। কদলী একটি উৎকৃষ্ট সুস্বাদু ফল, মর্ত্তমান চাঁপা প্রভৃতি বহুসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। দেশীয় লোকের অপেক্ষাও য়ুরোপীয়েরা কদলী ভোজনে অধিকতর অভ্যস্ত। দাড়িম্ব আর একটি সুদৃশ্য স্বাদু ফল। উহার মধ্যস্থ বীজগুলি পদ্মরাগমণির ন্যায় যেমন লোহিত ও উজ্জ্বল, তেমনি সুরস। রাজপুতানার মারোয়ার প্রদেশের দাড়িম উৎকৃষ্ট। বেদানাও দাড়িম জাতীয় কিন্তু উহা অধিকতর মূল্যবান্ এবং সুমিষ্ট। এ দেশের লোকেরা গ্রীষ্মারম্ভে পাকাবেলের সরবত খাইতে ভালবাসে। জাম দুই প্রকার। তন্মধ্যে গোলাপ জাম অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য এবং মিষ্ট। বড় বড় কাল জামও মুখরোচক এবং উপকারী। ডহু বা মাদার নামে এক প্রকার ফল আছে। উহার মধ্যেও কাঁঠালের কোষের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ থাকে কিন্তু উহা তেমন সুস্বাদু নহে। বাতাবী লেবু আকারে নারিকেলের তুল্য, আস্বাদ অম্লমধুর। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই খেজুরের গাছ দেখা যায়। উহার ফল বেশ মিষ্ট কিন্তু বাঙ্গালার খর্জ্জুর অপেক্ষা পশ্চিম দেশের পিণ্ডীখর্জ্জুর উপাদেয়।

লতাজাতীয় বৃক্ষের ফলের মধ্যে তরমুজ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। পাকা তরমুজের অভ্যন্তর ভাগ হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং উহা অত্যন্ত মিষ্ট। গ্রীষ্মের আতপসন্তপ্ত পিপাসিতের পক্ষে তরমুজ অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিদায়ক। ফুটি, বাঙ্গী, শঁসা, লাল আলু, শাঁক আলু প্রভৃতিও মন্দ উপাদেয় নহে। এই জাতীয় ফলের মধ্যে আঙ্গুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আঙ্গুরের সংস্কৃত নাম দ্রাক্ষা। এই ফলের আস্বাদ অম্লমধুর কিন্তু ইহা পরম উপকারী। ভারতবর্ষের মধ্যে পাটনায় ও পঞ্জাবে এই ফল জন্মে। কিন্তু ভারতের আঙ্গুর পারস্য ও অবগানিস্থানের আঙ্গুরের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। শুষ্ক আঙ্গুরের নাম কিস্‌মিস্।

উপসংহারে বক্তব্য যদিও পৃথিবীর সকল প্রদেশই প্রকৃতি-দত্ত নানাবিধ পুষ্প ও ফল প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। ভারতের পুষ্পের সৌরভ ও ভারতের ফলের স্বাদুতা সকল দেশকে পরাজিত করিয়াছে।

——o——

সত্যনিষ্ঠা।

সত্যনিষ্ঠা কি, উহা কয় প্রকার, কি প্রকারে সত্যনিষ্ঠা প্রতিপালন করিতে হয়, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কি কি সুবিধা আছে, অসত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরই বা অসুবিধা কি কি, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, সত্য পালনের দৃষ্টান্ত, সত্যনিষ্ঠা দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত কি উপকার সাধিত হয়।

(৫)

সত্যের উপর নিশ্চয় স্থিতির নাম সত্যনিষ্ঠা। সত্যনিষ্ঠা বলিলে সাধারণতঃ সত্যের উপর নির্ভর করাকেই বুঝাইয়া থাকে। সত্যনিষ্ঠা দুই প্রকার। প্রথম; আমরা যাহা মনে ভাবিব, বাক্যেও তাহা প্রতিপালন

করিব। অর্থাৎ আমরা যে বিষয় চিন্তা করিব, সে বিষয় সেই রূপই বলিব এবং আমাদের কার্য্য আমাদের কথার অনুযায়ি হইবে। কোন পরিচিত ব্যক্তি বিপন্ন, তাঁহার অর্থের প্রয়োজন। তিনি আমার নিকটে আসিয়া তাঁহার বিপদের কথা বর্ণনা করিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি চিন্তা করিলাম, এ অবস্থায় ইঁহার সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক। আমি তাঁহাকে বলিলাম "আমি আপনার বিপদের সময় সাহায্য করিব।" পরিচিত ব্যক্তি আশ্বস্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। যে দিবস তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন, আমি সেই দিবস বিনা আপত্তিতে সাহায্য করিলাম। আমার সত্যনিষ্ঠা পালন করা হইল। দ্বিতীয়;—সত্যনিষ্ঠা বলিলে এই বুঝায় যে, যাহা আমরা দেখিয়াছি কিংবা বলিয়াছি অথবা যাহা আমরা ভাবিয়াছি বা করিয়াছি, সরলভাবে উহার যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। আমাদের স্মরণশক্তি কিংবা দর্শনশক্তির অনুপযুক্ততা হেতু কিংবা বুঝিবার ত্রুটি-প্রযুক্ত যথার্থ ঘটনার বর্ণনায় যদি কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাহা হইলে উহা মার্জ্জনীয়। কিন্তু যদি প্রতারণার ইচ্ছায় ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত ঘৃণিত পাপজনক মনে করিতে হইবে। কোন ব্যক্তির বাটী হইতে এক দুর্ব্বৃত্ত একটি দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। গৃহস্বামী দুর্ব্বল, তিনি স্বয়ং উহা রক্ষা করিতে না পারিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেন এবং যাহারা দেখিয়াছিল, তাহাদিগকে সাক্ষী মানা হইল। প্রথম সাক্ষী বলিল "হাঁ অমুক ব্যক্তি ইঁহার বাটী হইতে আমার সাক্ষাতে বলপূর্ব্বক অমুক বস্তু লইয়া গিয়াছে।" বিচারক তাহাকে ঘটনার স্থান, সময় এবং ঐ সময় সাক্ষীর ঘটনাস্থানে উপস্থিতির কারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যে প্রশ্ন করিলেন সাক্ষী অকপটভাবে তৎসম্বন্ধে যথার্থ কথাগুলি বলিয়া গেল। সুতরাং এ স্থলে সাক্ষীর সত্যনিষ্ঠা প্রতিপালিত হইল। দ্বিতীয় সাক্ষী বৃদ্ধ, তাহার দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তির অল্পতা ঘটিয়াছে। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল,

"এই ব্যক্তিই যে লইয়াছে, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন, আপনি কি ইহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং অপহরণকারী তখন কি বলিয়াছিল ?" বস্তুতঃ বৃদ্ধ দর্শন ও শ্রবণশক্তির অনুপযুক্ততাহেতু ভালরূপ দেখিতে বা শুনিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হইল, আমি ভাল রূপ চিনি নাই, উহার কথাও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। ইহাতে বৃদ্ধের সত্যনিষ্ঠা প্রতিপালনের কোন ব্যাঘাত হইল না। তৃতীয় সাক্ষী যুবা, সে গোপনে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাহায্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সে বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে বলিল "হাঁ আমি গোলমাল শুনিয়া বাহির হইলাম, একটা লোক চলিয়া গেল, তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু সেই অপহরণকারী এই ব্যক্তি কি না বলিতে পারি না। অনেকে কথা বলিয়াছিল, সুতরাং কাহার স্বর, কে কি বলিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারি নাই।" শেষোক্ত সাক্ষী কেবল প্রতারণার অভিপ্রায়ে জানা সত্বেও প্রকৃত কথার অনেকাংশ গোপন করিল, সুতরাং উহার সত্যনিষ্ঠা পরিপালিত হইল না, প্রত্যুত জ্ঞানকৃত প্রতারণার জন্য অধর্ম্ম সঞ্চয় করিল।

জগতে সত্যই চিরস্থায়ী। কারণ, উহাই কেবল কালের অপ্রতিহত প্রভাব সহ্য করিতে পারে। মিথ্যা যত কৌশলের সহিতই প্রযুক্ত হউক না কেন, উহা কিছু দিনের জন্য লোককে প্রতারিত করে, অবশেষে মিথ্যা মিথ্যা বলিয়াই প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং মিথ্যাচারী সমুচিত কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য ব্যতীত আর কিছু চিরকাল বিদ্যমান থাকে না। মিথ্যা কথা বলিবার পূর্ব্বে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, মিথ্যা কল্পনা প্রকাশিত হইলেই উহা বিনষ্ট হয় এবং সহস্র চেষ্টায়ও মিথ্যা অপ্রকাশিত থাকে না। মিথ্যা কথা বলায় কিছুই সংসিদ্ধ হয় না, উহা যেমন অলাভকর, তেমনিই পাপজনক। মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, একটি মিথ্যা

বলিয়া তাহার সমর্থনের জন্য আর শত শত মিথ্যা কথা বলিতে হয়। মিথ্যা বাক্য বলিয়া উহা স্থির রাখিবার জন্য অনবরত কল্পনা-শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্বে উক্ত মিথ্যা কথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচালনা করিতে হয়। মিথ্যাবাদী সর্ব্বদা শঙ্কিত এবং চিন্তান্বিত থাকে এবং অনেক সময় সে প্রয়োজনাতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারে না। কখনও কখনও দেখা যায়, অনেকে না বুঝিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া শেষে হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হওয়ায় কাঁদিয়া ফেলে এবং সরল হৃদয়ে সমস্ত মিথ্যা স্বীকার করে।

সত্য কথা বলা কেমন সহজ ও সুখকর। সত্যবাক্য আমাদের ওষ্ঠাগ্রে সর্ব্বদা যেন বিরাজমান। ইচ্ছা করিলেই উহা অনায়াসে বাহির হইয়া পড়ে। সত্য কথা বলিবার অগ্রে কোন রূপ চিন্তা কিংবা কল্পনার আবশ্যক হয় না এবং উহা বলিয়া ভীত ভীত ভাবে সতর্ক থাকিবারও প্রয়োজন নাই। সত্য বলিয়া আমরা প্রফুল্লহৃদয় ও স্বচ্ছন্দভাবে কাল যাপন করিতে পারি। এই রূপ স্বচ্ছন্দতা ও সুখের পরিবর্ত্তে যে মিথ্যা কথা বলিয়া ভয় চিন্তা ও ব্যাকুলতাকে আহ্বান করে, তাহাকে মূর্খ ভিন্ন আর কি বলিব? সত্যনিষ্ঠা অন্যান্য ধর্ম্মের জননী। কোন সমাজই সত্য ব্যতীত স্থায়ী হইতে পারে না। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখিতে হইলে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে পরস্পরেরর প্রতি বিশ্বাস থাকিতে পারে না। ন্যায়পরতা শৌর্য্য স্বার্থত্যাগ আত্মসংযম পরোপকার প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষাও মিথ্যাবাদী জনসমাজে সমধিক ঘৃণিত হয়। অন্য সকল পাপের সংশোধন করা যাইতে পারে কিন্তু মিথ্যা ব্যবহার একবার অভ্যস্ত হইলে উহার সংশোধন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কোন সাধুব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিলেই

বুঝিতে হইবে, তাঁহার নৈতিক জীবনের অবসান অবশ্যম্ভাবী। কারণ, লোক সত্যনিষ্ঠার অভাবে অসাধু ও অসরল হইয়া থাকে। এ জন্য সত্যের প্রতি অনাদর, ভীরুতা এবং বিশ্বাস-ঘাতকতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। জগতের সকল উন্নত ব্যক্তি ও উন্নত জাতিই সত্যনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ। যে সকল জাতি এই নৈতিক ধর্ম্ম পালনে তৎপর, তাঁহারাই পৃথিবীর শাসক এবং শিক্ষক হইয়াছেন এবং যে সকল জাতি সত্যের প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত নহে, তাহারা ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীনকালে ভারতবাসী সত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিল। মহর্ষি বাল্মিকি বলিয়াছেন ;—"সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলও একটি সত্য বাক্যের তুলনায় নিতান্ত লঘু।" তিনি আরও বলেন, "জগতে মোক্ষ-লাভের দুইটি উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই দুইটি উপায় অহিংসা এবং সত্য।" বেদ পুরাণ ও কাব্যে এদেশের লোকের সহস্র সহস্র সত্যনিষ্ঠার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ সত্যভঙ্গ হেতু জনসমাজে ঘৃণিত হইবার ভয়ে প্রিয়পুত্র রামকে বিপৎসঙ্কুল অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ঐ কারণে মহারাজ রামচন্দ্র প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অবতার হইলেও একটি মিথ্যা কথার জন্য নরক দর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চিতোরের মহারাণা একমাত্র সত্যপালনের অনুরোধে পাঠানরাজ দুর্ম্মতি আলাউদ্দিনকে দুর্গমধ্যে অসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি অসদ্ব্যহার করেন নাই। আমাদের স্বদেশ-বাসীর ঐ সকল উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। জাতীয় উন্নতি সংসাধন করিতে হইলে আমাদের জাতীয় বীরগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, সমস্ত জাতীয় ও ব্যক্তিগত মহত্ত্ব সত্যনিষ্ঠা হইতেই সমুদ্ভূত।

———o———

সময়ের মূল্য।

সময়ের উপকারিতা, সুখভোগ্য বস্তুর সম্ভোগে সময়ের উপযোগিতা, সময়ের মূল্য, সময়ের ব্যবহার, সময়ের গতি, সময়ের অপব্যবহারের অনিষ্টকারিতা, সময়ের ব্যবহারে সাবধানতা, অপব্যবহারের হস্ত হইতে সময় রক্ষা, বিশুদ্ধ আমোদে সময় কাটাইবার উপায়, বৃথা বিষণ্নতা পরিহার পূর্ব্বক সময়ের সদ্ব্যবহারে মনোযোগ।

(৬)

সময় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা যাহা কিছু লাভ করি, সেই সকল পদার্থের উপকারিতা সময়ের উপর নির্ভর করে। বন্ধুপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, ভাল ভাল পুস্তক পাঠ, নানা বৈচিত্র্যময় প্রদেশে পরিভ্রমণ প্রভৃতি যাবতীয় সুখই সময়সাপেক্ষ। উপযুক্ত সময় না পাইলে পৃথিবীর কোন ভোগ্যই উপভোগ করা যায় না। কেহ কেহ বলেন;—"সময় এবং সম্পত্তি অনেক সময় তুল্যমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়।" কিন্তু আমার মনে হয়, সময়ের মূল্য সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক। সময় আমাদের জীবনস্বরূপ কিন্তু অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জীবনের জন্য ব্যাকুল অথচ সময়ের অপব্যবহারে কুণ্ঠিত নহেন।

আমরা যে সকল সময় বৃথা নষ্ট করি, অনন্তকাল ইচ্ছা করিলেও তাহা আমাদিগকে ফিরাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া জীবন যেন কেবল গাধার খাটুনি না হয়। আমরা নির্দ্দোষ চাতুর্য্য-পূর্ণ আমোদ প্রমোদ, বলকর ক্রীড়া কিংবা আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎও কথোপকথনে যে সময় অতিবাহিত করি, তাহা সময়ের অপব্যবহার নহে, প্রত্যুত উহা সদ্ব্যবহার। বলকর ক্রীড়া দ্বারা যে কেবল শরীর সুস্থ থাকে তাহা নহে, উহাতে আমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি

এবং উহা দ্বারা অনেক অনিষ্টকর প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

অনেকে বলেন "আমরা যাহা করিব মনে করি, সময়ের অভাবে তাহা করিতে পারি না"। এ সকল নিতান্ত অলস-প্রকৃতির লোকের উক্তি। বাস্তবিক পক্ষে, লোকে যাহা বাঞ্ছা করে, তাহা করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতে পারে। যাঁহারা সময়ের অভাবে কার্য্য করিতে পারেন না বলেন, প্রকৃত পক্ষে ইচ্ছা না থাকাই তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন না হইবার কারণ। সকলেরই উপযুক্ত বিশ্রামের সময় আবশ্যক। বিশ্রাম সময়ের কার্য্যকারিতা এই যে, উহা আমরা নিজের ইচ্ছামত কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিয়োগ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত বিশ্রাম সময় থাকে, তাহা হইলে অলসভাবে কাটাইয়া দেওয়া উহার প্রকৃত ব্যবহার নহে। সময় সকলের পক্ষে সমান গতিতে যায় না, উহা কাহারও পক্ষে অতিদ্রুত যায়, কাহারও পক্ষে বা অতি মৃদুভাবে অতিবাহিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিদের মুখে শুনা যায়, তাঁহাদের সময় কাটিতে চায় না। যাহারা কার্য্য করিবার যথেষ্ট সময় পান, তাঁহাদের কোন বাহাদুরী নাই কিন্তু যাঁহারা অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করেন, তাঁহারাই যথার্থ প্রশংসার্হ। অতিদীর্ঘ জীবন বিশেষ প্রশংসার্হ নহে, কিন্তু যে জীবন পবিত্র এবং সৎকার্য্যময় তাহাই প্রশংসার্হ। দৃষ্টান্ত স্থলে, দেখান যাইতে পারে, যে বৃত্ত যত বড় তাহা তত প্রশংসার্হ নহে, কিন্তু যাহা যথাযথ (ঠিক গোলাকারে অঙ্কিত) তাহাই প্রশংসার্হ।

পৃথিবীতে যত প্রকার অপব্যবহার হইতে পারে, সময়ের অপব্যবহার (আলস্য)ই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টজনক। যদি আমরা যথাযথ ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলেই সময় আমাদের এবং উহা অমূল্য, কিন্তু উহার অপব্যবহার হইলে অনেক সময় অনিষ্টদায়কও হয়। আর এমন কোন শক্তি নাই বৃথা অতিবাহিত সময়কে পুনরায় ফিরাইয়া

আনিতে পারে। জীবনের ভাল মন্দ বিচার জীবনের গভীরতা দ্বারাই নির্ণীত হয়, দীর্ঘতা দ্বারা নহে। জীবনে চিন্তিত বিষয় এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীই মানুষের মহত্ত্ব ঘোষণা করে, দীর্ঘায়ু, মানুষের কিছুমাত্র মহত্ত্ব প্রকটিত করিতে পারে না।

তুমি যে পরিমাণ সময় বৃথা নষ্ট কর, তদ্দ্বারা তত পরিমাণ চরিত্র ও সৌকর্য্য হারাও এবং যে পরিমাণ সময় কার্য্যে নিয়োগ কর, তত পরিমাণ সময় অধিক সুদে খাটান মুদ্রার ন্যায় তোমার জীবনরূপ ধনাগারে সঞ্চিত হয়। মানুষের জীবনকাল এত সংক্ষিপ্ত তথাপি উহার এত অপব্যবহার, ইহা কি অল্প আশ্চর্য্যের বিষয়? প্রত্যেকেই সময়ের প্রকৃত মূল্য অবগত হইতে চেষ্টা করুন এবং উহার প্রতিমুহূর্ত্তকে অপব্যবহারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করুন। যিনি কাজের লোক, তিনি সময় পাইলে তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ করুন, অথবা ভাবিয়া দেখুন তাঁহার সম্মুখে কোন্ কর্ত্তব্য উপস্থিত রহিয়াছে। তাহার পর, উহা সম্পাদনে নিরত হউন।

তুরস্ক-জাতির মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, 'সয়তান কাজের লোকদিগকে প্রলোভিত করে কিন্তু অলস লোকেরা সয়তানকে প্রলোভিত করে।' এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, কাজের লোকদের মনেও অনেক সময় অপবিত্র চিন্তা উপস্থিত হয়, কাজে ব্যস্ত বলিয়া তাহারা কোন অপবিত্র কার্য্য করিবার অবসর পায় না কিন্তু অলস লোকদের কোন কর্ম্ম নাই সুতরাং অসৎ চিন্তা বা অসৎ কল্পনা আপনা আপনিই আসিয়া তাহাদের শূন্যহৃদয় অধিকার করিয়া বসে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ও তাহার সময়ের অভাব হয় না। একজন ইংরাজ-কবি লিখিয়াছেন;—"সয়তান মানুষ ধরিবার জন্য ছিপ্ পাতিয়া বসিয়া আছে। কাজের লোকদের ধরিবার জন্য সে বড়শীর মুখে নানা চিত্তাকর্ষক বস্তু গাঁথিয়া দিতেছে কিন্তু অকর্ম্মা লোকদের জন্য কোন চেষ্টা করিতে

হইতেছে না, তাহারা সহজেই ধরা পড়িতেছে, এমন কি, অলস ব্যক্তিরা শুধু বড়শীই গিলিতেছে।” প্রকৃতপক্ষেও অলস ব্যক্তিদের পাপকার্য্যে প্রলোভিত করিবার আবশ্যক হয় না, তাহারা আপনা আপনিই পাপ-কার্য্যে আসক্ত হইয়া পড়ে। একজন য়ুরোপীয় ধর্ম্মসংস্কারক বলেন ;—“মানুষ একটা যাঁতার মত। যাঁতায় গম্ দিলে যাঁতা যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অল্প সময়ের মধ্যে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সেইরূপ মানুষের সম্মুখে কাজ দিলেও সে অল্প কালের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিয়া ফেলে। যাঁতায় গম্ না দিলে, যেমন সে আপনা আপনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ মানুষের হাতে কাজ না থাকিলে সেও আপনা আপনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নষ্ট হইয়া যায়।”

কাজের দ্বারা মানুষের ক্ষয় হয় না, উদ্বেগ অথবা দুশ্চিন্তাই মানুষের ক্ষয় সাধন করে। তজ্জন্যই বিজ্ঞ লোকেরা বলেন “ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাকুল হইও না, উপস্থিত কার্য্য সকল্ সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া যাও।” পদ্মিনী লতার প্রতি একবার দৃক্‌পাত কর, সে পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াও অতুল শোভায় সরোবরকে কেমন শোভান্বিত করে। তাহার কোন চিন্তা নাই, কোন উদ্বেগ নাই, সে আপনা আপনি হাসিয়া খেলিয়া আনন্দ অনুভব করে এবং মানুষকে ও কত আনন্দ প্রদান করে। তুমি কি মনে কর, পদ্মিনী পরিশ্রম করে না? যদি ঐরূপ ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ভ্রান্ত। উদ্ভিদেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। পদ্মিনী লতা আপন মৃণালের মধ্যে অনেক আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, উহা দ্বারাই সে পরবৎসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি মিল্‌টন বলিয়াছেন ;—“প্রত্যেক মুহূর্ত্তেরই পাঁখা আছে, আমরা কোন্ মুহূর্ত্তের কিরূপ ব্যবহার করি, তাহারা উড়িয়া গিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহা বলিয়া দেয়। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের অপব্যবহারের কথা আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া থাকে। আমরা এই কথা

সর্ব্বদা স্মরণ রাখিব এবং কোন মুহূর্ত্তকেই ভাল সংবাদ না লইয়া যাইতে দিব না।” অনেকে অনেক সময় বলেন;—“সময় কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, তাহা আমরা জানিতে পারি না।” কিন্তু ইহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, সময়ের অপব্যবহার না করিলে সে কখনও আপনা আপনি চলিয়া যায় না। মহাকবি সেক্সপিয়ার্ স্বীয় নাটকে দ্বিতীয় রিচার্ডের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন; “আমি সময় নষ্ট করিয়াছিলাম, এখন সময় আমাকে নষ্ট করিতেছে”—এই কথার মর্ম্মানুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায়—আমি সময়ের এমন কোন সদ্ব্যবহার করি নাই, যদ্দ্বারা আমার নাম অবিলুপ্ত থাকে। অতএব কাল-প্রভাবে কেবল আমার দেহান্ত হইতেছে না, আমি অনন্তকালের জন্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতেছি। কেহ কেহ বলেন;—“লোকে সাধারণতঃ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচে। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের কত অংশ আমাদের প্রকৃত কাজে ব্যবহৃত হয়। আহার নিদ্রা পরিচ্ছদ-পরিধান ও উন্মোচন, ব্যায়াম পরিভ্রমণ প্রভৃতির জন্য সময় বাদ দিলে আমরা প্রকৃত কাজের সময় কতটুকু পাই?” ল্যাম সাহেব বলিয়াছিলেন, “আমি নামে মাত্র পঞ্চাশ বৎসর জীবন যাপন করিয়াছি, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের যে কয় বৎসর অবান্তর কাজে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা বাদ দিলে দেখিবে আমার বয়স অতি অল্প!” আমরা পরহিতের জন্য যে কয় বৎসর অতিবাহিত করি, তাহা আমাদের উৎকৃষ্ট কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, জীবন হইতে উহা বাদ দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু আমরা যে কয় বৎসর আত্মহিত বা পরহিত ভিন্ন বৃথা নষ্ট করি, তাহাই জীবন হইতে বাদ দেওয়া উচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ রূপ বৎরের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এক জন গ্রন্থকার বলেন;—কতক সময় আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়, কতক অপহৃত হয় এবং কতক হাত ফ’স্কে চলিয়া

যায়। কিন্তু সময় যেরূপ করিয়াই যাউক না কেন, উহা পুনরায় ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের প্রাচ্যদেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে; 'দৈবকৃত বিপদ্ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি কিন্তু আমাদের স্বকৃত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই'। ইংলণ্ডের কোন ধনী ব্যক্তি এক সময় সুইজার্‌লণ্ডের হ্রদ সকল পরিদর্শনার্থ গমন করেন। সেখানে মর্লট নামক এক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ প্রত্নতত্ত্ববিদের আয় বার্ষিক দেড় সহস্র মুদ্রার অধিক নহে। কিন্তু তথাপি তিনি কোন চাকরি গ্রহণ করেন না। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়াছিলেন "আমি আমার সময়কে স্বর্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ মনে করি, তজ্জন্য আমি উহার কোন অংশ রৌপ্য কিংবা স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।"

সময় আমাদের ঈশ্বর-দত্ত একটি পবিত্র দান। এক একটি দিন আমাদের জীবনের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ। অতএব এরূপ পদার্থকে অপব্যয়ে বিনষ্ট হইতে দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। ভারতের রাজধানী এই কলিকাতা মহানগরীতে বিশুদ্ধ আমোদে সময় কাটাই-বারইবা কত সুবিধা দেখ? এখানে ইম্পিরিয়াল্-লাইব্রারিতে পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্য-গ্রন্থ বিনা ব্যয়ে পাঠ করিতে পারা যায়। নূতন নূতন গ্রন্থ অধ্যয়নে কিরূপ পবিত্র আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। চৌরঙ্গীর আর্ট-গ্যালারি বা চিত্র-বিদ্যালয়ে যাও, দেখিবে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক অসংখ্য মনোমোহন ছবি তোমার নয়নের আনন্দ বিধানের নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার পর, ইণ্ডিয়ান্-মিউজিয়ম্ বা ভারতীয়-চিত্রশালিকা। এই বাড়ীটি যেমন প্রকাণ্ড সংগ্রহও তেমনি অদ্ভুত। এখানে আগমন করিলে কত নূতন নূতন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চিত্রশালিকায়

কি না আছে? প্রাচীন যুগে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড পশু ছিল, তাহাদের কঙ্কাল-দেহ, প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার পশু পক্ষীর প্রাণহীন মূর্ত্তি, নানা বর্ণের শঙ্খ শম্বুক, পুরাকালের এবং বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদ্, নানা প্রকার মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ—সুবর্ণ হীরক মণি মাণিক্য প্রভৃতি, পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সংগৃহীত প্রস্তর ও ধাতু, প্রাচীন কালের চিত্তরঞ্জন নানাবিধ দ্রব্য, বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের মৃন্ময় ছবি, পুরাকাল হইতে প্রচলিত বিবিধ ধাতুর বহুবিধ মুদ্রা, অনেক প্রকারের কাঁচ ও চীনা মাটীর দ্রব্য, তুষারধবল মর্ম্মর প্রস্তর, ইজিপ্ট এসিরিয়া এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্দির ও দেব-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, অসংখ্য প্রকারের ক্ষৌমবসন, পশু-রোমজ বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি নিখিল পদার্থ এখানে বিদ্যমান।

তাহার পর, পুরাণাযাদুঘর বা এসিয়াটিক্-সোসাইটির কার্য্যালয়। এই বাটীতে অসংখ্য সংস্কৃত, আরবী, হিব্রু, বাঙ্গালা হিন্দী উড়িয়া আসামী, তেলেগু মার্হাট্টি গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহের হস্তলিপি সংগৃহীত আছে। প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতগণের জ্ঞান-সঞ্চয়ের পক্ষে এই স্থানটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জিওলজিকাল্-গার্ডেন বা পশুশালা আর একটি মনোরম দৃশ্য। এখানে সিংহ ব্যাঘ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূষিক পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ জীবিত প্রাণী রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া কাল যাপন করিতেছে।

মানবের পক্ষে যন্ত্রণা ভোগ যদিও অপরিহার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকার কোনই হেতু নাই। তথাপি অনেক লোক আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকেন, তাঁহারা ইহা অপেক্ষা সুন্দর পৃথিবী প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিষণ্ণতার কারণ তাঁহারা নিজেই, ইহাতে পৃথিবীর কোন দোষ নাই। সার্ আর্থার্ হেল্পস্ (Sir Arthur Helps) বলিয়াছেন;—"পৃথিবী জল বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই

যখন রহস্যপূর্ণ, প্রকৃতি যখন তোমার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিতেছেন, এবং তাঁহাকে (প্রকৃতিকে) বুঝিতে বলিতেছেন এবং তাঁহাকে স্ববশে আনিয়া নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিতে বলিতেছেন, তবে তুমি কেন বিষণ্ণ থাক? তুমি কিছু শিক্ষা কর, কিছু করিতে চেষ্টা কর এবং কিছু বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তোমার বিষণ্ণতা দূর হইবে।

——০——

ভদ্রতা।

ভদ্রতা কি, কি উপায়ে ভদ্রতা প্রকাশ করা যায়, কোন্ শ্রেণীর লোকের প্রতি ভদ্রতা প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক, ভদ্রতা সম্বন্ধে প্রচীন মহাজনগণ কি বলিয়াছেন, পুরাকালে যাঁহারা ভদ্রতাগুণে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন, এরূপ কতিপয় ব্যক্তির নাম কর, কি প্রকার লোকে ভদ্রতা প্রকাশ করিতে পারে, ভদ্রতাহীন ব্যবহার লোকের পক্ষে কিরূপ হয়, ভদ্রতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ভাল কি মন্দ, ভদ্রতা বিষয়েও মিতাচারী হওয়া উচিত কিনা?

(১)

রমণীয় গুণাবলীর মধ্যে ভদ্রতা অন্যতম। এই গুণ দ্বারা মানুষ সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইতে পারে। একজন ইংরাজ-লেখক বলিয়াছেন,— "নিজের প্রতি সমাদর না দেখানই ভদ্রতা।" যে ভদ্র, সে কি উচ্চ, কি নীচ, কি ধনী কি নির্ধন সকলের প্রতিই সমান আদর প্রদর্শন করিয়া থাকে। যিনি আমাদের অপেক্ষা ধনী বিদ্বান্ যশস্বী কিংবা উন্নত পদস্থ, তাঁহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু যাহারা জাতিগত পদমর্য্যাদা বুদ্ধিমত্তা অথবা নৈতিক শ্রেষ্ঠতা দ্বারা আমাদের সমাদর আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করাই

হৃদয়ের মহত্ব এবং যথার্থ ভদ্রতার পরিচায়ক। কারণ, যাঁহারা জাতিগত পদমর্য্যাদা-সম্পন্ন নানা বিদ্যায় বিভূষিত বা ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা আপামর সাধারণের নিকট সমাদৃত; সুতরাং তোমার সমাদর কিংবা অসমাদরে তাঁহাদের বিশেষ কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না। তোমার সমাদরের তারতম্যে তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধির বা হ্রাসের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহারা জাতিগত পদমর্য্যাদাহীন যাহারা ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা লাভ করিতে না পারিয়া বীণাপাণি ও কমলার কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, অথবা যাহারা ধর্ম্মরাজ্যেও কোন খ্যাতি বা প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের প্রতি সমাদর প্রদর্শনে কেবল নিঃস্বার্থ হৃদয়ের উন্নত ভাব প্রকটিত হয় না, প্রত্যুত সেই সমাদৃত ব্যক্তিরাও যথেষ্ট পরিতোষও উপকার লাভ করে। বৈষ্ণব জগতে যিনি প্রেম ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন "আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করিবে কিন্তু অন্যকে সর্ব্বদা সম্মান প্রদান করিবে।" খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা বলেন;—"যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগের পদ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন।" মহাভারত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের চরণ প্রক্ষালন করেন।

যাঁহারা প্রকৃত ভদ্র, তাঁহারা কে সম্মানের উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত তাহার বিচার করেন না। যথার্থ ভদ্রতা সদন্তঃকরণের পরিচায়ক। অন্যের প্রতি সাধু ইচ্ছা ও সদয় বিবেক হইতেই ভদ্রতা সমুৎপন্ন হয়। একজন ইংরাজ-কবি লিখিয়াছেন;—"ভদ্রতা এবং সৎস্বভাব সাধু অন্তঃকরণের ফল"। এই কবিবাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ভদ্র ব্যক্তিরা সাধু দয়ালু এবং সদ্বিবেচক। ইতিহাসও মুক্তকণ্ঠে উক্ত বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। অধিকাংশ সদাশয় এবং উন্নত চরিত্র ব্যক্তিই ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত। ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন,

সার্ ওয়াল্টারস্কট্, ডিকেন্স, এডিসন্ এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ভদ্রতাগুণে সমধিক বিভূষিত ছিলেন। প্রাচীন কালে যাঁহারা অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের জন্য আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই নাইট্-সম্প্রদায় ও অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন এবং সকলের নিকট সর্ব্বদা অতিশয় সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ ভদ্রতাই সংসারে সাধু অসাধু সভ্য অসভ্য শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অনেকে আছেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ভাল লোক হইলেও বাহিরের চা'ল চলন তাঁহাদের কিছু কর্কশ। এই শ্রেণীর লোকের ব্যবহার সকলের ভাল না লাগিতে পারে কিন্তু তাঁহারা সকলেই যথাশক্তি লোকের সাহায্য ও উপকার করেন। প্রসিদ্ধলেখক জনসন্ এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। যদিও এই প্রকৃতির লোক যথার্থ সাধু এবং পরোপকারী, তথাপি তাঁহারা অনেক সময় লোকের অপ্রীতিকর হইয়া থাকেন। যদি এই শ্রেণীর লোকের ব্যবহার একটু মিষ্ট হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃত দয়ার কার্য্য সকল আরও মনোরম হইত সন্দেহ নাই। ভদ্র ব্যবহারের এমন একটী মাধুর্য্য আছে যে, উহার সহিত প্রকৃত উপকারিতা বা কার্য্যকারিতার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও উহার দ্বারা সকলের মন পাওয়া যায়।

এরূপ অনেক লোক আছেন, তাঁহারা মিষ্ট ব্যবহারকে কপটতা মনে করেন কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। অতএব মিষ্ট আচরণ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ না হইলেও অপর লোকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বাহ্যতঃ মিষ্ট আচরণ করা কর্ত্তব্য।

"যদি তোমার ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাও থাকে,
তথাপি বাহিরে ধার্ম্মিক লোকের ন্যায় আচরণ করিবে।"

এই প্রবাদ বাক্য অতিশয় মহৎ ও পরম উপকারী। যেহেতু, মানব-

চরিত্রের মর্ম্মজ্ঞ মহাকবি সেক্সপিয়ার্ বলিয়াছেন ;—"ধার্ম্মিক লোকের ন্যায় বাহ্য ভাব ধারণ করিলে অবশেষে যথার্থই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে।"

কোন কোন জাতির মধ্যে দেখা যায়, তাহারা ভদ্রতার মাত্রা এত বাড়াইয়া ফেলে যে, উহা নিতান্ত হাস্যকর হইয়া উঠে। য়ুরোপে স্পেন্‌বাসীদিগের মধ্যে ভদ্রতার বাড়াবাড়ি এরূপ অধিক যে, সময়ে সময়ে উহা উভয় পক্ষেরই নিতান্ত বিরক্তিকর হয়। সকল বিষয়েই মিতাচারী হওয়া উচিত। ভদ্রতা বিষয়ে আতিশয্যও লোকের চরিত্রের পক্ষে দোষ, গুণ নহে।

——o——
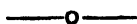
বাণিজ্য।

বাণিজ্য কি, প্রথমে কিরূপে বাণিজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বাণিজ্য-বিহীন জাতির অবস্থা, বাণিজ্যদ্বারা কিরূপ ধনাগম হয়, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, দুর্ভিক্ষে বাণিজ্যের উপযোগিতা, বাণিজ্যের অনিষ্টকারিতা ও তাহার পরিণাম, য়ুরোপীয় বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষের ক্ষতি, কি উপায়ে ঐরূপ ক্ষতি নিবারিত হইতে পারে ? তদ্বিষয়ে প্রস্তাব।

(৮)

বাণিজ্য কি ! বাণিজ্য মানবের জীবনধারণের প্রধান সহায়। কোন্ সুদূর অতীতকালে কোন্ দেশের কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম বাণিজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এখন সভ্যতার ইতিহাস হইতেই বাণিজ্যের ইতিহাস গণনা করা হইয়া থাকে। আদিম অবস্থা হইতে মানুষ কত সময় কত প্রকার অভাব অনুভব করিয়াছে, এবং কি উপায়ে সেই সকল অভাব পূরণ করিয়াছে, তাহার ইতিহাসই বাণিজ্যের ইতিহাস। কোন কোন দেশের লোক জীবন ধারণোপযোগী দ্রব্যের অভাব ব্যতীত অন্য কোন অভাবই অনুভব

করে না, এবং ঐ অভাব পূরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। তাহারা এই অবস্থায় কোন প্রকার উন্নতি না করিয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া একই ভাবে অবস্থান করে, কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ও তাহাদের মনে উদিত হয় না এবং তাহাদের তদুপযোগী কোন চেষ্টাও করিতে দেখা যায় না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিম্নতর জাতির মধ্যে এইরূপ সম্প্রদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু অন্য অনেক জাতি আছে, তাহারা জীবন রক্ষার উপযোগী দ্রব্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, খাদ্য এবং পরিধেয় ব্যতীত আরও কিছু চায়; তাহারা স্বচ্ছন্দতা বৈচিত্র্য এবং বিলাসিতাও প্রার্থনা করে। যখন তাহারা ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা বোধকরে, তখন উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে এবং কিছু দিন পরে উহা লাভ ও করে। কিন্তু প্রকৃত সভ্যতার সীমা নাই, কেননা একটি অভাব পূর্ণ হইতে না হইতে আবার কতকগুলি অভাব আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অচিরে উহা পূরণ করিতে গিয়া উত্তরোত্তর মানব-সমাজের উন্নতি হইতে থাকে। এই রূপ করিতে করিতে মানুষ ক্রমশঃ ধন সম্পদ্ ও প্রভুত্বের অধিকারী হয়। বাণিজ্য ধনাগমের সর্ব্ব- প্রধান উপায়। একজন সংস্কৃতকবি লিখিয়াছেন;—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়ং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ॥"

উদ্ধৃত কবিতায় ও বাণিজ্য ধনাগমের পক্ষে প্রধান উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বাণিজ্য ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যেমন উপকারক জাতীয় জীবনের পক্ষেও তদ্রূপ। বাণিজ্যপ্রিয় ইংলণ্ড এবং আমেরিকাবাসী জাতিসকল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্। ধন-দ্বারা কেবল মাত্র যে সুখ স্বচ্ছন্দতাই বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, উহা জাতীয় শক্তি মহত্ব শিল্প সাহিত্য বিদ্যা এবং সভ্যতার বৃদ্ধি করে। কৃষিপ্রিয়

ফ্রান্স ইতালি প্রভৃতি দেশবাসী জাতিসকল তাহাদের বাণিজ্যপ্রিয় ভ্রাতাদের ন্যায় ধনবান্ নহে।

বাণিজ্য ব্যক্তিবিশেষ এবং জাতিবিশেষের পক্ষে লাভজনক হইলেও উহা সমস্ত পৃথিবীর ধন সম্পত্তি বৃদ্ধির উপায় নহে। কারণ, বাণিজ্য ধন সম্পত্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। ইহাদ্বারা দুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য-সমূহের বিনিময় সাধিত হয় মাত্র। একজন ইংরাজ-লেখক বলিয়াছেন ;—"বাণিজ্য দেশের অভাব পূরণ করে এবং অতিরিক্ত দ্রব্য অন্যত্র লইয়া যায়। ইহা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়"। যদি আমাদিগকে মাত্র আমাদিগের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে কত কষ্টে কাল যাপন করিতে হইত! মনে কর, বাঙ্গালাদেশে কতকগুলি শস্যোৎপাদক বিভাগ বা জেলা আছে। ঐ সকল জেলায় এত শস্য উৎপন্ন হয় যে, জেলার অধিবাসীদের অভাব মোচন করিয়াও অনেক অবশিষ্ট থাকে। আবার, অনেক জেলা আছে, যাহাতে প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত তূলা উৎপন্ন হয়। যদি ঐ সকল জেলার মধ্যে পরস্পরের সহিত বিনিময় বাণিজ্য না থাকিত, তাহা হইলে এক জেলার অধিবাসীদিগকে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে কাল যাপন করিতে হইত এবং অন্য জেলার অধিবাসীদিগকে বস্ত্রের অভাবে ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। বিনিময়, অন্তর্ব্বাণিজ্যের পক্ষে যেমন উপকারক, বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষেও তদ্রূপ। প্রকৃতি বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ এরূপ ভাবে বর্ষণ করেন যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদিগকে পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। প্রসিদ্ধ লেখক এডিসন্ তাঁহার মনোহর ভাষায় লিখিয়াছেন ;—"অন্ন এক দেশে উৎপন্ন হয়, তাহার উপকরণ তরকারী জন্মে অন্যদেশে। চীনদেশে উৎপন্ন চাকে ভারতবর্ষের ইক্ষুদণ্ডের রসের দ্বারা মধুর করিতে হয়। পেরুদেশের স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা মণ্ডিত পরিচ্ছদ ভারতবর্ষীয় মনিমুক্তা-

হীরক-খচিত না হইলে শোভা পায় না।" বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা দুর্ভিক্ষের সময় অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূত হয়। বাণিজ্য স্বর্গীয় দূতের ন্যায় দুর্ভিক্ষ পীড়িতলোকদিগকে মৃত্যুর করাল হস্ত হইতে মুক্ত করে।

এত উপকারিতা সত্ত্বে ও বাণিজ্যের অনিষ্টজনকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিলাস এবং আড়ম্বর (জাঁক জমক) বাণিজ্যের সহচর, বিলাস এবং আড়ম্বর হইতেই দুর্ব্বলতা ও অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। এতদ্ভিন্ন বাণিজ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা বৃদ্ধি করে। উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শত্রুতাই শেষে অনেক জীবন ও ধন সম্পত্তি নাশের কারণ হয়। বাণিজ্য অন্য জাতিকে পরাজিত এবং ক্রীতদাস করিবার ছলমাত্র। অনেকে বলেন;—প্রথমে দেশভ্রমণকারী আগমন করিয়া দেশের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিয়া যান। তাহার পর, ধর্ম্মপ্রচারকের শুভাগমন হয়। কিছু কাল পরেই বণিকেরা আসিয়া তাঁহাদের পণ্য-সম্ভার বিস্তার করিয়া বসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্য সমাগত হয়। সৈন্যগণের আগমন হইলেই বুঝা যায়, তদ্দেশীয় কৃষ্ণ জাতির ধ্বংসের আর অধিক বিলম্ব নাই। বাণিজ্য যে ঐরূপ অন্যায়রূপে প্রভুত্ব বিস্তার ও কৃষ্ণাঙ্গ মানবের ধ্বংসের জন্য অনেকাংশে দায়ী তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

কিছু কাল পূর্ব্বে বাণিজ্যের তুলাদণ্ড আমাদের অনুকূল ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা আমাদের দেশের নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য কিনিয়া লইত কিন্তু আমাদিগকে তাহাদের প্রস্তুত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিতে হইত না। এজন্য আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে সুবর্ণ মুদ্রা পাইতাম কিন্তু আমাদের মুদ্রা তাহারা গ্রহণ করিতে পারিত না। এখন, আমরা মুদ্রার পরিবর্ত্তে ছুরি, কাঁচি কাপড় কাঁচের বাসন ছবির বই ও উপন্যাস প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য সকল পাইয়া থাকি এবং আমাদের দেশের মুদ্রা অন্য দেশে চলিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন;—"যদি ও ইহা প্রথম

দৃষ্টিতে ক্ষতি-জনক বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি-জনক নহে। কেননা, ভারতবর্ষে অধুনা বাণিজ্যের এত প্রসার হইয়াছে যে, আমরা পূর্ব্বে যত টাকা পাইতাম, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পাই।" একথা ও আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা মুদ্রার মূল্য অনেক কম এবং আমরা আমাদের দেশের যে সকল দ্রব্য অন্য দেশের নিকট বিক্রয় করি, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া আমাদের দেশে পুনরায় আগত হয় এবং উহা আমরা যে মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে ক্রয় করি। তদ্ভিন্ন আমাদের দেশের সকল দ্রব্য ও পুনরায় আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে না, আমাদের নিকট হইতে ক্রয়কারী বণিকেরা আমাদের দেশের দ্রব্য রূপান্তরিত করিয়া যেমন আমাদের দেশ হইতে বহুমুদ্রা লাভ করে, তেমন অন্য দেশ হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে, আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ক্ষতি হয়। কারণ, এখন আমরা কেবল দ্রব্য উৎপন্নই করিতে পারি, উহা হইতে কোন কিছু প্রস্তুত করিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্বে পারিতাম, ভারতীয় বণিকেরা অতিসূক্ষ্ম বসন, হীরক মুক্তা মণি মাণিক্য, এলাচ্, জীরা, লবঙ্গ, তেজপত্র, মৃগনাভি, কাশ্মীরী শাল, রেশম ও পশুরোমজ নানাবিধ পরিচ্ছদ ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া য়ুরোপ ও আফ্রিকা হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিত। এখন আমরা ঐ সকল দেশের নিত্য ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি না বলিয়া যথেষ্ট ক্ষতি-গ্রস্ত হই। অতঃপর, যদি আমরা য়ুরোপীয় কল কারখানা ও য়ুরোপীয় শিল্পীর নিপুণতার সাহায্যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা টাকাশাল হইতে নির্গত মুদ্রারাশির ন্যায় বিপুল অর্থ আমাদের গৃহাগত হইবে।

নিম্নলিখিত চিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখ।

১। অধ্যবসায়।
২। প্রাণিগণের প্রতি দয়া।
৩। সৎসাহস।
৪। ক্ষমা।
৫। তেজস্বিতা।
৬। যথা সময়ে কার্য্য করা।
৭। বন্ধুত্ব।
৮। দানশীলতা।
৯। যশোলাভের অভিলাষ।
১০। উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
১১। সন্তোষ।
১২। চরিত্র।
১৩। স্বাস্থ্য।
১৪। গুরুজনের আজ্ঞাপালন।
১৫। স্বার্থ-ত্যাগ।
১৬। ব্যায়াম।
১৭। সন্তরণ-শিক্ষা।
১৮। দৃষ্টান্তের প্রভাব।
১৯। জাতীয় চরিত্রের বিভিন্নতা।
২০। সম্পদের সদ্ব্যবহার।
২১। পদগৌরবের আকর্ষণী শক্তি।
২২। সঞ্চয়ী ও ব্যবসায়ী।
২৩। অকৃতজ্ঞতা।
২৪। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
২৫। উপদেশ দান ও গ্রহণ।
২৬। কার্য্য বিষয়ে ব্যগ্রতা।
২৭। স্বদেশানুরাগ। (প্রকৃত ও মিথ্যা।)
২৮। ধনিগণ দেশের উপকারক কি অপকারক?
২৯। দূরদেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির উপায় ও উপযোগিতা।
৩০। প্রাচীন ও আধুনিক পত্র লেখার পদ্ধতি।
৩১। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনের পতন অবশ্যম্ভাবী কি না?
৩২। যখন জাতীয় উন্নতি হয়, তখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায় না, কমে?
৩৩। প্রাচীন ও নব্য শিক্ষাদান-প্রণালীর তারতম্য।
৩৪। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।
৩৫। পুরস্কার-প্রদান ছাত্রগণের পক্ষে উপকারী না অপকারী।
৩৬। ধনী ও নির্ধনের সুখের তারতম্য।

৩৭। প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শ-চরিত্র।

৩৮। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দাসত্ব-প্রথা।

৩৯। ভারতের অবস্থান ও প্রাকৃতিক বিবরণ।

৪০। চিত্ত-প্রসন্নতা।

৪১। ভারতের লোকের উপর বাল্মীকির প্রভাব।

৪২। আত্ম-জীবনচরিত লেখা সম্বন্ধে যুক্তি।

৪৩। গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের পরস্পর তুলনা।

৪৪। ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে ইতিহাস শিক্ষা করা যায় কিনা?

৪৫। উপন্যাস পাঠ কি সময়ের অপব্যবহার?

৪৬। প্রতিভা ও পরিশ্রম।

৪৭। মানসিক উন্নতির উপায়। (অধ্যয়ন, চিন্তা, বিদ্বৎসঙ্গ ও লেখা)।

৪৮। প্রতিভাশালী ব্যক্তি লোককে মুগ্ধ করিতে পারেন, চরিত্রবান্ ব্যক্তি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন।

৪৯। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের গতি।

৫০। রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রজা-তন্ত্র শাসনপ্রণালী ও সাধারণ তন্ত্র শাসনপ্রণালী।

৫১। আইনের বলে মানুষকে ভাল করা যায় কি না?

৫২। হিংসা পরশ্রীকাতরতা ও প্রতিযোগিতার পরস্পর তুলনা কর।

৫৩। দৈহিক বল ও মানসিক বল।

৫৪। নিজগৃহই চরিত্র গঠনের প্রধান স্থান।

৫৫। মানব-জীবনের উন্নতি তিনটি গুণের উপর নির্ভর করে, শিক্ষা, সচ্চরিত্র ও সুযোগ।

৫৬। বাগ্মিতা ও কবিতার প্রভাব।

৫৭। সংখ্যা দ্বারা জাতীয় মহত্ত্ব নির্ণীত হয় না।

৫৮। কৃতকার্য্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

৫৯। নিন্দাকারীরা মক্ষিকাধর্ম্মী।

৬০। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ।

৬১। নদীর দ্বারা দ্বীপের উৎপত্তি।

৬২। বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার ও উপকারিতা।

৬৩। সমুদ্রের সন্নিকৃষ্ট ও সমুদ্র হইতে বিপ্রকৃষ্ট স্থানের জল বায়ুর তুলনা কর এবং প্রভেদের কারণ লিখ।

৬৪। মেঘের উৎপত্তি কিরূপে হয়?

৬৫। প্রাকৃতিক শক্তি কিরূপে মানবের বশে আসিয়াছে?

৬৬। ফলবান্ উদ্ভিদের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয়।

৬৭। বাণিজ্য-বায়ু ও তাহার উৎপত্তি।

৬৮। রামধনু।

৬৯। সৌরমণ্ডল।

৭০। আগ্নেয়গিরি।

৭১। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ।

৭২। মহাঝটিকা।

৭৩। বৃষ্টি;

৭৪। ঋতুভেদের কারণ।

৭৫। জোয়ার ও ভাটা।

———o———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুবাদ।

এক ভাষা হইতে ভাষান্তর করা তত সহজ নহে। প্রথম কারণ, বিভিন্ন ভাষাভাষীর চিন্তা-স্রোত বিভিন্ন-পথগামী। দ্বিতীয়তঃ এক দেশের লোক যেরূপ পদবিন্যাস-প্রণালী অবলম্বন করিয়া যেরূপ মনের ভাব প্রকাশ করে, অন্য দেশের লোক সেই রূপ মনের ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া অন্যপ্রণালীর পদবিন্যাস প্রথার অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। এতদ্ভিন্ন আচার ব্যবহার সঙ্গ প্রভৃতির বিভিন্নতা ও অনুবাদ কার্য্যে দুরূহতার হেতু। অনেক সময় দেখা যায়, এক ভাষায় একটি শব্দে যে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্য ভাষায় তদ্রূপ মনের ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া ঐরূপ একটি শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াও সম্যক্ কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। আর, সকল দেশের শিক্ষা সমান নয়। ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, সুতরাং এ দেশে দার্শনিক পরিভাষা এত অধিক যে ইংরাজীর ন্যায় সার্ব্বজনীন ভাষায়ও উহার অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। আবার ইংরাজীতে এত বৈজ্ঞানিক শব্দ আছে যে, তাহার প্রতিশব্দ বাঙ্গালা হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায় না।

এই সকল কারণে অনুবাদ কার্য্য দুরূহ হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। অনুবাদে মূলের সকল ভাবগুলিই যাহাতে স্পষ্টরূপে থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করা কর্ত্তব্য। এ জন্য আমাদিগকে প্রত্যেক শব্দের অনুবাদ না করিয়া এক একটি বাক্য ধরিয়া অনুবাদ করিতে হয়। অনুবাদ কালে অর্থের প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। মূলবাক্যের পদ-বিন্যাসের ক্রমের প্রতি তত

লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই। যেমন 'What is your name?' ইহার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে "কি তোমার নাম"? না লিখিয়া "তোমার নাম কি?" এইরূপ লিখিতে হয়। 'I have taken the medicine' ইহার অনুবাদ—"আমি ঔষধ গ্রহণ করিয়াছি" না লিখিয়া "আমি ঔষধ সেবন করিয়াছি," লিখিতে হয়। যেখানে এক ভাষার শব্দের তদনুরূপ প্রতিশব্দ না পাওয়া যায়, সেখানে একাধিক শব্দের দ্বারা উহার অনুবাদ করিতে হইবে। 'To silence opposition', ইহার অনুবাদ "বিপক্ষতাকে নীরব করিবার জন্য" না লিখিয়া "বিপক্ষ পক্ষকে নিরুত্তর করিবার জন্য" লিখিতে হইবে। অনেক সময় একাধিক ইংরাজী কথার বাঙ্গলায় একটি কথায় অনুবাদ করা যায়। যেমন, 'A fact admitted byall' সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা। 'Of no avail'—নিষ্ফল। আর বাঙ্গালার অনুবাদ ঠিক রীতিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় ইংরাজীর অনুবাদে ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার গন্ধ পাওয়া যায়। ঐরূপ বাঙ্গালা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। 'He is above suspicion' ইহার অনুবাদ "তিনি সন্দেহের উপরে" এই কথা না লিখিয়া "তাঁহার কার্য্যে কোনরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে না" এই রূপ লেখা উচিত। অনুবাদের ভাষা যত সহজ হয়, ততই ভাল। স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভাষা ও স্থানে স্থানে গ্রাম্য কথা ব্যবহার করা উচিত নহে। সর্ব্বত্র প্রচলিত বিশুদ্ধ ভাষা বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। আর, অনুবাদে সকল সময়েই স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অনুবাদের মর্ম্ম বুঝিতে যেন কোনরূপ ক্লেশ না হয়।

[কতিপয় উদাহরণ।]

I.

(*a*) Raja Sahib proceeded to invest the fort of Arcot, which seemed quite incapable of sustaining a

siege. The walls were ruinous, the ditches dry, the ramparts too narrow to admit the guns, the battlements too low to protect the soldiers. The little garrison had been greatly reduced by casualities. It now consisted of a hundred and twenty Europeans and two hundred sepoys. Only four officers were left; the stock of provisions was scanty; and the commander, who had to conduct the defence under circumstances so discouraging, was a youngman of five and twenty, who had been bred a book-keeper.

(*b*) During fifty days the siege went on. During fifty days the young captain maintained the defence, with a firmness, vigilance, and ability, which would have done honour to the oldest marshal in Europe. The breach, however, increased day by day. The garrison began to feel the pressure of hunger. Under such circumstances, any troops so scantily provided with officers might have been expected to show signs of insubordination, and the danger was peculiarly great in a force composed of men differing widely from each other in extraction, colour, language, manners, and religion. But the devotion of the little band to its chief surpassed anything that is related of the Tenth Legion of Cæsar, or of the Old Guard of Napoleon. The sepoys came to Clive, not to complain of

their scanty fare, but to propose that all the grains should be given to the Europeans, who required more nourishment than the natives of Asia. The thin gruel, they said, which was strained away from the rice, would suffice for themselves. History contains no more touching instance of military fidelity, or of the influence of a commanding mind.

(*c*) An attempt made by the Government of Madras to relieve the place had failed. But there was hope from another quarter. A body of six thousand Maharattas, half soldiers, half robbers, under the command of a chief named Murari Row, had been hired to assist Mahamed Ali; but thinking the French power irresistible, and the triumph of Chund Sahib certain, they had hitherto remained inactive on the frontiers of the Carnatic. The fame of the defence of Arcot roused them from their torpor. Murari Row declared that he had never before believed the Englishmen could fight, but that he would willingly help them since he saw that they had spirit to help themselves.

II.

(*a*) I walked seven times round the famous black stone, and pushed a way for myself through the immense crowd pressing to kiss it. While kissing it and rubbing hands and forehead upon it, I narrowly observed

it, and came away persuaded that it is an aerolite. All this time the pilgrims stood uncovered in the blazing sun, and suffered tortures with scorched hands and burning heads.

(*b*) At last we were allowed to put off the pilgrim's garb. Just before leaving the place I was sent for. I thought, now I am suspected. A crowd had gathered round the shrine, and a cry arose: 'Open a path for the Haji who would enter the house.' Two stout Meccans, who stood below the door, raised me in their arms, whilst a third drew me from above into the holy building.

(*c*) At the entrance I was accosted by several dark-looking officials, who inquired my name, nation, and other particulars. The replies were satisfactory, and a boy was ordered to conduct me round the building, and to recite the prayers.

(*d*) I will not deny it, that, looking at the windowless walls, the officers at the door, and a crowd of excited Moslems below, I felt like a trapped rat. A blunder, a hasty action, a misjudged word, and my bones would have whitened the desert sand. This did not, however, prevent my carefully observing the scene during the long prayer, and making a rough plan of the building with a pencil upon my white *ihram*.

III.

(*a*) They started and went on side by side. For two days they journeyed through the woods, Staines shooting wild animals for their food. One afternoon, he was just raising his Enfield rifle to shoot an eland, when the Hottentot whispered hastily, "No, no, no!" Staines turned round to look at him. His face was ashy, his teeth chattering, his limbs shaking.

(*b*) Before Staines could ask him what was the matter, he pointed through an opening in the wood near the eland. Staines looked, and saw what seemed to him a very long dog crawling from tree to tree. This creature, having got to the skirt of the wood, expanded, by some strange magic, to an enormous size, and sprang, into the open with a growl—a mighty lion. A bound carried him to the eland, and he struck her one blow on the head with his terrible paw, and felled her as if with a thunderbolt.

(*c*) The lion looked towards the wood and uttered a dreadful roar. Staines recoiled, and his flesh crept, whilst the Hottentot slid into the river and remained there. The lion began tearing away at the eland, and bolting huge morsels greedily. Hyenas, jackals, and vultures came around, but dared not approach too near. Having finished his meal, the lion stalked into the wood.

Staines asked the Hottentot which he thought was the lord of all creatures, a man or a lion.

"A lion," said he, amazed at such a shallow question.

(*d*) The lion heard their voices, and made straight for them from a distance of scarcely thirty yards. Staines shouldered his rifle, took a hasty aim, and sent a bullet at him. Instantly the enraged beast uttered a terrific roar, and came at him with his mane distended, his eyes glaring, his mouth open, his whole body swelled with fury.

(*e*) Staines kneeled, and levelled at the centre of the lion's chest; not till he was within five yards did he fire. Through the smoke he saw the lion in the air above him. With a cry he rolled himself down the bank into the river, and lay there trembling.

IV.

(*a*) A royal family, said to be descended from the Moon, and hence called the lunar race, had removed from Prayag (or Allahabad) to Hastinapura, a town on the Ganges, not very far from the site of the modern Delhi. Bharata had been king of this city, and was ancestor of two brothers——the younger named Pandu, and the elder Dhritarashtra. Pandu ruled the kingdom successfully for some time; but at length abdicated,

and retired with his wife and his five sons (the Pandavas) to the jungles of the Himalayas. Dhritarastra succeeded to the throne in his brother's absence. Before long Pandu died in his mountain retreat; and his widow Kunti and his five sons, the Pandavas—Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva—returned to Hastinapur, to the protection of Raja Dhritarashtra. The Raja had a hundred sons (the Kauravas or Kurus) of whom the eldest was Duryodhana; and there was great jealousy between the Pandavas and the Kurus, which was increased by the nomination of Yudhishthira, as Yuvaraja or viceroy of his uncle the Raja, who was now blind. The tutor of all the young princes was a Brahman named Drona; who had come to live at Hastinapura, on account of an insult received from the king of Panchala, a neighbouring principality.

(*b*) The jealousy at length grew to such a pitch that Dhritarashtra was persuaded to send away the Pandavas to Varanavata (the modern Allahabad). Here their cousin Duryodhana, the eldest of the Kauravas, endeavoured to destroy them by burning their house; but they fled, and were enabled to get away safely by a report that they had been burnt in the fire.

(c. In the meantime Drupada, the king of Panchala, had proclaimed a Swayamvara, to find a husband for his beautiful daughter Draupadi. The Pandavas attended ; Arjuna won the lady, who became the joint wife of the five brothers. In consequence of this powerful alliance, the Kauravas agreed to give up to the Pandavas a part of the realm of Hastinapura ; and the latter built a capital for themselves at Indraprastha, the site of the modern Delhi.

I.

(*a*) রাজাসাহেব আর্কট দুর্গ অবরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উহা অবরোধ সহনে সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। প্রাচীর-গুলি ভগ্নপ্রায়, পয়ঃপ্রণালী সকল শুষ্ক এবং মৃত্তিকাময় পোস্তাগুলি এত অপ্রশস্ত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কামানগুলি প্রবেশ করাইতে পারা যাইত না এবং ফাটা দেয়াল সকল এত নীচু ছিল যে, সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিত না। দুর্গস্থ অল্পসংখ্যক লোক দৈব-দুর্ব্বিপাকে বিলক্ষণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা (এই সৈন্যদল) এক্ষণে ১২০ জন ইংরাজ এবং দুই শত সিপাহি দ্বারা সংগঠিত ছিল। কর্ম্মচারীর মধ্যে কেবল মাত্র চারিজন অবশিষ্ট ছিল ; ভাণ্ডারে খাদ্য সামগ্রী অল্প পরিমিত ছিল এবং যে অধিনেতা এইরূপ নিরুৎসাহ-জনক অবস্থায় দুর্গ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি কেরানিগিরি বা হিসাবপত্র রাখার কার্য্যে শিক্ষিত পঁচিশ বৎসর-বয়স্ক যুবা।

(*b*) পঞ্চাশ দিন ব্যাপিয়া দুর্গ অবরোধ চলিতে লাগিল। যুবা সৈন্যাধ্যক্ষ এই পঞ্চাশ দিন এরূপ অটল সাবধান ও দক্ষতার সহিত দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন যে, (এরূপ কার্য্যে) য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ

সেনানায়কের মুখ ও উজ্জ্বল হইত। যাহা হউক, প্রাচীর-ভঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুর্গস্থ লোকেরাও ক্ষুধায় কাতর হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় যে কোন সৈন্যদল এত অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচালিত হইলে অবাধ্যতার লক্ষণ প্রদর্শন করিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারিত; এবং বিপদের আশঙ্কা বিশেষ গুরুতর ছিল, কেন না, এই সেনাদল পরস্পর বহু পরিমাণে বিভিন্ন জাতি বর্ণ ভাষা আচার ব্যবহার-সম্পন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের দ্বারা সংগঠিত ছিল। কিন্তু সীজারের প্রতি তাঁহার দশম অক্ষৌহিণীর যেরূপ ভক্তি ছিল অথবা নেপোলিয়ানকে তাঁহার রক্ষিবর্গ যেরূপ ভক্তি করিত বলিয়া বর্ণিত আছে, এই সেনা-নায়কের প্রতি তদীয় সৈন্যদলের তদপেক্ষা অধিক ভক্তি ছিল। সিপাহীরা ক্লাইভের নিকট তাহাদের অল্পপরিমিত আহার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিতে আসে নাই, প্রত্যুত তাহারা প্রস্তাব করিয়াছিল, অন্ন সমস্তই য়ুরোপীয়গণকে দেওয়া উচিত, এসিয়াবাসীদিগের অপেক্ষা তাহাদের অধিক পুষ্টি আবশ্যক। তাহারা বলিয়াছিল 'ভাতের ফেনগুলিই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে'। সৈন্যগণের অনুরাগের কিংবা লোক-শাসনক্ষম মানসিক তেজের এতদপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নাই।

(*c*) মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তৃগণ উক্ত স্থানে সাহায্য করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু উহা বিফল হইয়াছিল। কিন্তু অপর এক অঞ্চল হইতে আশা ছিল। মুরারিরাওনামে এক দলপতির অধীন ছয় সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে মহম্মদআলির সাহায্যের জন্য অর্থদ্বারা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্দ্ধ-যোদ্ধা, অর্দ্ধদস্যু ছিল; কিন্তু ফরাসী-গণের ক্ষমতা অপ্রতিরোধনীয় এবং চাঁদসাহেবের বিজয় লাভ নিশ্চিত মনে করিয়া তাহারা একবৎসর কাল কর্ণাটের সীমান্ত প্রদেশে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছিল। আর্কট রক্ষার খ্যাতি জড় বা নিস্পন্দভাব

হইতে তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। মুরারিরাও প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইতঃ পূর্ব্বে কখনও বিশ্বাস করেন নাই যে, ইংরাজগণ যুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু (এখন) তিনি তাহাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য করিবেন, যে হেতু তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের স্বয়ং নিজদিগকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি ছিল।

II

(*a*) বিখ্যাত কৃষ্ণ প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে আমি সাতবার প্রদক্ষিণ করিলাম এবং ইহাকে চুম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র মহতী জনতার মধ্যদিয়া সবলে আমি আমার জন্য একটি পথ করিয়া লইলাম। ইহাকে চুম্বন করিবার সময়ে এবং ইহাতে হস্ত ও ললাট ঘর্ষণ করিবার কালে ইহা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, আমার বিশ্বাস হইল, ইহা একটি উল্কাপিণ্ড। এই সময়ে যাত্রিগণ উত্তাপজনক রৌদ্রে অনাবৃত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল এবং হস্তও মস্তক দগ্ধপ্রায় হওয়াতে (দারুণ) যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল।

(*b*) অবশেষে আমাদিগকে যাত্রীদের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে দেওয়া হইল। ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার ঠিক পূর্ব্বে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম, আমার সম্বন্ধে কিছু ঘটিবে, এখন লোকে আমার প্রতি সন্দেহ করিয়াছে। একদল লোক মস্জিদের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল এবং এইরূপ চীৎকার উত্থিত হইল—হজকারীদিগের যাহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, (তাহাদিগের) পথ দাও। দুই জন বলবান্ মক্কাবাসী দরজার নীচে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আমাকে হস্তদ্বারা উঁচু করিয়া ধরিল এবং উপর হইতে তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে পবিত্র গৃহের মধ্যে টানিয়া তুলিল।

(*c*) প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান 'কৃষ্ণবর্ণ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা আমি সম্ভাষিত হইলাম। তাহারা আমার নাম জাতি এবং অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিল; (আমার) উত্তর সন্তোষজনক হইয়াছিল এবং গৃহের

চতুর্দ্দিকে আমাকে লইয়া যাইতে ও প্রার্থনা পাঠ করাইতে একটি বালক আদিষ্ট হইল।

(*d*) আমি ইহা অস্বীকার করিতে পারিনা যে, বাতায়ন-শূন্য প্রাচীর, দ্বারে কর্ম্মচারিগণ এবং নীচে উত্তেজিত মুসলমানদিগকে দেখিয়া আমি নিজেকে ফাঁদে পতিত ইন্দুরের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছিলাম। একটি ভ্রম, একটি অবিবেচনার কার্য্য অথবা একটি অন্যায় কথা উচ্চারিত হইলে আমার অস্থি সকল মরুভূমির বালুকারাশিকে শ্বেতবর্ণ করিত; কিন্তু যাহা হউক, দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী উপাসনার সময়ের ঐ দৃশ্যটি সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও আমার শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদের উপরে পেন্সিলদ্বারা ঐ অট্টালিকার মোটামুটি নক্সা গ্রহণ করিতে ঐ অবস্থা আমাকে বিরত করে নাই।

III

(*a*) তাহারা যাত্রা করিল এবং পাশাপাশি হইয়া যাইতে লাগিল। বনের মধ্যদিয়া তাহারা দুই দিন গমন করিল। ষ্টেন্স তাহাদের আহারের জন্য বন্যপশু শীকার করিত। একদিবস বিকালে যখন সে একটি কৃষ্ণসার শীকার করিবার জন্য বন্দুক তুলিতেছিল, তখন ঐ হটেণ্টট্ লোকটি তাহার কাণে কাণে বলিয়াছিল "না, না"। ষ্টেন্স তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল, (তখন) তাহার (হটেণ্টটের) মুখ মণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছিল, দন্ত (ভয়ে) কট্ কট্ শব্দ করিয়াছিল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপিতেছিল।

(*b*) কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ষ্টেন্স তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে কৃষ্ণসারের নিকটে বনমধ্যে একটি খোলা যায়গার দিকে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিল। ষ্টেন্স দেখিল এবং তাহার নিকট বোধ হইল যেন একটি অত্যন্ত দীর্ঘকায় কুকুর এক গাছ হইতে অন্যগাছের নিকট হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে। এই জন্তুটি বনের প্রান্তভাগে

উপস্থিত হইয়া কোন আশ্চর্য্য মায়াদ্বারা বৃহৎ আকৃতি ধারণ করিল এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে খোলা যায়গায় লাফাইয়া পড়িল। ঐ (জন্তুটি) একটি বলশালী সিংহ। সে একলম্ফে কৃষ্ণসারের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার ভয়ঙ্কর থাবা দ্বারা কৃষ্ণসারের মস্তকে একটি আঘাত করিল এবং যেন একটি বজ্রাঘাতে তাহাকে ভূপতিত করিল।

(*c*) সিংহটি বনের দিকে দৃষ্টি পাত করিল এবং একটি ভয়ানক গর্জ্জন করিল। ষ্টেন্স (ভয়ে) পশ্চাৎপদ হইল, তাহার মাংস জড়সড় হইল এবং ঐ হটেণ্টট্ নদীর দিকে গেল এবং সেখানেই রহিল। সিংহ কৃষ্ণসারকে খণ্ডখণ্ড করিতে লাগিল এবং আগ্রহের সহিত বড়বড় খণ্ড গিলিতে লাগিল। তরক্ষু শৃগাল এবং শকুনি সকল চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল কিন্তু অধিক নিকটে যাইতে সাহস করিল না। আহার শেষ করিয়া সিংহ সগর্ব্বে বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

ষ্টেন্স ঐ হটেণ্টট্কে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার বিবেচনায় সমস্ত প্রাণীর রাজা কে? মানুষ কিংবা সিংহ?

ঐরূপ সামান্য প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে বলিল—"সিংহ প্রাণিগণের রাজা"।

(*d*) সিংহ তাহাদের কথা শুনিতে পাইয়া ছিল এবং ত্রিশ গজ ব্যবধান হইতে তাহাদের দিকে ঠিক সোজাসুজি আসিতেছিল। ষ্টেন্স তাহার বন্দুক স্কন্ধে স্থাপন করিল ও তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করিল এবং তাহার (সিংহের) প্রতি একটি গুলি নিক্ষেপ করিল। অনতিবিলম্বে ঐ কুপিত সিংহ একটি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিল এবং কেশর স্ফীত করিয়া তাহার দিকে আসিতে লাগিল। তাহার চক্ষু জ্বলিতেছিল, সে মুখ ব্যাদান করিল এবং তাহার সমস্ত শরীর ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

(*e*) ষ্টেন্স জানুপাতিয়া বসিল এবং ঐ সিংহের বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে লক্ষ্য করিল। সে (সিংহ) পাঁচ গজের মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত ষ্টেন্স

বন্দুক ছোড়ে নাই। ষ্টেন্দ ধূমের মধ্যদিয়া তাহাকে (সিংহকে) শূন্যে তাহার উপর দেখিয়াছিল। সে চীৎকার পূর্ব্বক তীরভূমি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নদীর মধ্যে পতিত হইল এবং সেখানে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল।

IY

(*a*) চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া চন্দ্রবংশনামে খ্যাত এক রাজবংশ প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হইতে আসিয়া অধুনাতন দিল্লীর অনতিদূরে ভাগীরথী তটবর্ত্তী হস্তিনাপুর নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। ভরত এই নগরীর অধিপতি এবং দুই ভ্রাতার আদিপুরুষ ছিলেন,—কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম পাণ্ডু এবং জ্যেষ্ঠের নাম ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডু কিছু কাল ব্যাপিয়া অব্যাহত-প্রভাবে রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন। কিন্তু অবশেষে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ মহিষী ও স্বীয় পঞ্চপুত্র (পাণ্ডবগণ) সহ হিমগিরির অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় ভ্রাতার অনুপস্থিতি কালে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে পাণ্ডু পার্ব্বতীয় নিভৃত প্রদেশে মানবলীলা সংবরণ করেন। এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী পতিবিরহিতা কুন্তীও তদীয় পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব—যুধিষ্টির, ভীম অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব হস্তিনাপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ রাজার এক শত তনয় (কৌরব বা কুরু বলিয়া অভিহিত) ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দুর্য্যোধন ; কুরু পাণ্ডবের মধ্যে প্রবল ঈর্ষ্যাভাব জন্মিয়াছিল, এবং যুধিষ্টির যৌবরাজ্যে বা তদানীং রাজ্যেশ্বর অন্ধ জ্যেষ্ঠ তাতের প্রতিনিধিরূপে অভিষিক্ত হওয়ায় উহা আরও প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। দ্রোণ নামক এক-জন দ্বিজ রাজকুমারগণের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি সন্নিহিত রাজ্য পঞ্চালের অধিপতি কর্ত্তৃক অবমানিত হওয়ায় হস্তিনাপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

(*b*). অবশেষে সেই ঈর্ষ্যাভাব এরূপ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল যে, ধৃতরাষ্ট্র নানাবিধ প্রবর্ত্তনায় পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে (অধুনাতন এলাহাবাদে) পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এখানে তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র কৌরব-জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন গৃহে অগ্নিসংযোগ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা পলায়ন করিলেন এবং তাঁহারা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন এই রূপ জনরব তুলিয়া অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন।

(*c*) এই সময়ে পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ পরমসুন্দরী স্বীয় তনয়া দ্রৌপদীর পতি নির্ব্বাচনের নিমিত্ত স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। পাণ্ডবেরা উপস্থিত হইলেন; অর্জ্জুন ঐ অভিজাতা কন্যা লাভ করিলেন এবং তিনি পঞ্চ ভ্রাতার সাধারণ ধর্ম্মপত্নী হইলেন। এই প্রবল সম্বন্ধ-হেতু কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরের কিয়দংশ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন; এবং পশ্চাদুক্ত ব্যক্তিরা (পাণ্ডবেরা) আপনাদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে (যেখানে অধুনা দিল্লীনগরী সংস্থাপিত হইয়াছে) এক রাজধানী স্থাপন করিলেন।

পরিশিষ্ট।

[QUESTIONS.]

[A]

HINDU SCHOOL

Half-yearly Examination, 1908.

Second class.—Bengali.

Full marks—100.

[Papersetter—Pandit Sarat Chandra Sastri.]

1. Translate the following into your Vernacular :—40

(*a*) Long, long ago, when the moon was still young, and some of the stars that we know best were only gradually coming into sight, the earth was covered all over with a tangle of huge trees, and gigantic ferns, which formed the homes of all sorts of enormous beasts. There were no men, only great animals and immense lizards, whose skeletons may still be found embedded in rocks or frozen deep down among the Siberian Marshes ; for after the period of fearful heat, when everything grew rampant, even in the very north, there came a time of equally intense cold, when every living creatures perished in many parts of the world.

(*b*) When the ice which crushed down life on the earth began to melt, and the sun once more had power to pierce the thick cold mists that had shrouded the world, animals might have been seen slowly creeping about the young trees and fresh green pastures, but their forms were no longer the same as they once were. The enormous frames of all sorts of huge monsters, had been replaced by smaller and more graceful creatures, who could move lightly and easily through this new world. But changed though it seemed to be, one beast still remained to tell the story of those strange old times, and that was the elephant.

(*c*) Now any body who has ever stood behind a big, clumsy cart-horse going up a hill cannot fail to have seen, struck with its likeness to an elephant ; and it is quite true that elephants and horses are nearly related. Of course in the East, where countries are so big and marches are so long, it is necessary to have an animal to ride of more strength and endurance that a horse, and so elephants, who are, when well treated, as gentle as they are strong, were very early trained as beasts of burden, or even as "men of war."

II. (*a*) Substitute one word for each the following :— 10

যাহা বুঝা যায় না। যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা সহ

করা যায় না। যাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু গলিত হইতেছে। যাহা জানা যায় নাই। যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যাহা করা উচিত নহে। যে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে না। দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায় যাহা। যে পরিণাম দেখে না।

(*b*) Rewrite the following sentences, making the changes indicated below :— 5

(1) সীতা জনকের তনয়া; তাঁহার হৃদয় একান্ত সরল ছিল। (write these as one simple sentence).

(2) যদি নিয়মিতরূপে বৃষ্টি হয়, পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। (Turn this into a simple one).

(3) জ্ঞানী লোকেরা পাপকার্য্য করেন না। (Turn this into a complex one).

(4) আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষাকুবংশে জাত মহানুভব নরপতিগণ অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজা পালন দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশ ত্রিলোক-বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। (Turn this into a compound sentence).

(*c*) Correct the errors in the following :— 5

(1) তিনি অত্যন্ত সন্তোষ হইয়া বলিলেন, আজ আমার দুরাবস্থা দুর হইল।

(2) বিচারক সাক্ষী গ্রহণ করিয়া অভিযুক্তকে মুক্তি দান করিলেন।

(3) সেই সকল নরপতিগণ নিরাশ হইয়া স্বয়ম্বর ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন।

(4) ঐ শক্তিশালী রমণী অকালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

III. Write an essay in your own vernacular on the following subject :— 40

"Slow and steady wins the race."

(The story of the hare and the tortoise——the moral of this story often illustrated in actual life—perhaps some men of great genius may be exceptions to the rule——many of great genius have, however, been celebrated for their persevering labour).

[ANSWERS.]

[A]

(পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)।

I (*a*) অতি প্রাচীন যুগে, যখন চন্দ্রের বাল্যকালও উত্তীর্ণ হয় নাই; যখন কেবল ইদানীন্তন কালে অত্যন্ত পরিচিত নক্ষত্রসকল ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথে উপনীত হইতেছিল, তখন বিশাল মহীরুহ ও ফার্ন-সমূহের বনরাজিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আবৃত ছিল; উহার মধ্যে সর্ব্ববিধ পশু বাস করিত। ঐ যুগে মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা, কেবল মহাকায় জন্তু ও অত্যন্ত বিপুলাকার গোধিকা-সমূহ বিদ্যমান ছিল। ঐ সমুদয় জন্তুর কঙ্কাল-রাশি অদ্যাপি প্রস্তর-স্তরের মধ্যে অথবা সাইবিরিয়ার জলাভূমির গভীরতম প্রদেশে তুষার-সংহত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সকল জীবই (সর্ব্বত্র) এমন কি উত্তরমেরু প্রদেশে ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিল, সেই ভয়ানক উষ্ণতার যুগ অতীত হইল, পৃথিবীতে আর এক পূর্ব্ববৎ দারুণ শীতের যুগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে পৃথিবীর অনেক প্রদেশে যাবতীয় প্রাণীর বিনাশ ঘটিয়াছিল।

(*b*) যখন পৃথিবীস্থ জীববর্গের বিনাশ-সংসাধক সংহত তুষাররাশি গলিতে আরম্ভ করিল এবং সৌর-কিরণ পৃথিবী আবরণকারী ঘন শীতল কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিতে সমর্থ হইল, তখন নানা জীবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে নবজাত হরিৎবর্ণ শস্পরাজির উপরে ইতস্ততঃ বিচরণশীল দেখা যাইতে পারিত কিন্তু ঐ সকল (জন্তুর) আকার আর পূর্ব্বের ন্যায় (বিপুল) ছিলনা। এই নূতন পৃথিবীতে অনায়াসে বিচরণসমর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সৌষ্টব-সম্পন্ন প্রাণিসকল পূর্ব্বের মহাকায় জন্তুসকলের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যদিও সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল, তথাপি ঐ অদ্ভুত প্রাচীন যুগের বিবরণ প্রকাশার্থে (মহাকায় জন্তু সকলের মধ্যে) এক জাতীয় জন্তু রহিয়া গেল। ঐ জন্তুই হস্তী।

(*c*) যিনি কথনও পর্ব্বতারোহণশীল বৃহৎ-পরিপাট্যবিহীন ভারবাহী অশ্বের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি ইহার সহিত হস্তীর সাদৃশ্য না দেখিয়া এবং হটাৎ স্মারিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এবং ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, হস্তী ও অশ্ব পরস্পরের সহিত অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। প্রাচ্য ভূভাগের এক একটি প্রদেশ অতি বড় এবং গমনাগমন দীর্ঘকাল-ব্যাপী, এই স্থানে অবশ্য আরোহণার্থে অশ্বাপেক্ষা অধিক বল ও সহিষ্ণুতা-সম্পন্ন জন্তুর প্রয়োজন; হস্তী ভাল ব্যবহার পাইলে যেমন বলবান্ তেমনই ধীরপ্রকৃতি হয়। এ জন্য অতিপ্রাচীনকাল হইতেই এদেশে হস্তী ভার বহন, এমন কি যুদ্ধ কার্য্যের জন্য ও শিক্ষিত হইত।

II. (*a*) অবোধ্য, নিঃসন্দেহ, অসহ্য গলদশ্রু, অজ্ঞাত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অকর্ত্তব্য, অবিবেচক, দুস্তর, অপরিণামদর্শী।

(*b*) (1) জনক তনয়া সীতার হৃদয় একান্ত সরল ছিল।

(2) নিয়মিত রূপে বৃষ্টি হইলে পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে।

(3) যাঁহারা জ্ঞানী লোক, তাঁহারা পাপ কার্য্য করেন না।

(4) আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রজাপালন দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশ ত্রিলোক-বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

(c) (1) তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আজ আমার দুরবস্থা দূর হইল।

(2) বিচারক সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া অভিযুক্তকে মুক্তি দান করিলেন।

(3) সেই সকল নরপতি নিরাশ হইয়া স্বয়ম্বর-ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন।

(4) ঐ শক্তিশালিনী রমণী অকালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

*II. বাঙ্গালায় একটি চলিত কথা আছে ;—"সবুরে মেওয়া ফলে"। এই কথাটিতে তত অলঙ্কারের পরিপাট্য না থাকিলেও উহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বালক ও যুবকেরা সর্ব্ব বিষয়েই সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য এবং অপরের নিকট 'বাহবা' পাইবার জন্য প্রত্যেক কার্য্যে তাড়াতাড়ি করিয়া থাকেন কিন্তু অধিকাংশ সময় ঐরূপ তাড়াতাড়িতে কার্য্য সিদ্ধ হয় না অধিকন্তু চঞ্চলপ্রকৃতিও অসহিষ্ণুতার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। ধীরপ্রকৃতি ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন ব্যক্তিরা অল্পে অল্পে সহিষ্ণুতা সহকারে কার্য্য করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য ও যশোলাভ করিয়া থাকেন।

ধীরপ্রকৃতির লোকেরা যদিও সকল সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পরেন না, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই একেবারে বিফলমনোরথ হন না। চঞ্চল-প্রকৃতির লোকদিগের মধ্যে যদিও কেহ কেহ কখন কখন অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অকৃতকার্য্যের সংখ্যা ও নিতান্ত অল্প নহে। অনেককে ব্যস্ততা-প্রযুক্ত অনেক সময় সর্ব্ববিধ সফলতা এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারাই ধীর-প্রকৃতি ও চঞ্চলস্বভাব লোকের পরস্পর তারতম্য বুঝিতে পারা যায়।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, চঞ্চলপ্রকৃতির লোকে নিজের ক্ষমতার উপর অসাধারণ বিশ্বাস-হেতু 'পরে করিব বলিয়া' অনেক কার্য্য

ফেলিয়া রাখেন কিন্তু ধীরপ্রকৃতির লোক তাহা করেন না। তিনি ভাবেন 'আমি বড় ধীর, আমার এ কার্য্য করিতে অনেক সময় লাগিবে, অতএব এখনই আরম্ভ করা যাউক' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ করেন। শেষে দেখা যায়, চঞ্চলপ্রকৃতির লোকের অপেক্ষা ধীর-প্রকৃতির লোকের কার্য্য অগ্রে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে ;—

এক সময়ে এক খরগোস ও এক কচ্ছপে আপনাদের ক্ষমতা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে ছিল। খরগোস বলিল "ভাই আর বৃথা তর্কে প্রয়োজন কি? কল্য প্রত্যূষে দেখা যাইবে,উভয়ে এক সময়ে যাত্রা করিয়া কে অগ্রে প্রান্তরের অপর পার্শ্বে উত্তীর্ণ হইতে পারে।" পরদিন তাহারা পরামর্শমত কার্য্য করিল, উভয়েই প্রান্তর অতিক্রম করিবার জন্য এক সময়ে যাত্রা করিল। খরগোস দ্রুত-গতি প্রভাবে কচ্ছপ হইতে অনেক দূরে গিয়া ভাবিল, আমি যেরূপ দ্রুত চলিতে পারি, কচ্ছপ তাহার শতাংশের একাংশও পারেনা, এতএব আমি এই স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি, পরে চলিতে আরম্ভ করিব। তাহার পর, সে সেখানেই শয়ন করিল এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে কচ্ছপ অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া খরগোসের পূর্ব্বেই প্রান্তরের অপর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর খরগোস যখন আসিয়া পোঁছিল, তখন শুনিতে পাইল, কচ্ছপ তাহার বহু পূর্ব্বেই তথায় পোঁছিয়াছে।

এই রূপ নানা বিষয় হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক কার্য্যেই ধীরপ্রকৃতির লোকেরা চঞ্চলপ্রকৃতির লোক অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ধীরপ্রকৃতির লোকেরা সকল সময়েই পরিণাম চিন্তা করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হন কিন্তু চঞ্চলপ্রকৃতির লোক অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, অনেক সময় তাঁহাদের পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর ঘটেনা। এ জন্য

অপরিণাম-দর্শিতার ফল তাঁহাদিগকে হাতে হাতেই ভোগ করিতে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার বলবতী ইচ্ছা থাকায় চঞ্চলস্বভাব ব্যক্তিরা স্বভাবতই অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। ঐরূপ অসহিষ্ণুতার জন্য তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাদের কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হন না। যে বালক বাল্য কাল হইতেই চঞ্চলস্বভাব, সে ইহ জীবনে কখনই উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না এবং ব্যস্ততা সহকারে সোপানাবলী আরোহণ করিতে যেমন পদস্খলন হয়, তাহার ও কার্য্যকালে সেই দশা ঘটিয়া থাকে। অধ্যবসায়ই উন্নতির মূল। চঞ্চলপ্রকৃতির লোকে কদাচিৎ অধ্যবসায় লাভ করিতে পারে। এই রূপ নানা বিষয় হইতে আমরা দেখিতে পাই, ধীর-প্রকৃতি ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। অতএব আমাদের শৈশব হইতেই ধীরপ্রকৃতি হওয়া উচিত।

[শ্রীরামনাথ সেনগুপ্ত]

——o——

[B]

Entrance Examination, 1907.

Paper set by—Rai Rajendrachandra Sastri, Bahadur, M. A.

Subject for original composition in the vernacular of the candidate. 20

The respective duties of teacher and pupil.

——o——

[ANSWERS.]

[B]

(সংশোধিত)

যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা মানবের অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত শিক্ষকপদবাচ্য—ইহাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। অতএব শিক্ষক-পদটী যে এক অত্যন্ত মর্য্যাদাসূচক তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শিক্ষকপদটী মহত্ত্বের পরিচায়ক; সুতরাং শিক্ষকের কতকগুলি অসাধারণ গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মানবের জ্ঞান ও ধীশক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, তাঁহার জ্ঞানের ও মেধার একটি সীমা আছে। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ভিন্ন কাহারও একাধারে সর্ব্ববিধ জ্ঞান সম্ভবেনা। ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিউটন্ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "জ্ঞান অনন্ত, জ্ঞান-সমুদ্র অতলস্পর্শ ও অলঙ্ঘনীয়; তিনি সেই জ্ঞান সমুদ্রের কূলে বসিয়া কতকগুলি উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছেন।"

কেহই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হন না। সুতরাং শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন, সে বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, অনেক সময়ে অযোগ্য শিক্ষককে শিক্ষা দান করিতে গিয়া সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইতে হয়। শিক্ষকের দায়িত্ব মহান্। তাঁহার সেই দায়িত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, নচেৎ তাঁহার যে মর্যাদার হানি হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। শিক্ষকের ছাত্রগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার সহানুভূতি এই প্রকার হওয়া উচিত, যাহাতে ছাত্রগণ তাঁহার সেই ভাব বুঝিতে পারে। শিক্ষকগণের

উচিত যে, তাঁহারা ছাত্রগণকে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় যথাশক্তি সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন। যদি কোন ছাত্র তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হন, তাহাতে ছাত্রের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সস্নেহে সরলভাবে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

শিক্ষকের কেবল মাত্র পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। ছাত্রগণ যাহাতে চরিত্রবান্ হয়, সে বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্রগণকে চরিত্রবান্ করিতে হইলে শিক্ষকের চরিত্র ও সৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, ছাত্রগণ যাহা দেখিবে তাহাই অনুকরণ করিবে,অতএব যদি তাহারা শিক্ষকের সৎচরিত্র দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই তাহার অনুসরণ করিবে। শিক্ষক নানারূপ কৌশলে ছাত্রদিগকে চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন এবং দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিবেন। অতিমৃদুতা বা অতিকঠোরতাদ্বারা ছাত্র-শাসন অনুচিত। স্নেহের দ্বারা ছাত্রকে আপনার বশে আনিতে হয়। বস্তুতঃ বেত্রাঘাত প্রভৃতি কঠোর শাসন অপেক্ষা যত্ন ও স্নেহের দ্বারা ছাত্র শাসন করিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মঙ্গল। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিলে সে ব্যক্তি ও তৎপ্রতিদানে তাঁহাকে স্নেহও ভক্তি করেন। শিক্ষক যদি ছাত্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাহা হইলে ছাত্র ও শিক্ষককে পিতৃবৎ ভক্তি ও সম্মান করিবে। শিক্ষকের নিষ্কামভাবে ছাত্রের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করা উচিত এবং অনেকেই তাহা করিয়া থাকেন।

পাঠাভ্যাস যদিও ছাত্র জীবনের প্রধান কর্ম্ম কিন্তু ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যা লাভের সহিত সৎচরিত্র লাভও আবশ্যক। বস্তুতঃ সৎচরিত্র ব্যতীত জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। সকল ব্যক্তিই কিছু বিদ্বান্ হন না, কিন্তু সকলেই চরিত্রবান্ হইতে পারেন। সৎচরিত্র সদভ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ছাত্রাবস্থায়ই সদভ্যাসের

উৎকৃষ্ট সময়। কারণ, সেই সময়ে মন সরল থাকে এবং সদভ্যাস অতি সহজেই উৎপন্ন হয়। সৎশিক্ষা ও সৎচরিত্র লাভ করিতে হইলে ছাত্রের সর্ব্ব প্রথম বাধ্যতা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক; যেহেতু বাধ্যতা ব্যতীত ছাত্রের জ্ঞান লাভ একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। ছাত্র স্বেচ্ছাচারী হইলে যে কেবল মাত্র শিক্ষালাভে ব্যাঘাত হয় এমন নহে, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎজীবনের সকল প্রকার উন্নতির পথে অর্গল পড়ে এবং নানারূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় বিপদ্ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে। অতএব বাধ্যতা-শিক্ষার উপকারিতা সহজেই অনুমেয়।

তাহার পর, জ্ঞানলাভেচ্ছা ও একাগ্রচিত্ততা অতীব প্রয়োজনীয়। প্রবল ইচ্ছা ও একাগ্রচিত্ততার দ্বারা ইহ জগতে সকল প্রকার কার্য্যই সুসম্পন্ন হয়। বিদ্যার্থীর এই কথাটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন লোকই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ নহেন; সকল লোকেরই জ্ঞানের এক একটি সীমা আছে এবং সকলেই ভ্রমে পতিত হন। অতএব যদি কোন ছাত্র কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন কিংবা যদি তিনি কোন বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারেন, সে বিষয় অন্য লোককে জানাইতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কোন ও কারণ নাই। যেমন ক্ষতস্থান অনাবৃত না করিলে উহার চিকিৎসা হয় না, সেই রূপ অজানিত বিষয় শিক্ষক অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাত না করিলে শিক্ষা পূর্ণ হয় না। অতএব ছাত্রগণের আপন আপন দুর্ব্বলতা বিনা আপত্তিতে শিক্ষককে অথবা অন্য ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা আবশ্যক।

"শিক্ষক পিতৃবৎ পূজনীয়; শিক্ষাগুরু ঐহিক পারত্রিক উভয় লোকের মঙ্গল করেন। শিক্ষক জ্ঞানের পথপ্রদর্শক; তিনি আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত করেন। শিক্ষক যে বিদ্যা দান করেন, সেই বিদ্যাবলেই আমরা ইহ জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করি এবং সেই বিদ্যা-বলেই ধর্ম্মজ্ঞান লাভ

করিয়া পর জগতের মঙ্গল সাধন করি। সেই গুরু, সেই শিক্ষক, যাঁহার কৃপায় যাঁহার বিদ্যা দানের ফলে আমরা ঐহিক পারত্রিক উভয় লোকেই সুখভোগ করি, তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা কি আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে? অনেকে বলেন "তাঁহারা শিক্ষককে বেতন দেন, সেই জন্যই তিনি শিক্ষা দান করেন, তাঁহারা বেতনভোগী ভৃত্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন।" একথা নিতান্ত অসঙ্গত ও অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্বে যখন ভারতে হিন্দুরাজ্য ছিল, যখন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা এত কঠিন ছিলনা এবং শিক্ষকগণ নৃপতিগণের নিকট হইতে শিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত সাহায্য পাইতেন, তখন তাঁহারা ছাত্রগণের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না, অধিকন্তু ছাত্রদিগের পাঠাবস্থায় ভরণপোষণের ভারও তাঁহারা অকাতরে গ্রহণ করিতেন। অধুনা তাঁহারা সে সহায়তা পাননা, সুতরাং জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ বেতন গ্রহণ করেন; কিন্তু বস্তুতঃ সে বেতন তাঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্মের কণামাত্রও প্রতিদান করে না। অতএব ছাত্রগণের শিক্ষকের প্রতি আজীবন পিতৃবৎ ভক্তি ও সম্মান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, শিক্ষক স্বভাবতই অনুগত ছাত্রকে স্নেহ ও যত্ন না করিলে তাহার বিদ্যা শিক্ষা সুসম্পন্ন হয় না।

[শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র আইচ্]

——o——

[C]

First Examination In Arts, 1907.

Bengali Composition.

(Optional Paper).

Paper set by—Babu Dineschandra Sen, B. A.

The figures in the margin indicate full marks.

Answers to be always in Bengali.

Write essays on any two of the following subjects:—

(*a*) The seasons of India—their duration—their bearing on domestic life, trade, and prices of articles—games and festivities of the seasons—their crops, fruits, and flowers—diseases peculiar to each season and rules of health to be observed to avoid them. 50

(*b*) The Bengali author you like best—reasons for your preference—his life—his principal works and their contents—his position in literature as compared with that of his contemporaries—his influence on the literature of his country. 50

(*c*) Your own native village—its situation and surroundings—its sanitation, water-supply, and drainage—means of communication—educational institutions—its past history——any objects of antiquarian interest that it may possess—its inhabitants—their education—their religion, customs, and amusements—any industry 50

or produce for which the place may be noted—suggestions for improving its condition.

(*d*) Strength of character—how it helps to attain success in life—a man of ordinary talents with character compared with a man of genius without it—character more potent than wealth—its attendant virtues—perseverance—moral courage and self-help—the relation of character to spirituality—examples in illustration. 50

(*e*) The study of history—its influence on the progress of individuals and nations. Discuss the remark usually made that the Hindu mind is averse to the study of history. 50

—o—

[সংশোধিত]

[ANSWERS.]

[C]

(*a*) আমাদের দেশে ছয়টী ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র আশ্বিন শরৎ, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ মাঘ শীত ও ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত কাল।

ভারতের গ্রীষ্মকাল বড় কষ্ট-দায়ক। বৃক্ষে সুন্দর পল্লব নাই, সরোবরে শীতল জল নাই, প্রান্তরে শ্যামল সুকোমল তৃণ নাই, সূর্য্যের নিষ্ঠুর প্রখর কিরণে সুজলা সুফলা জন্মভূমি যেন মরুভূমিতে পরিণত হন। সংসারের কাজ কর্ম্ম করা তখন দুরূহ হইয়া উঠে। বিদ্যালয়,আফিস সকল বন্ধ করিয়া সকলে গৃহের ভিতর একটু আরাম ও শান্তি লাভের চেষ্টা করে। প্রচণ্ড

গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই সময় কলিকাতার প্রায় সকল অবস্থাপন্ন লোকই কোন ও স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করেন। গ্রীষ্মকালটা যেন আমাদের দেশে বিশ্রামের সময়। এই সময়ে দ্বিপ্রহরে একবার পথে বাহির হইলে দেখা যায়, লোক চলাচল বেশী নাই, দোকানপাট একরূপ বন্ধ, মহানগরী ও তখন যেন নিদ্রায় অভিভূত। সকল জিনিষই তখন দুর্ম্মূল্য হয়।

সারা গ্রীষ্মকাল রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট ভূমিকে বর্ষাকাল শীতল জল ধারা-সেচনে স্নিগ্ধ করে। ঘন ঘোর মেঘজালে আকাশ আচ্ছন্ন, চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিবার উপায় নাই। রাত্রি নাই, দিন নাই, অবিরল জলধারায় চারিদিক্ প্লাবিত। তখন লোকের কাজ কর্ম্মের বড়ই ব্যাঘাত হয়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া কর্দ্দমাক্তপথে কর্ম্মস্থানে যাইতে হয়। দোকান বাজারের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়।

আবার ঘনঘোর মেঘজাল কাটিয়া শরৎ হাসিমুখে দেখা দেয়। শরৎকালে ভূমি নূতন শোভা ধারণ করে। সুনীল আকাশ, সুশীতল বায়ু, শ্যামল ধরাতল আবার মনকে আনন্দিত করে। এই জন্যই আমাদের দেশের কবিগণ শরৎ কালের নামে-এত মুগ্ধ। এ সময়ে বাজারের অবস্থা খুবই ভাল, কারণ সকলে এ সময় শারদীয়-পূজার আয়োজনে ব্যস্ত।

হেমন্ত কাল হইতেই আমরা শীতের আগমনের সংবাদ পাই। শরৎকালের হাসিমুখ কুয়াশায় ঢাকিয়া যায়, বৃক্ষ লতার মনোহর পল্লব কোথায় লুকায়! চারিদিক্ যেন নিরানন্দ হইয়া পড়ে।

শীতকাল আসিয়া কুয়াসার জালে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া বসে। আমাদের দেশে শীত, গ্রীষ্মের ন্যায় ভীষণ রূপ ধারণ করেনা—শীতের সময় সংসারের কাজ যথারূপই চলিতে থাকে।

বসন্তকাল আমাদের দেশে "ঋতুরাজ।" বসন্তের কোকিলকূজন, মলয় পবন, আম্রমুকুলের সৌরভ চিরকালই কবিতাতে গীত হইয়া থাকে।

বিদেশে অনেক স্থানে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া আমোদ প্রমোদ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমাদের দেশে সেরূপ নাই। তবে বিলাতের অনুকরণে এখানেও গ্রীষ্মকালে ফুটবল, শীতকালে ক্রীকেট্ ও বসন্তে হকি ইত্যাদি আরম্ভ হইয়াছে। বৎসরের প্রথম উৎসব "নববর্ষ"। কিন্তু বিলাতের 'নববর্ষ' উপলক্ষে যেরূপ উৎসবের বিপুল আয়োজন হয়, আমাদের "নববর্ষে" আমরা সেরূপ করিনা। গ্রীষ্মকালে মুসলমানদিগের 'মহরম' একটী প্রধান উৎসব। বর্ষাকাল উৎসবাদির পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। শরৎকালে হিন্দুদিগের প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব। এই সময়ে সমস্ত ভারত বিশেষতঃ বঙ্গদেশ উৎসবামোদে মত্ত থাকে। শঙ্খ, ঘণ্টা, ধূপ দীপ, ফুল, চন্দনে চারিদিক্ ভরিয়া যায়। হেমন্তকালে কোনও বিশেষ উৎসব নাই। শীতকালে "মাঘোৎসব" ব্রাহ্মদিগের প্রধান উৎসব, কিন্তু ইহা এখনও দেশব্যাপী হয় নাই। শরৎকালে বিজয়ার দিন একটী বিশেষ উৎসবের দিন।

শস্য ও ফুল ফলাদির মধ্যে গ্রীষ্মকাল আম্র কাঁটাল, শরৎকালে পদ্মফুল হেমন্তকালে হৈমন্তিক ধান্য, বসন্তকাল নানাবিধ নূতন পুষ্প পল্লবের জন্য বিখ্যাত। বিশেষতঃ বসন্তের আম্রমুকুল সকলের সুপরিচিত। যেরূপ প্রত্যেক ঋতুর বিশেষ উৎসব আমোদাদি ও বিশেষ শোভা আছে, সেই রূপ প্রত্যেকরই বিশেষ রোগ আছে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে "প্লেগ" আজ কাল সহস্র সহস্র জীবন নাশ করিয়া থাকে। বসন্তের প্রাদুর্ভাব ও এই সময়ে হইয়া থাকে। এই সকল মহামারী হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ট উপায়। গ্রীষ্মের তাড়নায় অনেকেই এ সময়ে অনাবৃতদেহে থাকেন কিন্তু তাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইতে পারে।

বর্ষাকাল সর্দ্দি, কাশী, জ্বর, ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে সকলেরই উপযুক্ত রূপে শরীরকে আবৃত রাখা উচিত। শরৎ ও

হেমন্ত কালে প্রায় লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। শীতকালে ঠাণ্ডার জন্য সর্দ্দি ইত্যাদি হইতে পারে। এসময়ে সর্ব্বদা শরীর আবৃত রাখা উচিত। শীতকালে প্রায়ই বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বসন্তকালই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও স্বাস্থ্যকর সময়। এসময়ে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

[শ্রীমতী পুণ্যলতারায়]

—o—

(৮) বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে এ পর্য্যন্ত কত নক্ষত্র উদিত হইয়া বঙ্গদেশের সাহিত্য-ভূমি উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূজ্যপাদ ৺ বঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়ই আজ পর্য্যন্ত সমভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলির প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে কি সুমহান্ গম্ভীর-গবেষণা-পূর্ণ ভাব নিহিত রহিয়াছে—প্রত্যেক পুস্তকই যেন মানবকে মহা উপদেশ প্রদান করিতেছে। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে বোধ হয় ইঁহার মতন আর কোন লেখক সমর্থ হন নাই। মানব-সমাজের বিভিন্ন চিত্র লইয়া নিখুঁৎ ছবি আঁকিতে বাঙ্গালায় বোধ হয় ইহার মতন আর কেহ আজ পর্য্যন্ত পারেন নাই। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকেই বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত আলোচনা করিবার যথেষ্ট বিষয় আছে। আমরা ক্ষুদ্র জীব, যে লেখক মানবচরিত্র বিভিন্নরূপে বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার পুস্তকাবলী পাঠে আমরা আমাদের চরিত্র বিশেষরূপে জানিতে পারি, তাঁহাকে লেখকমণ্ডলীর উচ্চতম শিখরে নিশ্চয়ই আসন দিব। এই জন্যই বলি, বঙ্গীয়-সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা অনন্তকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান বঙ্কিমের।

এই মহাত্মা নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কাঁটালপাড়া-গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, ইঁহার মধ্যে এক মহাবৃক্ষের বীজ বর্ত্তমান আছে। ইনি বাল্যকাল হইতে অধ্যবসায়ীও পরিশ্রমী ছিলেন। ইনিই

বঙ্গদেশের প্রথম "গ্রাজুয়েট"—যখন ইনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন কলিকাতায় তোপ ধ্বনিত হইয়াছিল। পরে ইনি বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। বিদ্যালয়ে পাঠাবস্থায় ইনি যে সকল কবিতা ও গদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইত যে, ইনি একজন প্রতিভাশালী লেখক রূপে পরিগণিত হইবেন। কৃষ্ণকান্তের উইল্ ইহাঁর অমরকীর্ত্তি। মানব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ হইয়া রূপজমোহে কিরূপ অবস্থায় পতিত হয় 'গোবিন্দলাল' তাহার জলন্ত চিত্র; 'রোহিণীর' ন্যায় পাপীয়সীকে যে সর্ব্বথা ত্যাগ করা উচিত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কৃষ্ণকান্তের উইলে আছে। ভ্রমরের ন্যায় পতিপরায়ণা হইবার চেষ্টা করা সমস্ত বঙ্গীয় নারীর প্রধান কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তের ন্যায় বিচক্ষণ ও দুরদর্শী হওয়া যে প্রত্যেক গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য একথা বলা বাহুল্য।

তাহার পর চন্দ্রশেখর। পরের সুখের জন্য আত্মবলিদান প্রতাপের মতন আর কেহ দিতে পারে নাই। বাল্যাবস্থা হইতে শৈবলিনী ও প্রতাপ একপ্রাণ ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত পড়িল, যৌবনে দুই জনকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ হইল ও প্রতাপের সহিত অন্য এক নারী 'সুন্দরীর' বিবাহ হইল। কিন্তু নারীচরিত্র অতীব কোমল, শৈবলিনী এ বিচ্ছেদ সহিতে পারিল না। প্রতাপকে পাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রতাপ ধার্ম্মিক মহাপুরুষ, তিনি শৈবলিনীর সুখের জন্য শৈবলিনীকে তাঁহার চিন্তা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন। যখন ফষ্টর সাহেবের নৌকা হইতে শৈবলিনী গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দেয় ও প্রতাপের সহিত সন্তরণ করিতে থাকে, তখনকার প্রতাপের কথাগুলি মনে হইলে কি উচ্চভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন প্রতাপকে ভুলিবার প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারিলনা, নারীচিত্ত অতিকোমল;

তাহাতে একবার যাহা অঙ্কিত হয়, তাহা সহজে উঠেনা, তাই প্রতাপ শৈবলিনীর সুখের পথে (এস্থলে সুখ অর্থে গৃহসুখ বলা হইতেছে; গৃহে পতিসহ একত্র বাসই নারীজীবনের উচ্চতম সুখ ও পতি-সেবাই নারীর উচ্চতম ধর্ম্ম) কণ্টক না হইয়া যুদ্ধে স্বীয় প্রাণ বলি দিল। পরের জন্য আত্ম বলিদানের এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাই লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন "তবে যাও প্রতাপ! অনন্তধামে; যেখানে রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাই, তথায় যাও; তথায় লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভাল বাসিতে চাহিবে না।" প্রতাপের ন্যায় অবস্থায় আত্মত্যাগে যে স্বর্গলাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহারপর বিষবৃক্ষ। বিষবৃক্ষে সূর্য্যমুখী আদর্শ হিন্দুরমণী। সে স্বামীর সুখের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। আর, কুন্দের ন্যায় বালবিধবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এরূপ শত শত বালবিধবা হিন্দুর সোণার সংসারে আগুন লাগাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্য হিন্দু বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেয়ঃ।

তাহার পর, আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমের পরিচায়ক। এই আনন্দমঠের মহামন্ত্র লইয়া আজ আবার বঙ্গদেশে এক নূতন যুগ আসিয়াছে। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, কল্যাণী ও শান্তি প্রত্যেক চরিত্রেই শিক্ষার যথেষ্ট আছে।

তাহার পর সীতারামে শ্রী ও জয়ন্তী দুইটি চরিত্রই লক্ষ্য করিবার যোগ্য। স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রী সন্ন্যাসিনী হইলে কি কুফল ফলে শ্রীতে তাহা দেখা যায়। জয়ন্তী গৃহলক্ষ্মী পরিপরায়ণা রমণী।

তাহার পর, কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমবাবু যেরূপভাবে কৃষ্ণের চরিত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠে কোন্ হিন্দুর প্রাণে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হয় না? আজ কাল্ উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানি না, একটা হীনচরিত্র লোক বলিয়া স্বভাবতঃ গণ্য করি। অথচ

যীশুকে স্বয়ং ভগবানের সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ করিনা। বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণ-চরিত্র পাঠে মানবহৃদয় সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

তাহারপর, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার তিনি যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে ছিলেন তাহা পাঠে আমাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষা-বিকৃত যুবকের জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হয় ও গীতা যে হিন্দুর কি আদরের ধন, কি অমূল্য তত্ত্ব, ও কি গুভীর দর্শন ইহাতে নিহিত আছে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বঙ্কিমবাবু ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। শেষ করিবার পূর্ব্বেই ইহ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহ জগতে নাই কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারে তিনি যে অমূল্য রত্নরাজি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহযোগী অথবা পরবর্ত্তী লেখকগণ কেহও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ ধন সঞ্চয়ে সমর্থ হন নাই। কি চরিত্র বিশ্লষণে; কি রচনা-লালিত্যে, কি মধুর ভাব সমাবেশে, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে, সকল বিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকাবলী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। তাই আজ বঙ্গদেশের প্রতিগৃহে এই যশস্বী লেখকের গ্রন্থরাজি শোভমান দেখিবে। কোন বঙ্গীয় লেখকের পুস্তক সমালোচনা করিতে হইলে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় নর নারী বঙ্কিম-চন্দ্রের আদর্শ ধরিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন, ইহাতেই বুঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-জগতে কি অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায়, আজ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে বঙ্কিমচন্দ্রের কত অধিকার?

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত]

(c) আমার গ্রামের নাম সুসঙ্গ-দুর্গাপুর। ইহা একটী রাজধানী। নেত্রকোণা সবডিভিসনের অন্তর্গত ও ময়মনসিংহ হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামেই থানা আছে। গ্রামটী অতিসুন্দর ও মনোহর।

তিন মাইল উত্তরে গারোপাহাড়, পশ্চিমে গ্রামের পার্শ্বেই সুমেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বিস্তৃত শস্তশ্যামল প্রান্তর।

কৃপাময় জগদীশ্বর এই গ্রামটীকে রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। গ্রামের স্বাস্থ্য অতি ভাল ছিল, (গত ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের পূর্ব্বে) এই গ্রামটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু ভূমিকম্পে ইহার স্বাস্থ্য এখন কিছু খারাপ হইয়াছে, মাঝে মাঝে জ্বর দেখা দেয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ও চৈত্র বৈশাখে সময়ে সময়ে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। কেহ কেহ পরিষ্কার স্বচ্ছ নদীর জল ব্যবহার করে। অধিকাংশ বাড়ীতে কূপ আছে, গ্রামবাসীরা প্রায়ই কূপের জল পান করে। গ্রামে কোন প্রকার ড্রেনের বন্দোবস্ত নাই কিন্তু যখন পাহাড়ে কিছু বৃষ্টি হয়, তখন নদীর জল গ্রাম ভাসাইয়া সমস্ত ধৌত করিয়া লইয়া যায়। এখানে একটী পোষ্ট-আফিস ও টেলিগ্রাফ-আফিস আছে। কিন্তু যাতায়াতের বন্দোবস্ত বড় খারাপ, ৩৬ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া ময়মনসিংহে যাইতে হয়। রাস্তা অতি কদর্য্য, জায়গায় জায়গায় খাল ডোবা আছে, কাজেই ঘোড়ার গাড়ী চলিতে পারে না, গরুর গাড়ী কোন প্রকারে অতিকষ্টে যায়। পাল্কীতে যাওয়া যায় কিন্তু বড় ব্যয়-সাধ্য। স্থানীয় মহারাজ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন হাতীতে কতক রাস্তা ও কতক ঘোড়ার গাড়ীতে যান। গবর্ণমেণ্টকে মহারাজ ১৭৷১৮ হাজার টাকা রোডসেস্ দেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য নাই। ভদ্রলোক ব্যতীত স্থানীয় লোকের শিক্ষার বড় অভাব। গ্রামে একটী মাইনর-স্কুল আছে, তাহাতে গারো, হাজঙ্গ ও মুসলমান ছাত্রেরা পড়ে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যাভাসের বড় ইচ্ছা নাই। মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি. এ. মহোদয় ও তাঁহাদের পরিবারস্থ অনেকেই বিদ্বান্। তিনি নিম্নপ্রাইমারি শিক্ষার জন্ত বিশেষ যত্নশীল। তাঁহারা সকলেই বিদেশে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। লক্ষ্মী সরস্বতীর

এইরূপ সম্মিলন অল্পই দেখা যায়। মহারাজ কুলীনদিগের নায়ক। তিনি শ্রোত্রিয়। এখানে রাজপরিবার ও কতিপয় ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ ভিন্ন প্রায়ই অন্ত্যজাতি। শূদ্রও কিছু আছে। রাজধানীর কিছু দূরেই গারো হাজঙ্গ ও মুসলমানের বাস। সুসঙ্গ রাজপরিবার ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। সেই জন্য এখানকার লোকও কিছু ধর্ম্মভীরু। গ্রামে বার মাসে তের ক্রিয়া হয়। দুর্গাপূজা ও বাসন্তী-পূজার সময় গান, বাজনা ইত্যাদি খুব আমোদ প্রমোদ হয়। এই গ্রামে অতিসরু পরিষ্কার চাউল পাওয়া যায়। ইহার জন্য এই জায়গা প্রসিদ্ধ। গ্রামে মহারাজের একটী খুব বড় বাজার আছে। তাহাতে আবশ্যক জিনিষ সমস্তই মেলে। এখানে পাহাড়ের ফল মূল পাখী কাঠ বাঁশ প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়। এই জায়গা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। ধান চাউল বাঁশ ও কাঠের জন্যও ইহার খ্যাতি অল্প নহে। পাহা'ড়ে বাঁশ ও কাঠ এখানে এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, অন্য কোথায়ও এত আমদানী হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কিছু দিন পূর্ব্বে এই রাজার অতুল সম্পত্তি ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। গারো-পাহাড় এই রাজার ছিল। কিন্তু এখন গবর্ণমেণ্টের। তাহার পর, অল্পদিন হইল এই গ্রামের উত্তরে পাহাড়ের উপর একটী বাজার বসিয়াছে, কাজেই পাহাড়ের জিনিষ মহারাজের বাজারে প্রায়ই আসিতে পারে না। এ অবস্থায় এ গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, তথাপি যদি আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ কিছু দৃষ্টি করেন, তবে কিছু উন্নতি হইতে পারে।

১। ময়মনসিংহ হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তা ভাল করা কর্ত্তব্য।

২। গ্রামের স্কুলটীর যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক।

৩। একজন ভাল ডাক্তার ও একটী যথার্থ দাতব্য-ঔষধালয়ের দরকার।

এই রাজধানীর একটী পুরাতন ইতিহাস আছে তাহা শুনিলে শরীর

রোমাঞ্চিত হয়। সুমেশ্বর ঠাকুর (মুসলমান রাজ্যের বহুপূর্ব্বে) এই রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি পাহাড়ে কতিপয় ঋষির সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ঋষিরা তাঁহাকে বলিয়া দেন, এই সুমেশ্বরী নদীর তীরে একটী অশোক গাছ আছে, সেই খানে ৺ দশভুজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্থাপন কর। কিন্তু যে দিন ঐ অশোক গাছ মরিবে, সেই দিন তোমার রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গত ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের আগের দিন ঐ গাছটী মরিয়া গেল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। পরে অবশ্য আর একটী অশোক বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। এই রাজবংশধরগণ অতি বলিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া বিখ্যাত। একবার এক রাজা (বর্ত্তমান রাজার চারি পুরুষ পূর্ব্বে) তাঁহার গুরুপুরোহিতের বাড়ী হইতে রাত্রিকালে আসিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ একটী ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িলেন। তাঁহার হস্তে তীর ধনুক ছিল, তিনি সেই ব্যাঘ্রটীকে তীর দ্বারা একটী বৃক্ষের সহিত বিদ্ধ করিয়াছিলেন। আর একবার এক রাজা তাঁহার পিতাকে দুই ডাকাতে আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া তাহাদের এক জনের মস্তক টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহারা যে অতীব বলিষ্ঠ ছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্নানের কলসী দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝা যায়। সে কলসীগুলি আমরা (যুবারা) খালি অবস্থায় তুলিতে পারি না। কিন্তু এখন সেই রাজাদের বংশধরগণ অতিনির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছেন। এখন অনেক পরিবার হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

[শ্রীঅনিলচন্দ্র লাহিড়ী]

---o---

(d) চরিত্র মনুষ্যের প্রধান ভূষণ। চরিত্র-বিহীন মনুষ্য জগতের মহৎ-ব্যক্তিগণের মধ্যে স্থান পায় না। চরিত্রের শক্তি মহতী। "বাহুবল,

মনুষ্যবল, অর্থবল, ইহাদের অভাবে কিছুই ক্ষতি হয় না। কিন্তু চরিত্র-বল না থাকিলে যে কিরূপ ক্ষতি হয়, তাহা আমরা চরিত্রবান্ মনুষ্যদিগের এবং চরিত্রহীন মনুষ্যগণের জীবন-বৃত্তান্ত এবং কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারি। যে সকল মহৎ ব্যক্তি জগতের উপকার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন এবং যাঁহারা আধুনিক সময়ে জগতের বিশেষ উপকার করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনী পড়িলে আমরা দেখিতে পাই, নির্ম্মল চরিত্র তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপের মূলে বর্ত্তমান। মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের গুণ-গান করা অত্যুক্তিমাত্র কিন্তু তাঁহার শৈশবের কষ্ট-সহিষ্ণুতার মধ্যে গুরুভক্তি, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি চরিত্রের প্রধান গুণগুলি তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্যসমূহের মূল। বিদ্যাসাগরের মাতাঠাকুরাণী যদি তাঁহাকে সত্যকে ভাল বাসিতে এবং সত্যের প্রতি ভক্তি করিতে না শিখাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার জীবন কখনই ঐরূপ মহৎ হইত না। মহাপুরুষ ওয়াসিংটনের জীবনীপাঠে বুঝা যায় যে, তিনি কত মাতৃভক্ত ছিলেন। যদি তিনি মাতাকে না ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহার সাহায্যে নিজ চরিত্রকে ঐরূপ উন্নত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অদ্য আমেরিকার সম্মিলিত প্রদেশের কি দুর্দ্দশা হইত!

মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠে বিলক্ষণরূপ জানা যায়, তাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্র কি প্রকারে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। এইরূপ অনেক বালককে দেখা যায় তাহারা শৈশবে কত শান্ত, কত ধীর, কত বুদ্ধিমান্ কিন্তু যৌবনে তাহাদের দশা দেখিলে সকলেরই মনে দুঃখের উদ্রেক হয়। তাহারা পিতামাতার সাবধানতা হেতু অসৎসঙ্গে পড়িয়া হীনদশা প্রাপ্ত হয়। মাতাপিতার দোষেই, দেখা যায়, বালকেরা ভীত হইয়া প্রথমে মিথ্যাকথা কহিতে শিখে। বাল্যে মাতাপিতার দোষে বালক নিষ্প্রভ, নির্বুদ্ধি, অসচ্চরিত্র হয় কিন্তু যৌবনে তাহারা নিজেদের দোষেতেই

চরিত্র দূষিত করে। বাল্যকালে চরিত্র-দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যৌবনে যিনি অবিচলিত ভাবে চরিত্র রক্ষা করেন ভবিষ্যতে তাঁহার বিশেষ সুখের সম্ভাবনা। শৈশবে যিনি সত্যপ্রিয় হইয়াছেন, যিনি গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়াছেন এবং পাঠে বিশেষ মন দিয়াছেন। যিনি পিতামাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন, যিনি ভ্রাতা ভগিনীদিগকে স্নেহ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার উন্নতি অবধারিত। ভবিষ্যতে যিনি সচ্চরিত্রের গুণে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত হন না, সমভাবে সকলকে ভাল বাসেন, তিনি স্বার্থপরতার অপবাদে কলুষিত হন না। সত্যপ্রিয়তা তাঁহার কর্ম্ম সুসম্পাদনের প্রধান সহায় হয়। গুরুজনের প্রতি ভক্তি কর্ত্তব্যে দৃষ্টি, মিথ্যায় অভক্তি, অতিরঞ্জনে বিমুখতা, সৎকর্ম্মে কালাতিবাহন, সৎসঙ্গে বাস, ঈশ্বরে ভক্তি ভালবাসা, চরিত্রের এই সমস্ত গুণ তাঁহার উন্নতির প্রধান সহায় হয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

চরিত্র-বিহীন মনুষ্য ও পশুতে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। পশু নিদ্রা যায়, ভক্ষণ করে, বিচরণ করে, চরিত্রহীন ব্যক্তিও ঐ সমস্ত করে। শাস্ত্রে বলে বটে যে, চরিত্রহীন মনুষ্য এবং পশুতে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রাণীটার বিবেচনা-শক্তি আছে এবং বিবেক আছে, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যাহার চরিত্রের অভাব, তাহার বিবেচনা শক্তিতে কি ফল, এবং সে বিবেকানুসারে কি কার্য্য করিবে? ফলে দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ই সমান। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, প্রতিজ্ঞা-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন হন, তাঁহার প্রতিজ্ঞায় কিছুই ফল নাই। চরিত্র-দোষে তাঁহার সমস্ত প্রতিজ্ঞা নিষ্প্রভ হইয়া যায়, অবশেষে তিনি নির্ব্বোধ, হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া যান। সৎকার্য্যে তাঁহার প্রয়াস বিফল। কোন কার্য্যই তিনি সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। জীবন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু যিনি সাধারণতঃ বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহার

যদি চরিত্র বিমল হয়, তবে তিনি প্রায় সমস্ত কার্য্যেই যশোলাভ করিতে পারেন। চরিত্র-বলে, তিনি অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বর ও মাতা পিতা ও জগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অতএব তিনি যে সুচারুরূপে কার্য্য করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সচ্চরিত্র ও ধন এই উভয়ে বিশেষ প্রভেদ। এই শতাব্দীতে প্রায়ই দেখা যায়, বিত্তশালী ব্যক্তিগণ চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রলোভন প্রভৃতি আক্রমণ করে; ফলে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আমোদ প্রমোদে মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধন কোনও সৎকর্ম্মে প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ধনরত্ন-সমূহ কোন কার্য্যেই আইসে না। সুপ্রসিদ্ধ "Wealth of Nation"এর লেখক Adam Smith বলিয়া গিয়াছেন যে, "অর্থ প্রকৃত ধন নয়, কিন্তু পরিশ্রম ও চরিত্রই জাতির প্রধান ধন।" চরিত্রশীল ব্যক্তি ধনহীন হইলেও, সৎকর্ম্মে বিরত হন না। তিনি প্রভূত উপকার করিতে পারেন এবং করেন, ধনবান্ ধনের দ্বারা যাহা করিতে পারেন না, চরিত্রের দ্বারা তাহা চরিত্রবান্ পারেন এবং সেই জন্যই মোগলরাজ্য যখন ধন-বিভূষিত, যখন মোগলরাজ্য সমৃদ্ধির চরমসীমায় উঠিয়াছিল, যখন জাহাঙ্গীর এবং সাহাজাহান আনন্দসাগরে ভাসিতেছিলেন, ধনসম্পন্ন এই সমস্ত বাদসাহদিগের অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত দরিদ্রাবস্থায়, যখন রাজ্য গঠিত হইতেছিল মাত্র তৎকালীন বাদসাহ আকবরসাহের নাম সাদরে উচ্চারিত এবং প্রতিধ্বনিত হইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধ্যবসায় চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। অনেক লোক বিত্তহীন ছিলেন বটে, বুদ্ধিহীন ছিলেন বটে, কিন্তু অধ্যবসায় বলে তাঁহারা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, কত ছাত্র অধ্যবসায়-গুণে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ

করিতেছে এবং কত ছাত্র তদভাবে অনেকের নিম্নে আসন লাভ করিতেছে। অলঙ্কারের মধ্যে হীরক যেমন, তেমনি চরিত্রের মধ্যে নৈতিক সাহস ঔজ্জ্বল্য বিধান করে। ইহার প্রভায় মনুষ্যকে অতি সুন্দর দেখায় এবং ইহার অভাবে লোক গাঢ় তিমিরে নিমগ্ন হয়। ইহারই বলে মনুষ্য উন্নতির পথের কণ্টক উদ্ধার করিয়া, বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া শেষে গৌরবের উচ্চ আসনে অধিরূঢ় হয়। চরিত্রোন্নতির সহিত আত্মোন্নতি হয়। আত্মবিশ্বাস চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। এবং আপনার সাহায্য স্বয়ং করা চরিত্রবান্ ব্যক্তির প্রধান গুণ। যাহার আপনার উপর সাধু বিশ্বাস, যিনি স্বয়ং আপনার সহায়, তিনি যে জগতে উন্নতি করিবেন এবং মনুষ্যের পূজ্য হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। নিউটন সাহেব বাল্যে দরিদ্র পিতামাতার নিকট বুদ্ধি বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিয়া ও শেষে বিজ্ঞান-জগতে যে কি আলোক বর্ষণ করিয়াছেন— তাহা কোন লোকই ভুলিতে পারিবে না। কলম্বসের অধ্যবসায় এবং আত্ম-বিশ্বাস থাকাতে, নূতন জগৎ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে সতী সাবিত্রী চরিত্র-বলে যমরাজের নিকট হইতে পতির জীবনবর পাইয়াছিলেন, সীতা দেবীর পতি-ভক্তি হেতু অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন—এই সমস্ত দ্বারা আমরা বুঝি, চরিত্র সর্ব্ব শক্তির মূল। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মে মতি, সচ্চরিত্র লোকেরই হইয়া থাকে। পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চরিত্র গঠনে কতই সযত্ন থাকিতেন, চরিত্রের জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী থাকিতেন এবং এই তপস্যার এবং চরিত্র-বলে কি মহৎ কার্য্য করিতেন, তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিলে শেষ করা যায় না। তপস্যাই মনুষ্যের গৌরব ছিল এবং তপস্যার ফলেই মনুষ্য "যচ্ছুষ্করং যদ্দুরাপং" তাঁহা সম্পন্ন করিতেন। হিন্দুরা জানিতেন "তপোহি দুরতিক্রমম্" তপস্যার মূল চরিত্রকেই তাঁহারা চিনিতেন; জানিতেন, চরিত্রই প্রধান। আধুনিক সময়েও চরিত্র-গঠনের প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তিরা চরিত্রের মূল্য কি তাহা শিখাইতেছেন। চরিত্র-বল থাকিলেই আমরা নিজকে জানিতে পারি, কি জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে জগতে পাঠাইয়াছেন? এবং ঈশ্বরের রূপ ও জ্যোতি জানিতে পারি। চরিত্রবলে বলীয়ান্ মনুষ্যই ইহ লোকে সুখী, তিনিই চিরস্মরণীয়।

[শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত]

—o—

(৫) ইতিহাস কালপরম্পরা অনুসারে লিখিত জাতীয় জীবনের বিবরণ। ঐতিহাসিক একজাতির জীবনে অতিপ্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বা ঐ জাতির ধ্বংসকালাবধি যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করেন। এই রূপে ঐ জাতির উত্থান পতন, উন্নতি ও অবনতির বিবরণ লিখিত থাকে। মানব-জাতির উন্নতি সর্ব্বদাই এবং সকল দেশেই এক ক্রম অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। যেমন ব্যক্তি-গত জীবনে কোনও ব্যক্তির জীবনগত ঘটনা-সমূহ এক ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জাতীয় জীবনও একটী ক্রম অনুসরণ করিয়া চলে। এই ক্রম যদিও সর্ব্বদা সহজে বুঝিতে পারা যায় না, তথাপি উহা নিত্যই অলক্ষ্যে চলিতেছে; রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি যেমন ক্রম অনুসারে হইতেছে ও যাইতেছে, সেইরূপ, জাতীয় জীবনেও কদাপি সম্পৎ, কদাপি বিপৎ, কখনও উত্থান, কখনও পতন চলিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপারে সেই জাতীয় জীবন পরিপক্ক হইতেছে ও সেই জাতি দৃঢ়তর ভাবে আপনার শক্তি ও আপনার দুর্ব্বলতা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতেছে। ক্রমে ক্রমে সেই জাতি নিজের দুর্ব্বলতা সংশোধন করিতেছে, আপনার বলবৃদ্ধি করিতেছে ও বিগত ব্যাপার-সমূহ হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আপনাকে দৃঢ়তর ও অধিকতর ঘাতসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে এক এক জাতি আপন আপন লাভালাভ, সদসৎ, উপায় অপায়,

সকলই জানিতে পারিতেছে। কোনও জাতি হয়ত, বহুকাল কোনও জাতীয় দুর্গতিতে আপনার প্রভাব পুঞ্জীভূত করিয়া আপন শক্তির উপর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু যত দিন যাইতেছে, ততই সেই জাতি আপনার অভাব ও দুর্ব্বলতা বুঝিয়া নিজের সামর্থ্যের উপর দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করিতেছে—যেন অধিকতর ক্ষমতায়, অধিকতর অভিজ্ঞতায় বলীয়সী হইয়া সমস্ত বিপৎ ও বিরুদ্ধ শক্তিকে তুচ্ছ মনে করিতেছে। এইরূপ ব্যাপার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ও সর্ব্ব কালেই ঘটিতেছে। নানা জাতির এই রূপ বিবরণ পাঠ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের কি লাভ হইতে পারে? আমরা ইতিহাসে অত্যন্ত উন্নত বা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের কথাই বেশ দেখিতে পাই। মধ্যগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায়ই স্থায়ী নাম রাখিয়া যাইতে পারেন না। এইরূপ ব্যক্তিদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা কি শিখিতে পাই? নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের বৃত্তান্ত আমাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঘৃণ্য হইয়া উঠে, কারণ উন্নত-চরিত্র ব্যক্তিদিগের জীবন বৃত্তান্তের সহিত একত্র সমাবেশ-হেতু এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের ঘটনা অধিকতর অপকৃষ্ট, অধিকতর গাঢ়তমসাচ্ছন্ন ও অধিকতর জুগুপ্সা-জনক হইয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে; তাহাদের জীবন বীভৎস ও ন্যক্কারজনক বলিয়া বোধ হয়। আর যে সমস্ত মহাত্মাদিগের জীবন বা তাঁহাদিগের মহৎ কার্য্যসমূহ ইতিহাসে লিখিত থাকে, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের আনন্দ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের অনুচিকীর্ষা ও মহত্ত্বের প্রতি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ জন্মে। যাহা মানুষের ভাল লাগে, মানুষের চিত্ত সর্ব্বদা সেই দিকেই ধাবিত হয়; আমাদের চিত্তও সেই সমস্ত মহাপুরুষদিগের জীবন ও কার্য্যকলাপ চিন্তা করিয়া আনন্দপূর্ণ ও উন্নত হইয়া উঠে। সেইরূপ জীবনে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, যে মনোহর ঔন্নত্য তাহাই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আমাদের জীবনকেও সুন্দর ও উন্নত করিয়া তোলে। মহাপুরুষদিগের জীবনীপাঠ

করিতে সকল মহাত্মাই সর্ব্বকালে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইতিহাস পাঠ করিলে কেবল যে, এই মহাপুরুষ-জীবনী পাঠ করা হয়; তাহা নহে, আর ও অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয়।

ইতিহাস পাঠে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, জাতীয় জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে, কখনও উত্থান, কখনও পতন, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ আসিয়া থাকে। এই শিক্ষা আমাদিগকে জীবনে ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়। বিপদে ও কষ্টের সময় আমরা অধীর হই না, জানি ইহাই চিরন্তন নিয়ম। ইহার পর আবার সম্পৎ আসিবে, এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা কোন বিপদে একবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িনা। এই ধৈর্য্যশিক্ষা অনেক সময়ে অন্য প্রকারে সমস্ত জীবনেও লাভ করা সম্ভব নহে। একজাতির জীবনেও ইতিহাস শিক্ষার প্রভাব কম নহে। জাতির প্রধান নেতৃগণ, যাঁহারা বুদ্ধি, কার্য্য, উন্নতি, চরিত্র, সর্ব্ববিষয়ে নেতা, তাঁহারা যদি ইতিহাসের উপরি উক্ত ও অন্যান্য শিক্ষাগুলি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সেই জাতি সর্ব্বদাই উন্নতির পথে চলিতে থাকিবে, কদাচিৎ বিপদ্ আসিতে দিবে না। কারণ নেতৃগণ সমস্ত জাতির ইতিহাসে শিখিয়াছেন, কিসে জাতীয় জীবনের অবনতি, কিসে উন্নতি হয়; সুতরাং তাঁহারা প্রায়ই একজাতিকে উন্নতির পথে চালিত করিতে পারেন। আর যদি কোন বিপদ্ আসে, তাহা হইলেও, সমস্ত জাতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিখিতে পারে যে, এখন দুঃখে ম্রিয়মাণ না হইয়া বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ; কারণ, এই বিপদ্ চেষ্টা দ্বারা অপনীত হইতে পারে। ইতিহাস পাঠ দ্বারা এক এক জাতি আপন আপন উন্নতির পথ বাছিয়া লইতে পারে, উপযুক্ত সাবধানতার সহিত সেই পথেই চলিতে পারে; ইহাই জাতিগত জীবনে ইতিহাস পাঠের প্রধান ফল।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, হিন্দুরা কোন কালে ইতিহাসের পাঠ

অভ্যাস করে নাই; ইতিহাস তাহাদের ভাল লাগে না। বাস্তবিক এক ভাবে দেখিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের মধ্যে ইতিহাস লেখন-প্রথা কিছু কিছু প্রচলিত ছিল। কিন্তু অতিপ্রাচীন কালের ইতিহাস প্রায়ই পাওয়া যায় না। ইহা এক প্রকার সত্য; আবার ইহাও অন্য প্রকারে সত্য যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের অভাব নাই, ইতিহাসে যে সকল শিক্ষা দিতে পারে, সকলই এই জাতি লাভ করিয়াছে। এই জাতিকে পুরাকালে কখনও অন্যজাতি কর্ত্তৃক আক্রমণের ভাবনা ভাবিতে হয় নাই; জাতিগত জীবনে এক কাল হইতে অন্যকালে অতি অল্পই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি হইত, ইহা ব্যতীত, অন্যান্য সকল সময়েই ইতিহাস প্রায় একই ছিল। রাজার পর রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, আর প্রজাগণ বৎসরের পর বৎসর নিয়মিত ভাবে করাদি রাজকোষে প্রদান করিত।

কিন্তু এক হিসাবে ভারতবাসীর ইতিহাস আছে, উহা বিলুপ্ত হয় নাই, বিলুপ্ত হইবার নহে। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সর্ব্বকালে সত্য ও ধর্ম্ম-গতপ্রাণ, ধর্ম্মই উহাদের জীবন; অন্য কোনও ব্যাপার উহাদের আগ্রহ বা ইতিহাস-পাঠস্পৃহা জন্মায় না। ধর্ম্মই উহাদের প্রকৃত জীবন, বিশেষতঃ জাতিগত জীবন; ধর্ম্মই উহাদের জাতির জীবন গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। জাতির এই ধর্ম্মগত জীবনের কি কোনও ইতিহাস নাই? কেন থাকিবে না? যাহা ভারতবাসীর প্রাণের সর্ব্বপ্রিয় পদার্থ, তাহার কোনও কথা কি সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে না? অন্য কোনও জাতির ধর্ম্মগত জীবনের এত স্পষ্ট ইতিহাস নাই। সেই বেদের সময় হইতে ব্রাহ্মণ উপনিষদাদির সময়, বৌদ্ধদিগের সময়, বেদান্তাদির সময়, শঙ্করাচার্য্যের রামানুজের ও চৈতন্যের সময়ের মধ্য দিয়া এই জাতির জীবন-প্রবাহ কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহে যেরূপ পরিস্ফুট বুঝা যায়, জাতীয় জীবনের অন্য কিছুই অত পরিষ্কার রূপে বুঝা

যায় না। এই ভাবে দেখিলে হিন্দুদিগের যে বিশাল ও বিস্তৃত জাতীয় ইতিহাস রহিয়াছে, জগতের অন্য কোন জাতিই ঐ বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না।

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্রসেন]

——o——

[D]

First Examination In Arts, 1908.

Bengali Composition.

(Optional paper.)

Paper set by——Babu Dineschandra Sen, B. A.

The Figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Answers to be always in Bengali.

Write essays on any two of the following subjects:—

(*a*) City-life and country-life :—experiences of both essential for intellectual and moral development—their respective advantages and disadvantages—how to avoid the latter—causes that have led to the growing tendency in Bengal for desertion of country-life in preference to city-life——effects of such a preference on our society generally. 50

(*b*) Any long journey that you may have made :—course and mode of journey—the objects that struck 50

you most during the journey—anything of historical interest that you came across—conditions of weather and their bearing upon your health—hardships endured—your companions—any amusements in which you took part.

(*c*) The character of Kundanandini in Bishabriksha :—how far this creation of Bankim's fancy is an outcome of European influence, and how far it represents the ideal of womanhood in Bengal—Kundanandini compared with Ayesha in Durgeshnandini—the influence of these two characters on society. 50

(*d*) Earthquakes :—their causes—some of the earthquakes that have occurred in Bengal in past years—the greatest earthquakes of which you have read in history. 50

(*e*) Honesty is the best policy :—examples of honest men thriving in the long run and of the ultimate failures of dishonest men in spite of their early successes in life from history and from your own observation. 50

(*f*) The domestic animals of Bengal :—the help they render to householders—their food—precautions to be used to protect them from death and disease—the training necessary to make them useful—remarkable instances of their fidelity and usefulness. 50

ANSWERS.

[D]

(*a*) নাগরিক জীবনের কোলাহল ও কর্ম্মস্রোতের মধ্যে পল্লীজীবনের শান্তি ও নিস্তব্ধতার কল্পনাটুকু ও মরূদ্যানের ন্যায় আরামপ্রদ। নগরের চিত্রে কোথা ও বিরক্তিকর প্রাচীনতা নাই; নিত্য নূতন দৃশ্য, নিত্য নূতন ঘটনা নাগরিক জীবনের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। অগণিত জনশ্রেণী পিপীলিকার শারির ন্যায় সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ও দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজপথের বক্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; গাড়ী ঘোড়ার ঘর্ঘর শব্দ; কল কারখানার ধূমরাশি, বাণিজ্যতরিপূর্ণ নদী, এখানকার সকলই কর্ম্ম-জগতের ব্যস্ততা ও কোলাহল স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ নগরসকল সমাজ-দেহের হৃদয়-স্বরূপ; নগর হইতেই বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্রোত প্রবাহিত হইয়া দেশের সকল দূর স্থানে পণ্য-দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেছে। হৃদয় যেরূপ দেহে রক্ত সঞ্চালনের কেন্দ্র স্থান, নগরও সেইরূপ জনসমাজের ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য সামগ্রী সরবরাহ করিবার কেন্দ্র স্থান। কিন্তু পল্লীচিত্রের সঙ্গে বাঙ্গালী জীবনের কি এক অব্যক্ত মধুর বন্ধন রহিয়াছে, কি যেন এক সুখের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, যাহা কখন ভুলিবার নয়, যাহা কখন ছাড়িবার নয়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্য কি আবার নূতন করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে? মাতৃ-ক্রোড় হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত জীবনের প্রত্যেক ঘটনার উপর বঙ্গের পল্লীলক্ষ্মী কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা ততই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়; যতই আমাদের রুচি মার্জ্জিত হয়, যতই আমাদের শিক্ষা উন্নত হয়, যতই আমাদের কল্পনা বিকশিত হয়।

দিদিমার মুখে শিশুর ছড়া শুনা, পল্লীর মাঠে বাল্যখেলা, রাখালের গরুর পাল লইয়া মাঠে যাওয়া, পূজাও ক্রিয়াকাণ্ডের গাম্ভীর্য্য, বারমাসে তের পার্ব্বণ, সকলই পল্লীজীবনের জীবন্ত প্রতিকৃতি। কবিবর রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা-মাখা ও সৌন্দর্য্যময়ী তূলিকায় "সোণার বাংলা" নামক সঙ্গীতে বাঙ্গালার পল্লীজীবনের যে অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কোন্ হৃদয়বান্ মানুষের নিকট আদরণীয় নয়? ফাল্গুনে আমের বন, অগ্রহায়ণে ভরা ক্ষেত, ধেনুচরা মাঠ, পাখীডাকা ও ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাট, পারে যাবার খেয়া ঘাট, দিনান্তে ঘরে জ্বালা দীপ, ইহার কোন্ গুলি আমাদের নিকট কোন কল্পিত স্বর্গরাজ্যের প্রতিকৃতি উপস্থিত করেনা? এখানে সহরের কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, নিত্য নূতনত্ব নাই। কিন্তু শান্তির সিংহাসন এখানে অচল প্রতিষ্ঠিত; সরলতার প্রতিমূর্ত্তি এখানে প্রতিগৃহে বিরাজিত এবং পুরাতনের গাম্ভীর্য্য এখানে চিরপ্রীতিপ্রদ। পল্লীতে প্রতিদিন পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উদিত হন ও পশ্চিমে অস্ত যান, সেজন্য কি সূর্য্যের নূতনত্ব বা সৌন্দর্য্যের কিছু হ্রাস হইয়াছে? বিহঙ্গের কূজন, পুষ্পের সৌরভ ও বায়ুর শীতলতার মধ্যে বিধাতা এমন কিছু লালিত্য ও মাধুর্য্য ঢালিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে ইহারা চিরকাল আমাদের উপভোগ্য হইলেও বিরক্তিকর হয় না, বরং যতই পুরাতন হয় ততই অধিকতর স্পৃহণীয় হয়। পল্লীজীবনও সেইরূপ।

হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমঞ্জসীভূত উন্নতিতে মানব-জীবনের লক্ষ্য সাধিত হয়। নগরে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাবনিচয়ের বিকাশ হয় না। আবার পল্লীজীবনের কবিত্ব-পূর্ণ আকাশ ও বাতাস আমাদের কোমল বৃত্তি সমূহের চরিতার্থ করিবার উপযোগী হইলেও, বুদ্ধি-বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। নগরে যে ভাব-রাজ্যের ক্রিয়া একবারে বন্ধ থাকে তাহা নয়, কারণ, প্রাসাদেও রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। আবার পল্লীতে যে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে অনুন্নত থাকে তাহাও নয়, কারণ কত বিদ্যাসাগর, কত রামমোহন, পল্লীগ্রামের মাটি হইতেই গঠিত হইয়াছে। তবু বলিতে হইবে,

যে নগর বা গ্রাম, কোন স্থানেই আমাদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সম্পূর্ণ হয় না। নগরে নানাশ্রেণীর, নানারুচির মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্বভাবতই মন একটু প্রশস্ত হয় এবং সভা সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতিতে যোগ দিয়া বা পুস্তকাগার-সমূহে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা হয়। দেশের যাঁহারা নেতা, সমাজের যাঁহারা বৃদ্ধ, চরিত্রে যাঁহারা দেবতুল্য, কর্ম্মে যাঁহারা স্বার্থ-হীন, এরূপ মহাত্মাদের সংসর্গ, ও সংস্পর্শ লাভ করা নগরে যেরূপ সুগম, পল্লীতে সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে নগরের নৈতিক প্রভাব অনেক যুবককে পথভ্রষ্ট করিতে পারে। নাট্যশালায় যোগ দান করিয়া, কুসংসর্গে পড়িয়া, কত যুবক পিতামাতার ক্রন্দন উপস্থিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! নগরের অধিবাসী দিগের মধ্যে কোনরূপ স্বাভাবিক বন্ধন নাই, কেবল ক্রয় বিক্রয়ের কৃত্রিম সম্বন্ধ; সুতরাং এখানে প্রতিবেশীদিগের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব হয় না। প্রতিবেশীর গৃহে কাহারও মৃত্যু হইলে ও অন্য প্রতিবেশীরা বড় সন্ধান করেন না। কিন্তু পল্লীতে সকলের মধ্যেই একটা প্রেমের বন্ধন রহিয়াছে। জাতিগত, ব্যবসাগত, ধর্ম্মগত, রুচিগত, অবস্থাগত সকল পার্থক্য সত্ত্বে ও গ্রামবাসিগণের পরস্পর সহানুভূতি ও অনুরাগ রহিয়াছে। তাহারা নাপিত ধোপা প্রভৃতি সকলকেই দাদা বা কোন নিকট আত্মীয় রূপে সম্বোধন করে। বংশপরম্পরা-ক্রমে এক ভিটায় বাস করিতে করিতে সকলেরই চারি দিকের সামাজিক অবস্থার প্রতি একটা অদৃশ্য আকর্ষণ জন্মে এবং তাহাই বৃক্ষের শিকড়ের ন্যায় তাহাদিগকে সকল পরিবর্ত্তন ও দুর্ঘটনার মধ্যে স্বস্থানে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখে। কিন্তু ইহার মন্দ দিক্‌টা ও একবারে ভুলিলে চলিবে না। ঘটনাবলীর একঘেয়েমি পল্লীবাসীদের চক্ষে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, তাহারা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। এজন্য দেশের সকল মন্দ ও অনিষ্টকর প্রথাকেও ইহারা স্নেহ-দৃষ্টিতে সমর্থন করে; কুসংস্কার ও

দুর্নীতিকে দেশ-প্রচলিত নিয়ম বলিয়া সজোরে টানিয়া রাখে—কোন সংস্কার সাধন করিতে গেলেই বিদ্রোহ উত্থাপন করে।

ঐ সকল অসুবিধা দূর করিতে হইলে গ্রাম ও সহর উভয় স্থানেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। নগরের দুর্নীতি দূর করিতে হইলে সকল ব্যবসায়ী বা কর্ম্মচারীদিগের পরিবার সহ নগরে বাস করা উচিত। স্ত্রীজাতির মঙ্গলময়ী দৃষ্টি, সকল দেশে সকল কালেই সমাজের দুর্নীতি-স্রোত নিবারণে সহায়তা করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, এদেশে কোম্পানির রাজত্ব-কালে যে সকল ইংরেজ কলিকাতা আসিতেন, তাঁহারা শীঘ্রই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িতেন, কিন্তু ক্রমে যখন সস্ত্রীক ও সপরিবারে ইংরেজেরা এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের চরিত্রে নৈতিক উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অন্যদিকে স্ত্রীজাতিকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান না করিলে তাঁহাদের চিত্ত সংকীর্ণ ও অনুদার হইয়া যাইবে; বিশেষতঃ নগরে পল্লীগ্রামের ন্যায় মুক্ত বায়ু ও উদার নীলাম্বরের অভাব থাকাতে স্ত্রীজাতিকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে জাতীয় দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। ছাত্রদিগের আবাসগুলি অধ্যাপকগণের সংসর্গ-সুলভ রাখিলেই ভাল হয়। অধিবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি করিতে হইলে জাতি-ভেদের বন্ধন শিথিল করিয়া, কোন জনহিতকর অনুষ্ঠানে যাহাতে সকল প্রতিবেশী মিলিত হইয়া সকলের স্বার্থের ঐক্য অনুভব করিতে পারেন, এমন বন্দোবস্ত করা উচিত। তৎপরে স্বাস্থ্য-প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না করিলে নগরের লোকদের আশঙ্কা অধিক।

পল্লীতে মধ্যে মধ্যে প্রচারক প্রেরণ করিয়া গ্রামবাসীদের অন্তরে নূতন আদর্শ, নূতন ভাব সকল জাগাইতে চেষ্টা করিলে ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলে তাহাদের মন উন্নত ও প্রশস্ত হইবে এবং তাহারা সত্যকে, ন্যায়কে সম্মান করিতে শিখিবে।

আমাদের দেশ ইংরেজ-রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ অশান্তিপূর্ণ ও অরক্ষিত ছিল, তাহাতে গ্রামে ধন প্রাণ নিরাপদে রাখা অতি কঠিন হইয়া পড়াতে, অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত সহরগুলিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম অবস্থায় এখনকার নগরগুলি তিনটি কারণে পরিপুষ্ট হইতে থাকে—(১) সুশাসন ও সুরক্ষণ, (২) সুস্বাস্থ্যবিধান (৩) রাজকীয় কার্য্যসমূহের কেন্দ্রস্থান। নগরে সরকারী পুলিশের বন্দোবস্ত থাকায় চোর ডাকাতের ভয় ছিল না; মিউনিসিপালিটির সুব্যবস্থায় মেলেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামকরোগের ভয় ছিল না, মোকদ্দামা প্রভৃতি কার্য্যানুরোধে সহরে যাওয়া আবশ্যক হইত। এখন প্রথমোক্ত কারণটি বর্ত্তমান নাই, যেহেতু, গ্রামেও আজ কাল লাল-পাগড়ির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু আর একটি কারণ বহুকাল হইতেই নগরের লোক বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিতেছে। তাহা ব্যবসা বাণিজ্য। নদীতীরবর্ত্তী নগর-সমূহে যাতয়াতের সুবিধা থাকায় পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর সুগমতা হইয়াছে। অন্যদিকে কলকারখানা সমূহের আধিক্য হেতু গ্রামের শিল্পিগণ ও শ্রমজীবি-সম্প্রদায় গ্রাম ছাড়িয়া সহরের দিকে ছুটিতেছে। ইহাতে গ্রামসমূহ জনশূন্য হইয়া যাইতেছে। আবার গ্রামের ধনবান্ জমিদারগণ সহরে আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার বাহুল্য দেখিয়া গ্রামস্থ পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া সহরের ভাড়াবাড়ী আশ্রয় করিয়াছেন। ফলে গ্রাম দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে। ম্যালেরিয়া আসিয়া গ্রামের অবশিষ্ট বাসিন্দাগণকে তাড়াইয়া দিতেছে। দেবালয়-সমূহ যুগযুগান্তরের কীর্ত্তি-চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়া আজ জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া পথিকের অশ্রু বিসর্জ্জন করাইতেছে। জলাশয়-সমূহ শুষ্ক ও আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া পল্লীলক্ষ্মীর তিরোভাব ঘোষণা করিতেছে।

[শ্রীসতীশচন্দ্র রায়]

(৫) তখন বেলা প্রায় ৪॥ঘটিকা, আমি ভগিনী দুইটিকে লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। আমাদের কলেজের ছুটি হইয়াছে। গৃহে যাইবার জন্য মন বড়ই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের পিতা, আমার মাতা ও ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে লইয়া অত্যুচ্চ-সমুন্নতশৃঙ্গ-পরিপূর্ণ হিমাচলের ক্রোড়স্থিত দার্জ্জিলিং-সহরের অনতিদূরে একটি চা-বাগানে বাস করেন। সেটি তাঁর কর্ম্মস্থান। আমাদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার মানসে কলিকাতার বোর্ডিংএ রাখিয়া যান। গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমরা সেখানে গিয়া থাকি। আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে বেগে চলিতে লাগিল। তখনও জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ঘণ্টা দুই এইরূপ ভাবে কাটিবার পর সূর্য্যের তেজ ক্রমেই কমিয়া আসিল, শীতল সান্ধ্য-সমীরণ সাদরে আমাদের অঙ্গে যেন হস্ত বুলাইতে লাগিল। কলিকাতার জন-কোলাহলের পর, দুধারে শ্যামল নীরব প্রান্তর দেখিয়া মন বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল, কোথা ও বা নদী কুল্ কুল্ রবে মানবকর্ণে সুধা ঢালিয়া দিয়া আপন মনে বহিয়া যাইতেছে। সেই নদীর উপর সেতু রহিয়াছে, তাহার উপর দিয়াই আমাদের ট্রেণ্ চলিয়া গেল। এইরূপে কত নদী, কত মাঠ পার হইলাম। সন্ধ্যাকালে সূর্য্য চতুর্দ্দিকে তাঁহার কিরণ ছড়াইয়া যেন শ্রান্ত হইয়াই ম্লানমুখে বিদায় চাহিলেন—বিদায়ের ক্ষণে তাঁহার রশ্মিগুলিকে যেন নয়নপ্রীতিকর রক্তিমাভায় মার্জ্জিত করিয়া এবং তাহার অসহ্য প্রতাপকে স্নিগ্ধতা মাখাইয়া দিয়া বিনীতভাবে বিদায় চাহিতে শিখাইলেন। গোধুলির দৃশ্য কি চমৎকার! ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড রাঙ্গা রাঙ্গা মেঘ, আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে একটি করিয়া তারা আকাশে ফুটিতে লাগিল। ধরা যেন সুধামাখা, স্নিগ্ধতাপূর্ণ মনে হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ৮টা, তখন গাঁড়াঘাটে ষ্টিমারে গিয়া বসিলাম। নদীর জলের

উপর চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব যেন শতধা হইয়া খেলা করিতেছে। সমীরণ যেন আরও শীতল স্নেহ-হস্ত অঙ্গে বুলাইতে লাগিল। আমি ডেকের উপর একটি কোণে বসিয়া এই সৌন্দর্য্যে বিভোর হইলাম। মধ্যে মধ্যে কেবল খালাসীর চীৎকার কাণে আসিতে ছিল। পৃথিবীর নিয়মই এই যে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেহ ভোগ করিতে পারেনা, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার এই "ভাবলহরীর" সহিত আলাপ ফুরাইয়া গেল। ষ্টিমার পর পারে গিয়া লাগিল—ঝুপ ঝাপ করিয়া খালাসীরা সিঁড়ি নামাইল, দড়ি দিয়া ষ্টীমার বাঁধিল। আমরা ও পারে নামিয়া আর একখানা ট্রেণে উঠিলাম। ট্রেণ আবার হুস্ হুস্ শব্দে ছাড়িল—জ্যোৎস্না-পরিস্নাত যামিনী, দুই ধারে নীরব প্রান্তর যেন সুধাসিক্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জানালার নিকট মাথা রাখিয়া এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অজানিত ভাবে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। ভোর যখন ৪টা তখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভগিনীদুইটিকে উঠাইলাম। মুখ ধুইয়া বিছানা বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। কারণ খানিক বাদেই সিলিগুঁড়ি ষ্টেসনে নামিতে হইবে। ক্রমে সিলিগুঁড়ি ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিল। আমরাও জিনিস পত্রাদি মুটের মাথায় চাপাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেসনে কিঞ্চিৎ চাও সামান্য জলযোগ করা গেল। তার পর, ছোট ছোট গাড়িতে উঠিলাম। সেকেণ্ডক্লাসে আমরা যাইতে-ছিলাম, সেই ছোট ছোট গাড়ীর এক একটি "কপার্টমেণ্টে" মাত্র দুইটি করিয়া বেঞ্চি। তেমন ভিড় না থাকায় আমাদের কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। খানিক বাদে গাড়ি ছাড়িল, আমরা সিলিগুঁড়িতে পৌঁছিয়াই ঠাণ্ডাকাপড় ছাড়িয়া গরম কাপড় পরিয়াছিলাম, তবু ও গাড়ী যতই চলিতে লাগিল আমাদেরও তত শীত বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ীর শ্রেণী কলিকাতার ট্রামের মত আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদিগকে

উপরে উঠাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ আপনার গরবে যেন মাথা তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিতে লাগিল। এক দিকে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ অপরদিকে গভীর উপত্যকা। সেই দিকে চাহিলে ও প্রাণে ভীতির উদ্রেক হয়। সে কি গভীর স্থান! কোথায় বা নির্ঝরধারা পর্ব্বতের অঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, কোথাও বা বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডের স্তূপ; সকলই যেন কি মহামন্ত্রে মুগ্ধ! সমস্ত হিমাচল যেন সবুজ বস্ত্রে আপনার অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে গাড়ী কিছু পশ্চাৎ হটিয়া আবার অন্য লাইন ধরিয়া যাইতে লাগিল—ইহাকে ইংরাজীতে বলে siding লওয়া। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, ততই শীত আরও বেশী বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে দার্জ্জিলিং-ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র, সবল-হস্তপদ-বিশিষ্ট ভুটিয়ারা "মেম সাহেব ডাণ্ডি মান্ গতা?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল। আমিও নেপালী ভাষায় কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ ছিলাম, অতএব বলিলাম "নেই হামেরু ডাণ্ডি মান্‌গদেইনা, হামেরুকো ঘোড়া ছ তেন্‌মেই যান্‌ছু" অর্থাৎ "না আমরা ডাণ্ডি চাই না, আমাদের ঘোড়া আছে, তাতেই যাব।" সহর হইতে ধবল-গিরির সূর্য্যতেজ-ভূষিত মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে বড়ই সুখ পাইলাম। মনে হইতে ছিল যেন প্রকাণ্ড হীরকখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের ছেলে বেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান অভ্যাস সুতরাং আমরা এক একটি ঘোড়ায় উঠিলাম। আমাদের সহিস অতিসতর্কতার সহিত ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। জিনিস পত্রাদি নেপালীরা বহিয়া আনিতে ছিল। ষ্টেসন হইতে আমাদের বাঙ্গলা তিন মাইল দূরে। এক মাইল এইরূপে ঘোড়ায় গেলাম, তার পরেই ক্রমে নীচে নামিতে হয় এবং সে সময় ঘোড়ায় চড়া তত নিরাপদ নয়, কাজেই আমরা ছেলেদের কলেজের কাছে ঘোড়া হইতে নামিলাম এবং হাটিতে আরম্ভ করিলাম।

ঘণ্টা দুই পরে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে মাস দুই ছিলাম। সে সময় প্রায়ই প্রত্যহ আমরা বেড়াইতে যাইতাম। চারিদিকে চা গাছ, সবগুলিই সমান উঁচু। মনে হইত যেন কে সবুজ বিছানা পাড়িয়া রাখিয়াছে। কখনও কখন ফ্যাক্‌টারিতে যাইতাম; কি করিয়া চায়ের পাতাগুলি কলে অর্দ্ধেক পিশিয়া আবার সেগুলি ভিজা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রং বাহির হইলে অন্য কলে দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া আর একটি কলে দিয়া বাক্সে প্যাক্‌ করে, এই সব দেখিতে বড়ই কৌতূহল উপস্থিত হইত। সেখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। মাস দুইএর মধ্যে আমরা আপনাদের শারীরিক উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। কখন কখন ঝরণার ধারে গিয়া বন-ভোজন করিতাম। ঘোড়ায় চড়া ভিন্ন আর তেমন কোন ব্যায়াম আমরা করিতাম না। মাঝে মাঝে আমাদের বন্ধু বান্ধবকে বনভোজনে ডাকিয়া সারাদিন আমোদে কাটাইতাম। সন্ধ্যাকালে প্রতিদিন গ্রামোফণোর গান শুনিতাম। কখন কখন সব ভাইবোনে মিলিয়া গান বাজনায় আমোদে দিন অতিবাহিত করিতাম। দুই মাস পরে কলেজ খুলিলে, বাড়ী ছাড়িয়া আবার কলিকাতায় আসিতে হইল। আসিবার সময় "শুক্‌না" ষ্টেসনের পর ট্রেণ যখন ক্রমে সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িল তখন সন্ধ্যাবেলা। দুই ধারে বন, ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ শব্দে সেই বনভূমি পূর্ণ, জোনাকী পোকা গাছগুলি ছাইয়া ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। তখনকার দৃশ্য এত চমৎকার হইয়াছিল যে, তাহা ভাষায় প্রকাশের সাধ্য আমার লেখনীর নাই। তার পর দিন বেলা ১১ টার সময় কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সে সময় কলিকাতা যেন আগুনের বাতাসে পূর্ণ মনে হইতেছিল। আবার সেই গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি শব্দে কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল। সেই সুন্দর প্রকৃতির প্রকৃত চিত্রকর এখানে নাই।

[শ্রীমতীপ্রেমলতিকা হালদার]

(c) সাহিত্যগুরু অমর কবি বঙ্কিমের অতুল প্রতিভা, বঙ্গসমাজের নব প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম, তদ্দোষ প্রদর্শনেচ্ছু বিপক্ষদল; বিদ্যাসাগর-প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ প্রথাও তদ্দোষ প্রদর্শনেচ্ছু সমাজহিতৈষী গোঁড়া হিন্দুর দল, এই সমুদয়ের সমন্বয়ে সামাজিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে "বিষবৃক্ষের" জন্ম দিয়াছেন। সংসারে জ্ঞানানভিজ্ঞ অপরিণতবুদ্ধি বঙ্গীয় বালিকা এই আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িলে তাহার কিরূপ অবস্থা হইতে পারে কুন্দনন্দিনী তাহারই একখানি চিত্র। অতিশৈশবে মাতাপিতৃ-হীন অনাথা কুন্দ অসহায় অবস্থায় হঠাৎ আশ্রয় পাইল। যদিও স্বপ্নে মা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি উপায় কি? আশ্রয় কোথায়? কুন্দ তাহার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। ইহাই কুন্দ চরিত্রের আরম্ভ। ক্রমে বালিকা কুন্দ জানিল, তাহার বিবাহ হইল, সে জানে না বিবাহ কাকে বলে অথবা স্বামী কাহাকে বলে? সে শুধু জানিল সে বিবাহিত, ক্রমে সে জানিল সে বিধবা। এক্ষণে সেই বালবিধবা নগেন্দ্রের আশ্রয়ে আসিল। বাল্যে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত শৈশবে মাতৃক্রোড়চ্যুত যৌবন আরম্ভের পূর্ব্বেই বিধবা কুন্দ সংসারে সুখ কি জিনিষ, তাহা জানিতেও পারিল না। তবে নগেন্দ্রের যত্নে তাহার দুঃখ ও বিশেষ রহিল না;

নগেন্দ্রের যত্ন, তাহার পত্নীর স্নেহ, সকলের আদরের কুন্দ দুঃখ ভুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা আসিল। ক্রমে বয়সের দোষে অথবা গুণে এবং অবস্থার ভেদে কুন্দ নগেন্দ্রকে ভাল বাসিল এবং নগেন্দ্র, যদিও তাহার পত্নী ছিল, তথাপি রূপাকৃষ্ট হইয়া ক্রমেই কুন্দর চিন্তাই মনের একমাত্র কার্য্য করিয়া তুলিল। এইরূপে এক দিকে অসহায় অবস্থা হইতে রাজসুখে রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা হইতে প্রত্যুপকারেচ্ছা এবং সেই চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে প্রেম এবং অপরদিকে মোহাকৃষ্ট, যৌবনদৃপ্ত যুবকের প্রেমের নামে মোহান্ধতা, ইহাই বিষবৃক্ষের আরম্ভ।

কিন্তু কুন্দ ভাল বাসিল, নগেন্দ্র ও মনে করিল সেও ভাল বাসিল, তাহার স্ত্রী ও বাধা দিল বরং অভিমান করিল এবং ক্রমে অত্যধিক পতি-প্রেম-বলে নিজের সুখ বলিদান দিয়া তাহাকে সুখী করিবে ভাবিল। কিন্তু কেহই এই কার্য্যে বাস্তবিক সুখ কত দূর তাহা ভাবিল না। সুতরাং কুন্দের পুনরায় বিবাহ হইল: ইহাই বিষবৃক্ষের পরিপুষ্টি।

কর্ত্তব্যের অবসানে গভীর অবসাদ আসিয়া নগেন্দ্রের পত্নীর হৃদয় অধিকার করিল। গৃহে থাকা তাঁহার অসম্ভব হইল, তিনি গৃহত্যাগ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রের চক্ষু ফুটিল। নগেন্দ্রও সংসারে বীতস্পৃহ হইল, ক্রমে সেও গৃহত্যাগ করিল। এখন কুন্দ কি করে? তাহার অপরাধ কি অথচ সমস্ত অপরাধের বোঝা তাহারই মস্তকে। নগেন্দ্র ফিরিল, রাত্রে তাহার সহিত দেখা করিল না। পর দিন সকলে আনন্দ করিল যে গৃহের লক্ষ্মী আবার ফিরিয়াছেন কিন্তু কুন্দ আজ কোথায়? কুন্দ তখন বিষপান করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই স্বামীর পদে মস্তক রাখিয়া কুন্দ মরিল। ইহাই বিষবৃক্ষের পরিণতি।

এখন প্রথম কথা এই কুন্দের মৃত্যুর কারণ তাহার বিবাহ। অতএব বিবাহ কত দুর যুক্তি সঙ্গত? ইহার উত্তর তাৎকালিক সমাজের অবস্থা এবং বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার প্রভেদানুসারে ও অবস্থাভেদানুসারে সমাজের অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইংরেজী-শিক্ষার প্রথমাবস্থায় কয়েক জন ইংরাজী-শিক্ষিত লোক পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদিগকে সভ্যতর মনে করিতে লাগিলেন এবং সমাজের সমস্তই কদাচার-দুষ্ট বলিয়া তাহার সংস্কার করিতে গেলেন কিন্তু সমাজ সে কথা শুনিল না। সমাজ বলিল "তোমরা শাস্ত্র জান না, তোমাদের কথা চলিবে না।" ক্রমে লোকে শাস্ত্রও অনুসন্ধান করিল এবং সেই অনুসন্ধানের ফলেই স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিলেন "বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়।" অনেক বাদানু-

বাদ তর্ক বিতর্ক এবং ক্রমে কলহ নিন্দা পর্য্যন্ত হইল। দুই চারিটি-বিবাহ ও হইল কিন্তু তথাপি রক্ষণশীল-সমাজ সে কথাও মানিল না। শিক্ষার এখন আর ও বিস্তার হইয়াছে। এবং এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তি পাঠ করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই; যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষে এবং যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিপক্ষে তাঁহারা সকলে নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বালিকা বিধবার পুনর্ব্বিবাহের পক্ষপাতী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতুল জ্ঞান ও অধ্যবসায় যাহা করিতে পারে নাই, কাল তাহা সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেকাংশে সফল করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়া যদি আমরা কুন্দকে দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিব কুন্দর দোষ কি? কুন্দ বালিকা। কুন্দ যাহাকে ভক্তি করিত, তাহাকে ভালবাসে কিন্তু অতিগোপনে। তাহার ভালবাসা হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত, জগৎ তাহার কিছুই জানিত না।

নগেন্দ্র স্বভাবের উদ্দামতা-বশতঃ তাহাকে বিবাহ করিল, কিন্তু তাহার পত্নী ছিল সুতরাং সে পুনর্ব্বিবাহে সুখী হইতে পারিল না। এই প্রণয়-বিপর্য্যয়ে কুন্দের অপরাধ নাই, নগেন্দ্রই অপরাধী। কিন্তু কবি এ স্থলে বাস্তবিক কুন্দের অপরাধ দেখানর জন্য ও গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য রূপজ মোহ এবং পবিত্র প্রেমের প্রভেদ দেখান এবং যৌবনের চিত্তচাঞ্চল্যবশে অপরিণামদর্শী হইয়া কার্য্য করার ফল দেখান।

কুন্দ যদি ও তাহার স্বামীকে ভাল বাসিত এবং হিন্দু স্ত্রীর অধিকাংশ গুণই তাহাতে ছিল, তথাপি আদর্শ হিন্দু রমণীর নয়। কবি কুন্দকে সম্পূর্ণ হিন্দুরমণী ভাবে দেখান নাই। কুন্দ-চরিত্র পড়িলে মনে হয় যেন ইহা ঠিক ভারতীয় নারীর চরিত্র নয়। কুন্দের প্রেম আছে কিন্তু

আদর্শ হিন্দুরমণী, যাঁহারা স্বামীর পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলেও নিজে মৃত্যু-যন্ত্রণা বোধ করিতেন, কুন্দ সে রমণী নয়। কুন্দ ভাল বাসে কিন্তু কামনাশূণ্য নয়। তাহার প্রেম আছে কিন্তু অভিমান ও আছে। গভীর ভালবাসা আছে কিন্তু মিলনের আকাঙ্ক্ষাও আছে। নিঃস্বার্থ আপনা ভোলা তুমিময় ভালবাসা কুন্দর নাই। কুন্দ ভালবাসে কিন্তু প্রত্যাখান সহ্য করিতে পারে না এবং সীতার ন্যায় নির্ব্বাসিত হইয়াও বলিতে পারে না "তুমি রাজা, তুমি স্বামী, তুমি যখন করিয়াছ অন্যায় নয়"। সুতরাং কুন্দ আদর্শ হিন্দুনারী হইবার যোগ্য নয়। কিন্তু এখন আ রা কুন্দ-চরিত্রে বিশেষ দোষ দেখিনা, আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি "বিনা দোষে যখন প্রত্যাখ্যাতা, তখন সে স্বামীর অনিষ্ট না করিয়া যে শুধু আত্মহত্য: করিয়াছে, এই জন্যই সুখ্যাতি করা উচিত। কারণ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, বিলাতে স্ত্রীলোক স্বামীকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অনেক সময় তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আমাদের এই মনোভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ব্যতীত কিছুই নয়, কারণ কোনও হিন্দুনারী কখনও স্বামীর অনিষ্টের কথা স্বপ্নেও মনে করিতে পারে না। সুতরাং মনে হয় কিন্তু চরিত্র-বর্ণন ও কবির পাশ্চাত্য ভাব-প্রসূত, তবে তিনি ইহাকে যথাসাধ্য ভারতীয় সাজে সাজাইয়াছেন। এই ভারতীয় সাজ সাজিয়াছে বলিয়াই বলি সে মরণ-কালেও স্বামী চরণে মাথা রাখিয়া মরাকেই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোচ্চ কাম্য বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছে। যদিও কুন্দ আদর্শ হিন্দু নারী নয় তথাপি কুন্দ সামান্যা রমণী অপেক্ষা অনেক উচ্চে। নির্দ্দোষে স্বামীর আদরে বঞ্চিতা হইয়া যখন প্রাণত্যাগ করিতেছে, তখনও কুন্দ বলিতেছে, আমি মরিলাম, তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি সুখী হও।

আয়েষাকে দেখিলে মনে হয় তাহার প্রেম, কুন্দ-প্রেমাপেক্ষাও গভীর। কুন্দের প্রেমের উৎপত্তি কৃতজ্ঞতা এবং একত্রবাসে তাহার পরিপুষ্টি।

মিলনাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও সহস্রগুণ সুন্দর ছিল, আয়েষার প্রেমের উৎপত্তি জগৎসিংহের বীর্য্যের প্রশংসা হইতে এবং রূপদর্শনে তাহার পরিপুষ্টি। ওসমান্ রূপবান্ বলবান্ এবং পিতার ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী আয়েষার সহিত বিবাহ হইলে ঐশ্বর্য্যের অভাব থাকিবে না। কিন্তু তথাপি আয়েষা জগৎসিংহকে ভালবাসে। কিন্তু এই প্রেম মধ্যে কামনা নাই, মিলনেচ্ছা নাই বরং কিসে প্রেমাস্পদের সুখ হইবে এই জন্য স্বহস্তে নিজ সুখ বলিদান। আয়েষা জগৎসিংহের মুক্তি দানে পিতার নিকট অপ্রিয় হইতে ও কুণ্ঠিত নয়, বরং পিতার অমতে ও পাঠাইতে প্রস্তুত। তার পর, নিজ জীবন-সর্ব্বস্ব প্রেমাস্পদ জগৎসিংহের অপরের সহিত বিবাহ হইতেছে, ইহাতে আয়েষা দুঃখিতা নয়, শুধু তাই নয়, আয়েষা স্বহস্তে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে নিজ অলঙ্কারে সাজাইয়া দিতেছেন ! ইহাই আয়েষা-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম দৃশ্য। 'কিন্তু কি জানি নারীর মন, যদি আমার মনে কখনও তিলোত্তমার উপর হিংসা হয়, অতএব আমি দূরে যাই' বলিয়া আয়েষা চলিলেন। ধন্য সন্নাসিনী তুমি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসীর আদর্শ। আয়েষার প্রেম গভীর সমুদ্রের ন্যায় কিন্তু তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ নাই। আয়েষার মধ্যে প্রেম আছে, স্বার্থত্যাগ আছে, নারী-জনোচিত দুর্ব্বলতাও আছে কিন্তু পাছে এই দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া কর্ত্তব্যে ক্রুটী হয়, সেই জন্য আয়েষা দূরে সরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু স্বামীর প্রেমের অংশ চান না অথবা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার সুখের ব্যাঘাত করিতেও চান না।

কুন্দ অপেক্ষা আয়েষা হিন্দুরমণীর অধিক আপনার ধন। বাল্যে মার কাছে গল্প শুনিয়া, শৈশবে শিবপূজা-ব্রত পারণ এবং নানাবিধ আচারের মধ্যে এবং যৌবনে সংসারের কর্ত্তব্যের মধ্যে হিন্দুবালিকা ভবিষ্যৎ জীবনের একটী সুখপূর্ণ চিত্র অপনার চক্ষের সম্মুখে ধরে। বালিকাবস্থায় গল্পে শিবের মাহাত্ম্য শুনিয়া এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বর

দিবেন আশায় বালিকা শিবের ন্যায় স্বামী প্রার্থনা করে। স্বামী যেমনই হউন না কেন, বাল্য শিক্ষার বশে সে স্বামীকে ভক্তি করে, ভালবাসে এবং স্বামীর ভালবাসা পাইলে সুখী হয় কিন্তু এই সময়ে সমবয়স্কাদিগের সহিত নিজের সুখ দুঃখ তুলনা করিয়া নিজের কিছু অল্পতা দেখিলে দুঃখিত হয় এবং স্বামীর নিকটে দাবী করে, এই খানেই কুন্দ-চরিত্র সামান্য রূপান্তরিত।

এই সময় যদি সে সৎশিক্ষা পায় এবং সদ্দৃষ্টান্ত দেখে, তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং সে সমস্ত দুঃখের মধ্য দিয়া, ভাগ্যের মধ্য দিয়া ও অভাব অনাটনের মধ্যেও, শোকের মধ্যে, কষ্টের মধ্যে সকল সময়েই স্বামীকে একমাত্র দেবতা জ্ঞান এবং ভক্তি করিতে ও ভাল বাসিতে শেখে। ইহাই আয়েষা-চরিত্রের গৌরব। কুন্দ-চরিত্র যে আকাঙ্ক্ষার দিকে চালিত করে, আয়েষা সত্বগুণ আনিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য দেখাইয়া সেই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া তাহার স্থানে সর্ব্বাবস্থাতেই একটি সুখের ভাব প্রবর্ত্তিত করে। কুন্দে যাহার উৎপত্তি, আয়েষাতে তাহার নিবৃত্তি, কুন্দে ভোগ, আয়েষাতে শান্তি। সুতরাং আয়েষা কুন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও অনুকরণীয়া।

[শ্রীকানাইলাল সান্যাল]

—o—
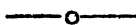
ভূমিকম্প।

(*d*) ভূমিগর্ভ অত্যন্ত উষ্ণ। নিম্নে যে সকল ধাতু আছে, তাহারই সংযোগে ভূমি এত গরম হয়। ভূমির আবার ইতর বিশেষ আছে, কোনও স্থান অধিক উষ্ণ, কোনও স্থান বা অল্প। সমুদ্রতীরবর্ত্তি স্থানে ভূমিকম্পের অধিক উপদ্রব। জাপান প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ ভূমিকম্পের সহিত সুপরিচিত। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে যে

ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। অনেক অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, অনেক ভূভাগ দ্বিখণ্ড হইয়াছে। ভূমিকম্পে কত শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, কত লোকসমাকীর্ণ নগর ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবীর উত্তাপ বাড়িলেই এই অনর্থের উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্ব্বে কামানের শব্দের ন্যায় ভূগর্ভ হইতে গুরু গম্ভীর গর্জ্জন উত্থিত হয়। তাহার পর, কম্পন ও নদ নদী সমুদ্র-জল আলোড়ন, বৃক্ষসমূহ উৎপাটন বা দোলায়মান করিয়া, পৃথিবীতে প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ভারতের নানা স্থানে নানা ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু আসাম ও দার্জ্জিলিং অঞ্চলে অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। দার্জ্জিলিংএ ভূমিকম্পে একটী বালিকাবিদ্যালয় চিরদিনের জন্য ভূমিমধ্যে প্রোথিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক বালিকা প্রাণ হারাইয়াছে। লী সাহেবের ছয়টী কন্যা এই স্থানে ছিল। তাহারা ও এই মৃত্যুর অংশভাগিনী হইয়াছে। পিতা মাতার কি দারুণ যন্ত্রণা! নিমিষের মধ্যে প্রাণের পুতলিগুলি চক্ষের সম্মুখ হইতে চিরদিনের জন্য সরিয়া গেল! কয়েক মাস হইল আমরা ঐ স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চিহ্ন অনুসন্ধান করিতেছিলাম। কিন্তু ধরিত্রী কি মোহন বেশই ধারণ করিতে পারেন। কেমন ফলফুলে সুশোভিত পর্ব্বত-স্তর শোভা পাইতেছে! অন্তরে যে কত শত শত হাসিমাখা মুখ, বিরাট বিপুল অট্টালিকা লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কে বলিবে? সে সকলের চিহ্ন মাত্রও নাই।

প্রাচীন রোমের ইতি হাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পম্পিয়াইতে শত শত অট্টালিকা এরূপে ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছিল। কত নাট্যশালা, কত ক্রীড়াভূমি, ধরণী হইতে মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। বিসুবিয়স্ নামক আগ্নেয়গিরির অগ্নি-স্রাবই নাকি ইহার কারণ! প্রাচীন রোমীয়দিগের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ভূমিকম্প

আপন প্রতাপ দেখাইয়া গেল। রোমীয়েরা খুব উন্নত জাতি ছিল বটে ক্রমে ক্রমে তাহাদের জাতীয় জীবন অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে। তাহারা সতত বিলাসসমুদ্রে সন্তরণ করিত, নৃত্যগীত তাহাদিগের আমোদের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অনিত্যতা স্মরণ করাইবার জন্যই বোধ হয় এই প্রলয়ের উৎপত্তি হয় এবং সমুচিত দণ্ড প্রেরণ করে। আগ্নেয়গিরি সন্নিহিত দেশসমূহে ও ভূমিকম্পের উপদ্রব বেশী।

[শ্রীমতীআশালতা দে]

—o—
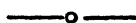
(৫) ধর্ম্মের পথ অতিসরল। ইহাতে বক্রতা নাই; আত্ম-গোপনের তীব্র যাতনা নাই। সাধুতার সফলতা পাওয়া যায়, সাংসারিক হিসাবেও বটে, নৈতিক হিসাবেও বটে। সত্য নগ্ন অবস্থাতে ও তাহার অত্যুজ্জ্বল আসন অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু মিথ্যাকে খাড়া করিতে হইলে তাহার আচ্ছাদন আবশ্যক। সে আচ্ছাদন ও তাহাকে বেশী ক্ষণ আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। মিথ্যা ধরা পড়িলেই তাহার পসার মাটি হইয়া গেল। কিন্তু অল্প সত্যও কোন দিন বিশ্বাস হারায় না। যদি ও সে ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে কখন ও অবিশ্বাসে দুর্ব্বল হয় না। বলের সহিত তাহার আসনে দৃঢভাবে দণ্ডায়মান রহিতে পারে। অবিশ্বাসের তুচ্ছ ধূলি যে বাতাসের সহিত তাহার উপরে পড়িয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সেই বাতাসেই উড়িয়া যায় এবং সত্যের স্বতঃ প্রভাসিত মূর্ত্তি আবার তাহার চিরন্তন গৌরব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মিথ্যার সে বল নাই। সে যদি ও কোন রকমে চাকচিক্যময় বসনে নিজেকে আবৃত করিয়া ক্ষণ কালের জন্য লোকচক্ষু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তথাপি সেই আচ্ছাদনের অন্তরালে তাহার ভীরুমূর্ত্তি কাঁপিতে থাকে। সে সত্যের আসনে বসিয়া ও কোন সুখের অধিকারী হইতে পারে না।

আর যখন দুদিন পরে তাহার অঙ্গের সেই আচ্ছাদন টুটিয়া যায়, তখন তাহার সেই শীর্ণ রাক্ষসী মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বাস ঘৃণার সহিত তাহাকে ত্যাগ করে এবং সে তাহার চিরাভ্যস্ত ধূলিশয্যায় নিক্ষিপ্ত হয়।

সাধুতার পথ কঠিন হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রস্তর-নির্ম্মিত ঊর্দ্ধগামী পথটি আমাদিগকে প্রকৃত সফলতার উচ্চস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু ঐ যে তৈলমসৃণ নিম্নগামী পথটী দেখিতেছ, যে পথটি দেখিয়া তোমার আরামে গা ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে; উহা আপাততঃ আরাম-দায়ক হইলে ও পরিশেষে তোমাকে কণ্টকাচ্ছন্ন পাতালস্পর্শী নিষ্ফলতার ও অনন্তযাতনার গুহায় নিক্ষেপ করিবে।

সত্যের সরলতাময় পথটিতে যদি তুমি বীরের ন্যায় চলিতে থাক, তবে তোমার সফলতা নিশ্চয়। কিন্তু কুটিলতার পথ তোমাকে আপাততঃ সফলতা দিলে ও পরিশেষে তোমাকে অনন্ত নিষ্ফলতায় ডুবাইয়া দিবে।

ইতিহাস এই চিরন্তন সত্য কথাটির জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। যদি আমরা একটু বিবেচনা করিয়া দেখি, তবে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমার চক্ষের সমক্ষেই প্রতিমুহূর্ত্তে যত ঘটনাবলী এই কথাটি আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় সচেতন ভাবে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা পাইতেছে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র কেবলমাত্র সাধুতা-বলেই এত অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জন করিতে পারিয়া ছিলেন। একমাত্র ধর্ম্মের সরল কঠিন পথই তাঁহাকে শুভ্র-যশঃ-শৈলের অভ্র-ভেদী শৃঙ্গে স্থাপিত করিয়াছিল। আর চাহিয়া দেখ কত লোকে অসৎ উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া দুদিনের মধ্যে তাহাদের পুরাতন আসন হইতে ও কত নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্, নানাপ্রকারে অর্থোপায় করিয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, না জানি কত আরামেই দিন যাইবে, কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না, সাত বৎসরের মোকদ্দমার পরে হেষ্টিংস্ মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু আসনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, যে অর্থ

স্তূপের উপরে উপবেশন করিয়া তিনি নিজকে বহু উচ্চে অনুভব করিয়াছিলেন, আসন নিম্ন হইতে সে অর্থ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আজ তিনি নগ্ন মৃত্তিকায় উপবিষ্ট। ইতিহাসের দিকে চাহিলে এরূপ কত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমাদের ঘরের দ্বারেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা নিজেরাও দেখিয়াছি কত কত বালক পূর্ব্বে সকলের বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু "বাহবা" লইবার জন্য হয়ত পাঁচটা কথা বানাইয়া বলিয়া ধরা পড়ায় তাহার প্রতি লোকে বিশ্বাস হারাইয়াছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অমুক লোক জমিদারী সেরেস্তায় কাজের সময় অত্যাচার করিয়া কত টাকা আনিয়াছে, কত জাঁকজমক করিয়াছে, কত দম্ভ, কত অহঙ্কার! কিন্তু মনে করিয়াছিল চিরকালই এম্‌নি সুখে যাইবে। কিন্তু আজ তার মাথায় হাত পড়িয়াছে, পরিবার পোষণেও সে আজ অক্ষম। বাজারে দুই জনে দোকান করিতেছে। একজন ঠকাইয়া যথেষ্ট টাকা পাইতেছে। আর একজন অল্প লাভে বেশ সৎ উপায়ে যাহা পাইতেছে তাহাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু দেখা যায় যে, বেশী টাকাওয়ালার অভাব ঘুচে না। এত টাকা যে যায় কোথায়? বুঝিয়া উঠা যায় না। ভগবানের যে কি এক ইন্দ্রজাল তাহা ধরা যায় না, অথচ চাক্ষুষ সহস্র দৃষ্টান্তে এই একই কথা। ইহা কবির কল্পনা নহে, ঔপন্যাসিকের কল্পনা নিঃসৃত মায়ারচিত নহে। ইহাতেও তার চক্ষু উন্মুক্ত হইতে চাহে না। এই যে বাস্তব ঘটনা, এই যে জলন্ত সত্য প্রতি মুহূর্ত্তে চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। তবুও যাহার কাছে যাই শুনিতে পাই, সংসারে ধর্ম্মপথে চলিলে টেঁকা যায় না। সত্য পথে সঞ্চয়ীর উন্নতিমুখাভিধাবিত আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়াও তাহাদের বিশ্বাস হয় না। তুচ্ছ ক্ষণিক সুখেই তাহাকে আকর্ষণ করে। এমনি দুর্ব্বল মানব-হৃদয়! লোকে এ কথা বিশ্বাস করে না। হয়ত লেখে, বলে, কিন্তু ইহার প্রতি হৃদয়ের বিশ্বাস নাই। কবে ভগবান্ ক্ষীণবুদ্ধি মানবকে

এই সনাতন সত্য কথাটি উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা দিবেন? যে দিন আমরা সকলে এই কথাটি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিব, সেই দিন পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে; মানুষ দেবতা হইবে, এই চিরসন্তপ্ত মরুভূমিতে প্রেমের মন্দাকিনী বহিয়া যাইবে।

অনেক সময় বোধ হয় যে, জগতে ধর্ম্ম নাই, মিথ্যারই জয়। যখন দেখা যায় যে, ধার্ম্মিক দুঃখ যাতনায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন লোকের বিশ্বাস চঞ্চল হইয়া উঠে। সে তখন ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদিগকে এত শীঘ্র দুর্ব্বল হইলে চলিবে না। দুঃখ আমাদিগকে এত অভিভূত করিয়া দিবে কেন? দুঃখ যে আমাদিগের মিত্র। দুঃখের পবিত্র অগ্নিতে আমাদের আত্মা-স্বর্ণ শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। দুঃখের পবিত্র অশ্রুজলে আমাদিগের হৃদয়-কুসুম পবিত্র এবং কীটশূন্য হইয়া যায় ও আমাদিগের অনন্তময়ের দিকে ধাবিত করে। কবি গাহিয়াছেন;—

"সন্তান মঙ্গলতরে জননী তাড়না করে।"

বস্তুতঃ দুঃখ ভগবানের ভালবাসারই পরিচায়ক। দুঃখে আমাদিগের আত্মা শুদ্ধ হয়। অতএব তাহাতে আমাদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস চঞ্চল করিয়া দিবে কেন? ইহা হইতে আমরা আরো দৃঢ় ভাবে ধর্ম্মকে ধরিতে শিখিব। আরো একটা কথা দেখিতে হইবে যে, ভগবানের কাজ একদিনে হয় না। এই কথাটি একজন কবি বড় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে "একটি সামান্য কুসুম কলিকা ফুটাইবার জন্য শতবর্ষ ধরি চলে তব ধীর আয়োজন।" আজ তুমি দুঃখে পড়িয়াছ। এত শীঘ্র ব্যগ্র হও কেন? ভগবানের কাযে অসম্ভব হইতে সম্ভব দেখা দেয়। পরমধার্ম্মিক দুঃখে নষ্ট হইতেছে বলিয়া তোমার বোধ হইতেছে, কিন্তু স্থির হও, তুমি তোমার ক্ষীণ মস্তিষ্ক লইয়া অত উতলা হইওনা। দেখ কেমন করিয়া, ও আত্মা কলিকাটি ফুটে। ভগবানের হাতে শতছিদ্র কলসীতে জল উঠে।

ও নষ্ট হইতেছে না ও উন্নতির দিকেই যাইতেছে। অতএব আপাতদুঃখ দেখিয়াই আমাদের ধর্ম্ম পথ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি যেন না আসে। ধর্ম্মপথ অবশেষে আমাদিগকে সফলতা দিবেই এ বিশ্বাস যে আমাদিগের মন হইতে যেন কখনো না যায়, এ দৃঢ়বিশ্বাস আমাদিগকে সংসারের অগ্নি-পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিবে। অতএব আইস, এই দৃঢ়বিশ্বাস পতাকা উড়াইয়া জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। জয় অবশ্যম্ভাবী।

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার]

——০——

গৃহপালিত পশু।

(*f*) আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাভী ও বলীবর্দ্দ, এই দুই প্রধান গৃহপালিত পশু, তবে এতদ্ব্যতীত কুকুর, বিড়াল, ছাগ, মেষ, অশ্বাদিও গৃহপালিত পশুগণের অন্যতম।

ইহাদের উপকারিতা অনেক। গাভী আমাদিগকে দুগ্ধ দান করে, তাহার গোময় হইতে আমরা দাহ্য যাহাকে চলিত ভাষায় "ঘুটে" বলে প্রস্তুত করি, গাভীর মূত্র ঔষধাদিতেও ব্যবহার ও গোময় আমাদিগের ধর্ম্মকর্ম্মেও আবশ্যক হয়। গাভীর দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য, আমাদের শিশুগণ ঐ দুগ্ধেই প্রাণ ধারণ করে। ঐ দুগ্ধে আবার নবনীত, মাখন, ঘৃত, ছানা, ক্ষীর ও নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্ত হিন্দুগণ গাভীকে দেবতামাতৃ-রূপে পূজা করে।

বলীবর্দ্দ আমাদের অপর এক অত্যাবশ্যক গৃহপালিত পশু, তাহারা শকট বহন করে, লাঙ্গল কাঁধে করিয়া কৃষককে ভূমিকর্ষণে সাহায্য করে, ভার বহন করে এবং অন্যান্য নানা প্রকার গুরু কার্য্য সম্পন্ন করে।

যদিও বিড়ালাদি এক একটি গৃহপালিত পশু, তথাপি তাহাদের বিশেষ তেমন কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। বিড়াল আমাদের এই কাজে

আসে যে, সে ইন্দুরাদি অপকারী ক্ষুদ্র জন্তুকে মারিয়া ফেলে অথবা ভক্ষণ করে। বিড়াল দেখিতে অতি সুশ্রী এবং সেই জন্য অনেকে সখ করিয়া বিড়াল পুষিয়া থাকে।

কুকুর এক অতি উপকারী জন্তু। তাহার প্রভুভক্তি অতীব আশ্চর্য্যজনক। সে সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রযত্নে নিজের প্রভুর মঙ্গল করিতে চেষ্টা করে। নিজের প্রভুর অপরাপর ক্ষুদ্র জন্তুগুলিকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করে। প্রভুর দ্বারে চৌকি দেয় ও এরূপ নানা কার্য্য করে। ছাগ মেষাদি আমাদের অন্য বিশেষ উপকারে লাগে না, তাহারা এক প্রকার ভক্ষ্য রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ছাগদুগ্ধ অথবা মেষদুগ্ধ আমাদের অনেক উপকারে আসে, অনেক দুরারোগ্য রোগ উহাতে ভাল হয়। উহাদের দুগ্ধ অধিক পরিমাণে হয় না, পেটের অসুখ করিলে ছাগীর দুগ্ধ শিশুদিগকে দেওয়া হয়।

অশ্ব গৃহপালিত পশু হইলেও সকলে উহা পালন করে না। ধনী ব্যক্তিরাই অশ্ব প্রতিপালন করিয়া থাকেন। অশ্ব যানাদিবহন, ভারবহন এবং আরোহণোপযোগী জন্তু। সে অতি প্রভুভক্ত, যুদ্ধাদিস্থলে প্রভুকে একলা ফেলিয়া যায় না, সর্ব্বদা প্রভুকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হয়।

গবাদি কেবল, লতা পাতা, ঘাস, খড়, ফেন, খোল, শাক সবজী ইত্যাদি খাইয়া থাকে। আমাদের দেশে তৃণের অভাব নাই, শস্যশ্যামল বঙ্গদেশে অন্যান্য শাক সবজী, লতাপাতাদিও যথেষ্ট আছে। কেন আমরা ব্যবহার করি না, আমাদের জলপক্ক অন্নের জলীয় অংশ অবশ্যই কোনরূপে পরিত্যক্ত হয়, তাহা গবাদির এক উপাদেয় খাদ্য। খোল আমাদের দেশে প্রচুর। তৈল বাহির করিয়া লইয়া অবশিষ্ট যাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া থাকি তাঁহাই গবাদির এক উপাদেয় খাদ্য। গ্রামে গবাদির যত্ন আরও কম করিতে হয়, তথায় গোস্বামিগণ প্রাতে দুই একজন রাখাল-বালকের সহিত সমস্ত পশুগণকে ছাড়িয়া দেয়। তাঁহারা

মাঠে ঘাটে রাখিয়া খাওয়াইয়া বেড়ায়। নদীতটস্থ ঘাস ইহাদের এক উপাদেয় খাদ্য, সমস্ত দিন মাঠে চরিয়া তাহারা সন্ধ্যাকালে বাটী ফিরে, তখন তাহাদিগকে খোল এবং জাব দিয়া গোয়ালে তোলা হয়। ইহাদের কোনও প্রকার অসুখ না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সকলেই সাবধান থাকে। ইহাদের অসুখও কম করে।

কুকুর বিড়ালও কেবলমাত্র উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তবে অনেকে কুকুর বিড়ালকে আদর করিয়া সুখাদ্য দান করে। এবং তাহা করাই আমাদিগের উচিত। আগে কুকুর বিড়াল শুধু উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিত বলিয়া উহাদের প্রতি এক ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে, ও তাহাদের যত্ন বাড়িতেছে।

অশ্বের প্রধান খাদ্য দানা (যবাদি) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণের অংশ। অশ্বের প্রতি যত্নবান্ হওয়া অতীব আবশ্যক, সে আমাদের অনেক উপকারে আসে।

গৃহপালিত পশুপালের রক্ষার নিমিত্ত যে সকল আবশ্যকীয় সাবধানতা চাই, তাহা প্রত্যেক গৃহস্বামীই অনেকাংশে পালন করেন। উহাদের রাত্রে আবাস গৃহে রাখা কর্ত্তব্য নতুবা ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ করিয়া মারা যায়। উহাদের অতীব পরিশ্রম করান অনুচিত। তাহাতে উহারা হীনবল, শ্রান্ত এবং সময় বিশেষে ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় হয়। উহাদের মাঝে মাঝে স্নান করান কর্ত্তব্য,এবং অসুখ করিলে সর্ব্বদা চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। অধুনা পশুচিকিৎসাশালা হইয়া আমাদের উপকার হইতেছে, উহা হইতে অনেকে পশু চিকিৎসা শিক্ষা করিতেছে এবং আমাদের একটি অভাব মোচন হইতেছে।

এই সকল পশুকে কাজে লাগাইতে হইলে তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিতে হয়, নতুবা তাহারা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে থাকে। গরুকে দুগ্ধ দিবার জন্য অবশ্য কোনও শিক্ষা আবশ্যক করেনা, কেন না অনেক দিন হইতেই তাহারা

পুরুষাদি ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত, অশ্বকে অশ্বশালায় পাঠাইয়া অথবা অন্য প্রকারে যান-বাহনোপযোগী, অথবা আরোহণোপযোগী করিতে হয়।

কুকুর বিড়ালাদিকেও ঐরূপ স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করিতে হয়।

গৃহপালিত পশুগণের অতিমাত্র আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকলাপের কথা আমরা অনেক পুস্তকে পড়িয়া থাকি। অশ্ব মৃতপ্রভুকে ছাড়িয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে নাই, কুকুর প্রভুর কথা শুনিয়া শকট চক্রে প্রাণ ত্যাগ করিল, তথাপি নড়িল না, অপর এক কুকুর প্রভু-পুত্রকে সমুদ্র মধ্য হইতে স্বীয় প্রাণপণে উদ্ধার করিল, পর্ব্বতস্থ কুকুর পথভ্রান্ত তুষারাহত, পথিককে উদ্ধার করে, বিড়াল প্রভুকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিল ইত্যাদি নানা প্রকার গল্প আমরা শৈশবাবস্থা হইতেই পড়িয়া এবং শুনিয়া আসিতেছি।

কিন্তু স্বচক্ষেও এরূপ অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি যখন শিশু তখন আমাদের এক বিড়ালী ছিল, সে সাধারণ বিড়াল অপেক্ষা বৃহদাকার এবং সর্প দেখিলেই তাহা মারিয়া ফেলিত। এক দিন কাকা বিড়ালীর চীৎকার শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আমাদের গৃহের একাংশে এক বৃহৎ গোক্ষুর সর্প ও বিড়ালী যুদ্ধ করিতেছে। বিড়ালী সর্পকে বশে আনিতে না পারিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছে।

আমাদের এক কুকুর ছিল, সে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপিও রাত্রিতে আমাদের বাটীর চতুর্দ্দিকে পাহারা দিত এবং অন্য জন্তুকে অথবা কোনও পশুকে সেই পাড়ায় আসিতে দিত না। সে কখনও সম্মুখে ভাতের থালা থাকিলে অথবা অন্য কোনও সুখাদ্য থাকিলে তাহা স্পর্শ করিত না, খাইতে বলিলে তবে খাইত। কখনও যদি বাটীর পুরুষগণ অথবা অধিকাংশ লোক রাত্রে অথবা দিনে কোথাও বাহির হইত, তবে সে আমাদের বাটী ছাড়িত না, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত।

আর একদিন দেখিয়াছিলাম আমার এক ভগিনী খেলা করিতে গিয়া জলে পড়িয়া যায়, তাহাতে সে (কুকুর) চীৎকার করিয়া একবার ভিতর এবং একবার পুকুর ধারে যাইতে থাকে, পরে আমরা তথায় গিয়া ভগিনীকে জল হইতে তুলি। এইরূপ নানা প্রকার গল্পে আমরা গৃহপালিত পশুর উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ পাই।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

——o——

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ২৯নং ক্যানিংষ্ট্রীট্ এস্,কে, নাথ ও জি, সি, নাথের দোকানে, ২৫নং কর্ণওয়ালিস্ষ্ট্রীট্, বি, ব্যানার্জী এণ্ড কোং দোকানে, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ষ্ট্রীট্, বেঙ্গলমেডিকাল্ লাইব্রারিতে, চাঁপাতলা ২৭।৩নং রামকান্তমিস্ত্রীর লেন্ গ্রন্থকারের বাটীতে পাওয়া যায়।

নাম	মূল্য।
রচনাসোপান—(মেট্রিকুলেসন্ ও ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার্থীর বাঙ্গালা-রচনা-শিক্ষার পুস্তক)	১৲
নীতিসন্দর্ভঃ—(তৃতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত পাঠ্য ২য় সংস্করণ)	।০
সংস্কৃতপরিচয়ঃ—(চতুর্থ শ্রেণীর সংস্কৃত পাঠ্য)	৶১০
চারুসন্দর্ভ—(মধ্যবাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তির পাঠ্য ৩য় সংস্করণ)	।৶০

সাধারণের পাঠ্য পুস্তক।

দক্ষিণাপথভ্রমণ—সচিত্র ২য় সংস্করণ।	১।০
শঙ্করাচার্য্যচরিত—শঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি সহ।	১।০
রামানুজচরিত—সচিত্র যন্ত্রস্থ।	১॥০

———০———